বিদ্যাসাগর স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

সাহিত্যম্ । ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন/১৩৬৭

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ
বিমল দাস

ব্লক প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র মুদ্রণে
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
মঞ্জুষা বোস
বোস প্রিন্টার্স সিণ্ডিকেট
৩২, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

বঙ্গভাষানুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের হাতে—

VIDYASAGAR SMRITI

Edited by : Biswanath De

ক'টি কথা

মহামনীষী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। তবুও কিছু বলতে হবে··· না বললে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এ ধরনের পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তা অস্পষ্ট থেকে যাবে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জ্ঞান প্রত্যেক বাঙালীরই আছে। কেননা, শিক্ষার শুরু হয় এই মনীষীর লেখা 'বর্ণ-পরিচয়'-এর অা-আ ক-খ দিয়েই। শুধু অ-আ ক-খ নয়, সেই সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের বহু খুঁটিনাটি বিষয়তেই তিনি হাত দিয়েছেন এবং সেগুলোকে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মনের দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন।

বইটিতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের নানান্ স্বাদের রচনা দেওয়া হয়েছে—যাতে আজকের পাঠক-পাঠিকারা বিদ্যাসাগরের শুধু পাণ্ডিত্যই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, উচ্চ আদর্শ এবং সর্বোপরি তাঁর দয়া ও উদারতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেতে পারেন। বইখানিতে এমন সব রচনা দেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যাসাগর-জীবনের সকল দিকই পরিস্ফুট হয়।

'সাহিত্যম্' প্রকাশিত অন্যান্য স্মৃতি-পর্যায়ভুক্ত বইগুলোর মতো এটিকেও সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোজ্ঞ করার চেষ্টা করেছি। পাঠক-পাঠিকাকে কতোটা খুশী করতে পেরেছি সে-বিচারের ভার তাঁদেরই ওপর।

ভূমিকা-অন্তে এই পুস্তকে সংকলিত রচনাসমূহের লেখকদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই আর কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পুস্তকখানিকে আপনাদের হাতে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছেন—'সাহিত্যম্'-এর সেই সুযোগ্য কর্ণধার নির্মলকুমার সাহাকে।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে।—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুলকুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — মাইকেল মধুসূদন দত্ত

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি; তব সব মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন; এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারংবার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে-বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে ॥

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্‌বেলিত দয়ার সাগর-বীর্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াওনি শির, জীবনে একবার!
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার!
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ;
অদৃষ্টের ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়
বিশ বছরের পুরানো শোক নূতন আজো প্রায়;
তাইতো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর!
কীর্তি-ঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই;
মানুষ খুঁজি তোমার মত, একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত! যেজন ভুলিয়ে দেবে শোক।

রিক্ত হাতে করবে যেজন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্নবাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মত ধন্য হবে, চাই সে এমন বীর।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ঐ পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক-একবার
শিক্ষা দিতে অহংকৃতে শিষ্ট ব্যবহার !

সেই যে চটি দেশী চটি বুটের বাড়া ধন ;
খুঁজব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।

রাখব তারে স্বদেশপ্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখবো তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্যাদায় যার।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;

স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
'বাপ-মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !'

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থ কাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ; নামটি নেবে ? একি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে আর নাই, কিন্তু পুরুষানুক্রমে বঙ্গবাসীদিগের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি ইদানীন্তন বঙ্গ সাহিত্যের প্রণেতা, তিনি বঙ্গ সমাজের সংস্কার-কর্তা, তিনি হৃদয়ের ওজস্বিতা ও দাক্ষিণ্যগুণে জগতের একজন শিক্ষাগুরু। গুরু আজ পাঠশালা বন্ধ করিলেন, কিন্তু, তাঁহার কীর্তিমণ্ডিত চিত্রখানি ধ্যান করিয়া দুই-একটি বিষয়ে আজ শিক্ষালাভ করিব।

যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, আজ তাঁহারা নিজ শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ করিতেছেন। সে সময়ের বঙ্গ সমাজ অদ্যকার সমাজের মতো নহে, তখনকার সাহিত্য অদ্যকার সাহিত্যের ন্যায় নহে। প্রাচীনা গৃহিণীগণ অথবা দোকানী পসারী লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন, যুবকগণ ভারতচন্দ্র আওড়াইতেন, শাক্তগণ রামপ্রসাদের গান গাহিতেন, নব্য সম্প্রদায় নিধুবাবুর টপ্পা গাহিতেন অথবা দাশু রায়ের ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব পাঠক কেহ কেহ চৈতন্য-চরিতামৃতের পাতা উল্টাইতেন, শাক্ত পাঠক কেহ কেহ মুকুন্দরামের চণ্ডীখানি খুলিয়া দেখিতেন। এই ছিল বাঙ্গলা গদ্যের অবস্থা, সুমার্জিত বাঙ্গলা গদ্য তখনও সৃষ্ট হয় নাই।

এইরূপ কালে ক্ষণজন্মা ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহস্র সদ্‌গুণের মধ্যে ওজস্বিতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাই সর্বপ্রধান গুণ। যেটি কর্তব্য সেটি অনুষ্ঠান করিব, যেটি অনুষ্ঠান করিব সেটি সাধন করিব, এই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের সঙ্কল্প। সমস্ত সমাজ যদি বাধা দিবার চেষ্টা করে সিংহবীর্য ঈশ্বরচন্দ্র সে সমাজব্যূহ

ভেদ করিয়া তাঁহার অলঙ্ঘনীয় সঙ্কল্প সাধন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র আজি আমাদের এই চরম শিক্ষা দান করিতেছেন, এই শিক্ষা যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হস্তে, পরের হস্তে নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বঙ্গভাষায় সুমার্জিত নির্মল হৃদয়গ্রাহী গদ্যগ্রন্থ নাই। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তাহার সৃষ্টি করিলেন, সংস্কৃত ভাষার অমূল্য ভাণ্ডার হইতে সুন্দর সুন্দর পবিত্র গল্প ও পবিত্র ভাব নির্বাচন করিলেন, সংস্কৃতরূপ মাতৃভাষার সাহায্যে নূতন বাঙ্গলা ভাষায় সেই গল্প ও সেই ভাব প্রকাশ করিলেন, নিজের হৃদয়গুণে, নিজের প্রতিভাবলে সেই গল্পগুলি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করিলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, কোন বাঙ্গালী ভদ্র-মহিলা এই পুস্তকগুলি পড়িয়া চক্ষুর জল না বর্ষণ করিয়াছেন? কোন সহৃদয় বাঙ্গালী অদ্যাবধি যত্ন সহকারে না পাঠ করেন? ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সঙ্কল্প সাধিত হইল,—নির্মল সুমার্জিত বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতেই বিদ্যাসাগর নিরস্ত রহিলেন না। আপনি যে পথে গিয়াছেন, প্রতিভাসম্পন্ন স্বদেশবাসীগণকে সেই পথে লইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত না শিখিলে বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা গদ্যের উন্নতি নাই। কিন্তু সংস্কৃত কে শিখায়, কে শিখে? টোলে পড়িতে গেলে অর্ধেক জীবন তথায় যাপন করিতে হয়,—তখনকার পণ্ডিতগণ বলিতেন, এরূপ না করিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। তবে কি শিক্ষিত হিন্দুগণ চিরকাল ঐ পবিত্র ভাষায় বঞ্চিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুগণের পবিত্র রত্নরাজি ও অনন্ত ভাণ্ডার হিন্দুদিগের চিরকাল অবিদিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুজাতির গৌরবস্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য কেবল অল্পসংখ্যক লোকের একচেটিয়া ধন হইয়া থাকিবে?

বিদ্যাসাগর চিন্তা করিলেন, বিদ্যাসাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন,

বিদ্যাসাগর কার্য সম্পন্ন করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা একচেটিয়া উঠিয়া গেল, সহস্র দেশানুরাগী যুবক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত সরল প্রণালী দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের মধুরতা আস্বাদন করিল, প্রাচীন গ্রন্থের, প্রাচীন রীতির, প্রাচীন ধর্মের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা অনুভব করিল। ফলে আদি হিন্দুসমাজ সেই প্রাচীন পবিত্রতার দিকে ধাবিত হইতে চলিল। স্বার্থপর লোকের কি এ সমস্ত গায়ে সহে? হিন্দুধর্মের ভণ্ডামি করিয়া যাহারা পয়সা আদায় করে, তাহারা সনাতন হিন্দুধর্মের দ্বার উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার দ্বার রুদ্ধ কর,—আবার শিক্ষিত দেশহিতৈষীদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত কর, আবার স্বার্থপরদিগকে সেই ভাণ্ডারের প্রহরী স্বরূপ স্থাপন কর, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য নষ্ট হয়। কিন্তু ভাণ্ডারীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। প্রকৃত হিন্দুধর্ম লোপ হইয়া উপধর্মের অন্ধকারে দেশ পুনরায় আবৃত হয়, তাহাতে হানি কি? ভাণ্ডারীদিগের পয়সা আদায়ের উপায় হয়।

বৃথা আশা! জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, হিন্দুজাতি আপনাদিগের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিজ্ঞান, প্রাচীন ধর্ম পুনরায় চিনিতে পারিয়াছে, তাহারা সে-ধনে আর বঞ্চিত হইবে না।

তাহার পর? তাহার পর--বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতি সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুনারীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করাতে স্বার্থপর পুরুষে কত বাধা দেয়, তাহা আমরা আধুনিক ঘটনা হইতে দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা নিজে আর্যসন্তান বলিয়া দর্প করেন, তাঁহারাই বাল্য-বিবাহ, বিধবার চিরবৈধব্য প্রভৃতি অনার্য প্রথাগুলি সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যাঁহারা নিজে হিন্দুয়ানির গর্ব করেন, তাঁহারাই রমণীগণকে অশিক্ষিত রাখা

ও দাসীর ন্যায় ব্যবহার করা প্রভৃতি অহিন্দু আচারগুলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ সমস্ত কুপ্রথা ও কুতর্কের একমাত্র ঔষধি আছে ;—এ সমস্ত অহিন্দু আচার প্রতিবিধান করিবার একমাত্র উপায় আছে ;—সে ঔষধি ও সে উপায়,—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের আলোচনা।

অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল, সহজে অনুভব করা যায়। সামান্য লোকে এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত,—কৃতসঙ্কল্প ঈশ্বরচন্দ্র হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি,- অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা,— অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির বল, উপধর্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দুধর্মের গণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিগের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গ সমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমাদিগের নির্জীব বঙ্গ সমাজে এরূপ ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই,—পবিত্রনামা রামমোহনের সময়ের পর এরূপ তীব্র যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক দ্বন্দ্ব, এরূপ সঙ্কল্প, এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ সিংহবীর্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষসিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা, জড়তা ও স্বার্থপরতা হাটিয়া গেল, সামাজিক যোদ্ধা অসি হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আইন জারি করাইলেন; বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিদ্যাসাগরের বিজয়লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইল।

আর একটি মহৎ কার্যে ঈশ্বরচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন। আমাদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সন্তানাদি না হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বিধান আছে, নচেৎ ইচ্ছানুসারে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যদেহের

সৌন্দর্য, বল, তেজ ও গৌরব সমস্তই যেরূপ মৃত্যুর পর লোপ প্রাপ্ত হয় এবং অবয়বখানি বিকৃত ও পূতিগন্ধে পূর্ণ হয়, জাতীয় জীবন লোপ হইলে জাতীয় ধর্মও সেইরূপ সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও উপকারিতা হারাইয়া নানারূপ জঘন্য আচার-ব্যবহারে পরিবৃত হয়। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কারণ ও আবশ্যকতা বিস্মৃত হইয়া এখনকার স্বার্থপর, বিশাল লালসাপরায়ণ পুরুষগণ ইচ্ছানুসারে বহু বিবাহ করাই হিন্দু আচার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীগণ এই কুপ্রথাই ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এইরূপেই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের ধর্মের সর্বনাশ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনদ্বারা বহু বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাহাতে বিফল-প্রযত্ন হইলেন। আমাদিগের বিদেশীয় রাজা সত্যই বলিলেন, "যদি তোমাদের সামাজিক কোনও কুপ্রথা উঠাইবার ইচ্ছা থাকে, সমাজ সে বিষয়ে যত্ন করুক, আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল দণ্ডনীয় অপরাধমাত্র আমরা নিষেধ করিতে পারি। রাজা এবাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন। পাশব অপরাধ দুই-একটি আইনদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, নচেৎ সামাজিক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পরে আজি ছয় বৎসর হইল যখন রাজকীয় কার্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম। এই সূত্রে তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার উদারতা, তাঁহার সহৃদয়তা, তাঁহার প্রকৃত দেশহিতৈষিতা ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদর্শিতা যতই দেখিতে লাগিলাম,

ততই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার সুন্দর পুস্তকালয় তিনি আমাকে দেখাইলেন, তাঁহার সংস্কৃত পুঁথিগুলি বসিয়া বসিয়া ঘাঁটিতাম। অনেক বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙ্গালী মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, একথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ধর্মব্যাপারীগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্বনাশ বলিয়া গলাবাজি করিতে লাগিল,—গলাবাজিতে পয়সা আসে। ধর্মের দোকানদারগণ অনুবাদ ও অনুবাদককে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, গালিবর্ষণে পয়সা আসে! এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিনি বলিলেন, "ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনোরূপে পারি, তোমাকে সাহায্য করিব।" পাঠকগণ, প্রকৃত হিন্দুয়ানি ও হিন্দুধর্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন? নিঃস্বার্থ দেশোপকার এবং দেশের নাম লইয়া পয়সা উপায়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন? সর্বসাধারণকে প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রে দীক্ষিত করা, এবং হিন্দুশাস্ত্র সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার নাম লইয়া রোজগারের উপায় উদ্ভাবন করার মধ্যে কি বিভিন্নতা অবগত হইলেন?

আজি সে মহাপ্রাণ হিন্দু-অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর নাই,—সমস্ত দেশের লোকে তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে, তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলা হইতে আমিও একবিন্দু অশ্রুবারি মোচন করিলাম। কিন্তু আমাদের রোদন যদি অশ্রুবিন্দুতেই শেষ হয়, তাহা হইলে আমরা বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ করিতেও অযোগ্য। তাঁহার জীবন হইতে কি কোনো শিক্ষালাভ করিতে পারি না? তাঁহার কার্য-পরম্পরা আলোচনা করিয়া কি কোনো উপকার লাভ করিতে পারি না?

ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় তেজস্বিতা, মানসিক বল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজা পথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি; একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি। যেটি সমাজের উপকারী, যেটি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অভিমত সে প্রথাটি যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি। যেটি সমাজের অপকারক, যেটি হিন্দুধর্মের অনভিমত, সে প্রথা যেন ক্রমে ক্রমে বর্জন করিতে শিখি। প্রাচীন শাস্ত্রে ও সনাতন হিন্দুধর্মে যেন আস্থা হয়। উপনিষদাদি প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থপাঠে যেন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা দেশে প্রচারিত হয়,—প্রস্তর ও মৃত্তিকার পূজা যেন বিলুপ্ত হয়। আর্যসন্তানগণ যেন প্রাচীন আর্যের ন্যায় নিজের দেবকে স্মরণ করিয়া নিজে আহুতি দিতে শিখেন,—ধর্মানুষ্ঠানে কালীঘাটের পাণ্ডাকে মোক্তারনামা দিবার আবশ্যক নাই। এবং মনুর সন্তানগণ যেন মনুর আদেশ অনুসারে নারীকে সম্মান দিতে শিখেন, যোগ্য বয়সে কন্যার বিবাহ দেন, অল্পবয়স্কা বিধবার পুনরুদ্বাহ প্রথা প্রচলিত করেন, বহু বিবাহ প্রথা বর্জন করেন এবং পাশব আচরণ বিস্মৃত হইয়া মনু-সন্তানের নামের যোগ্য হয়েন। হত্যা, সুরাপান, চৌর্য, পরস্ত্রীগমন এবং পাপীর সংসর্গ, এইগুলি মনুর মতে মহাপাতক। এই দোষের জন্য যদি সমাজ দোষীকে দণ্ডিত করিতে শিখেন, তবেই সমাজ আর্য নামের যোগ্য হইবে, এবং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে।

সমাজ কাহাকে বলে? মনুষ্য জড় হইয়াই সমাজ হয়। যদি আমরা প্রত্যেকে একটু করিয়া সৎপথে যাইতে প্রয়াস করি, ভণ্ডামির কথা না শুনি, অসৎকার্যে বিমুখ হই, তাহা হইলে সমাজ উন্নতির পথে চলিবে। সেদিন রথযাত্রা হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড রথ,

তাহাকে টানে মনুষ্যের সাধ্য নাই, কিন্তু শত শত লোকে দড়ি ধরিল, সকলে একটু একটু করিয়া টানিল, রথ হড়-হড় করিয়া চলিল। আমরা সকলে যদি আমাদের ক্ষুদ্র বল ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজকে সনাতন প্রশস্ত পথে চালিত করি, সমাজ সেদিকে চলিবে। যদি আমরা সেটুকুও না করিতে জানি, তবে আমাদের শিক্ষা বৃথা, আমাদের হিন্দু নামে অভিমান বৃথা, এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বৃথাই আমাদিগের মধ্যে জন্মধারণ করিয়া আজীবন আমাদিগের জন্য শ্রম করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তের যে যুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার প্রধান পুরুষ পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এককালে রামমোহন রায় যেমন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী ও আদর্শ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার পদভারে বঙ্গ সমাজ কাঁপিয়া গিয়াছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ-বারো টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটি জুতা সুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মিলেন, তাঁহারা গুণ-গৌরবে ও তেজস্বিতার জন্য সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোনও পারিবারিক

বিবাদে উত্যক্ত হইয়া স্বীয় পত্নী দুর্গাদেবীকে পরিত্যাগপূর্বক কিছুকালের জন্য দেশান্তরী হইয়া গিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী নিরাশ্রয় হইয়া বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ১৫ বৎসর হইবে তখন জননীর দুঃখ নিবারণার্থ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতাতে আগমন করেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যে ঘোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার হৃদয়বিদারক বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক দিনের পর, অনেক ক্লেশ ভুগিয়া, অবশেষে একটি আট টাকা বেতনের কর্ম পাইয়াছিলেন। এই অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাদের প্রথম সন্তান।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ৎকাল গ্রাম্য পাঠশালাতে পড়িয়া পিতার সহিত কলিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার পিতার মনিব বড়বাজারের ভাগবত সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতা-পুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত। এই সময় ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমণি তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনোদিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সেও রাইমণির কথা বলিতে দর দর ধারে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

কলিকাতাতে আসিয়া কয়েক মাস পাঠশালে পড়িবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। কলেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের

জুন মাসে তিনি ভর্তি হইলেন, ছয় মাসের মধ্যেই তিনি মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কলেজের সমুদয় উচ্চবৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিলেন। সে সময়ে মফঃস্বলের ইংরাজ জজদিগের আদালতে এক-একজন জজ-পণ্ডিত থাকিতেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা দেওয়া তাঁহাদের কার্য ছিল। সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ঐ কাজ প্রাপ্ত হইতেন। তাহা একটা প্রলোভনের বিষয় ছিল। কিন্তু উক্ত কর্মপ্রার্থীদিগকে ল কমিটি নামক একটি কমিটির নিকট পরীক্ষা দিয়া কর্ম লইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখন ল কমিটির পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্ত হন; কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস অত দূরে যাইতে দিলেন না।

১৮৪১ সালে তিনি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়িতে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলে সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কী সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকে জানেন না; এমন কি, তাঁহার হাতের ইংরাজী লেখাটিও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজীওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয়। এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা-যত্নে করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মোন্নতিসাধনের ইচ্ছা এরূপ প্রবল ছিল যে, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে ঐ ইচ্ছা সংক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার কেরানীর কর্মটি খালি হইলে, তাঁহারই চেষ্টাতে তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে কর্মটি প্রাপ্ত হন।

দুর্গাচরণবাবু ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ঐ কর্মে থাকিয়া, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহাই দুর্গাচরণবাবুর সকল ভাবী উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার কারণ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। এই সময়ে আর-এক বন্ধুর দ্বারা আর-এক কার্যের সূত্রপাত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিলেন যে, তাঁহারা যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, সে প্রণালীতে ইঁহাকে শিখাইলে চলিবে না, অনর্থক অনেক সময় যাইবে। সুতরাং নিজে চিন্তা করিয়া এক নূতন প্রণালীতে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার উত্তরকালে রচিত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতির সূত্রপাত হইল।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই-এক বৎসরের মধ্যে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারম্ভে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরানীগিরি কর্ম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবের অনুরোধে, মাসিক ৮০ টাকা বেতনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদে তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। ঐ সালেই তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া চলিয়া যাওয়াতে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নানা প্রকার সংস্কারকার্যে হস্তার্পণ করেন। (১ম) প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ; (২য়) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতির ছাত্রগণের জন্য কলেজের দ্বার উদ্ঘাটন; (৩য়) ছাত্রদিগের বেতনগ্রহণের রীতি প্রবর্তন, (৪র্থ) উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন; (৫ম) ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশপ্রথা প্রবর্তন; (৬ষ্ঠ) সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্তন সংঘটন করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা এখন কল্পনা করিতে পারি না। সেকালের লোকের মুখে তাঁহার শ্রমের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

ইহার পর দিন-দিন তাঁহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ১৮৪৭ সালে তাঁহার "বেতাল পঞ্চবিংশতি" মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। "বেতাল" বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল। তৎপরে ১৮৪৮ সালে "বাঙ্গালার ইতিহাস", ১৮৫০ সালে "জীবনচরিত", ১৮৫১ সালে "বোধোদয়" ও "উপক্রমণিকা", ১৮৫৫ সালে "শকুন্তলা" ও "বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হইল। বিদাসাগর মহাশয়ের নাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল।

শিক্ষাবিভাগে ইন্‌স্পেক্‌টারের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ইন্‌স্পেক্‌টারের পদ প্রাপ্ত হন। একদিকে যখন তাঁহার পদ ও শ্রম বাড়িল, তখন অপরদিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সালেই বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজসংস্কারে এই তাঁহার প্রথম হস্তক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালের

মে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনকার্যে আপনাদের দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করেন।

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসরে তাঁহার কার্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। একদিকে বিধবা-বিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, বিধবা-বিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা, কার্যত বিধবা-বিবাহ দিবার আয়োজন, এই সকলে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইল ; অপরদিকে এই সময়েই শিক্ষাবিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টার মিস্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায়-জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন লইয়া ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলায় স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে কার্যে পরিণত করিবার সময় ও সুবিধা উপস্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত তাঁহার সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়ং সাহেব, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গভর্নমেণ্টের অর্থব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর করিলেন না। এই সঙ্কটে বিদ্যাসাগর লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের শরণাপন্ন হইলেন। সে যাত্রা তাঁহার মুখ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ডিরেক্টার তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথায় কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল। এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্ত এই বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিবাদের

মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়।

এদিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র-বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল তাহার অনুরূপ জাতীয় আন্দোলন আমরা অল্পই দেখিয়াছি। ইতিপূর্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবা-বিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্যত বিধবা-বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মহিলা গোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি, বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।

এই সকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে যে কতিপয় বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসাহ ও হৃদয়ের অনুরাগদানে সবল করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে (রামতনু) লাহিড়ী মহাশয় একজন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণায় অশ্রুপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন, তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না। প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময় বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতা বশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং চরিত্র-মহত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে, সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা

ক্ষমতার কার্য, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতার বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে, স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধি-রচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব অন্যান্য প্রতিভায় যেমন "অরিজিন্যালিটি" অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্র-বিকাশেও সেই অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দী মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এইরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দু-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়লোকের অভ্যুত্থান হয়, তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য

দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায় যে, চরিত্রের ছাঁদ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের কোনো কোনো অংশ রাখালের সঙ্গেই অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণ পরিচয়ের সর্বজন-নিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালিহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়,

তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রকৃতির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল-কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্ত এবং ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ—পুরুষোচিত; এই জন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না: বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য নিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে না। এমন কি, কার্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয় স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালো মানুষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের সেই কাপুরুষতা ছিল না।

বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছল স্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভুরি-ভুরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিল-মাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সঙ্কল্পের ঋজু রেখা হইতে কোনো যন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্র-পরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্ত বুদ্ধি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সাহসের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানী বৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস শাখাপল্লবসম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ, নিজের অশন-বসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবী অথবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মান-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না।

ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দরিদ্রা জননীদেবী চরকাস্‌সূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহ-মণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতি-চাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। আমাদের এই দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গ সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগ্‌কেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনোরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পলাশির লড়াই-এর কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালী-চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌ যত, কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও আমাদের মতো বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে বোধহয় আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজির আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে;

এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়তো অসম্ভব; তথাপি ঐ সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে-বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা।

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আন্দোলন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; বঙ্গদেশে তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা,

এই দুর্দমতা ও অনন্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধ মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্রজীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতা পিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোনিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম; কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেস্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনোরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্বেই সমগ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল। আর নতুন মসলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই।

যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেক-ভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিরাট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণদ্বারা পরত্বগ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানু-ক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত ও সমাজতত্ত্বঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন, পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব।— কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দের মধ্যে শতকরা নব্বুইটি কার্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর-একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতগ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল, কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনামাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা

প্রবহমানা ; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম ; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব ; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। তিনি আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন ; কিন্তু পরের জন্য তিনি রোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এসময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিত্রলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট কথা বলেন না।···বস্তুতই দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্য-পথে চালাইত, তিনি সেইপথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন ; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই কথাটা না তুলিলে চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা-বিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত, দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের

মর্মস্থলে ব্যথা দিত, তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝার ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বাল্যবিধবার দুঃখদর্শনে হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে? বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য নেই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটিভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষপর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন। …বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোনো-না-কোনো প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর।

আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন-সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না? কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নতুন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সে মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

বাংলাদেশে বিলাতী মাল বর্জনের জন্য যে জোর আন্দোলন চলছে, এটা সাধারণ ঘটনা নয়। বাংলাদেশে যথেষ্ট শিক্ষা বিস্তার হয়েছে এবং বাঙালীরা বেশ বুদ্ধিমান জাতি। সেইজন্য ওখানে এমন আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। স্যার হেনরি কটন বলেছেন, বাংলা কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত শাসনকার্য চালায়। এর কারণ জানার প্রয়োজন আছে।

এটা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক জাতির উন্নতি বা অবনতি তার বিশিষ্ট জনকের উপর নির্ভর করে। যে জাতির মধ্যে ভালো ভালো লোক জন্মায়, তার উপর ঐসব লোকদের প্রভাব না পড়ে যায় না। বাঙালীদের কিছু বিশেষত্ব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এর কিছু কারণ আছে, যার মধ্যে মুখ্য কারণ হ'ল যে, গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন। রামমোহন রায়ের পর ওখানে একের পর এক মহাপুরুষের আগমন হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান এত বেশী ছিল যে, কলকাতার বিদ্বৎ সমাজ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেন। তবে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যাসাগরই ছিলেন না, তিনি দয়া, উদারতা ও অন্য অনেক সদ্‌গুণেরও সাগর ছিলেন। উনি হিন্দু, তার ওপর ব্রাহ্মণও ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে ব্রাহ্মণে-শূদ্রে, হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ ছিল না। যিনি ভালো কাজ করেন তিনি উচ্চ-নীচে প্রভেদ করেন না। তাঁর গুরুর ওলাউঠা রোগ হয়েছিল, তিনি তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। তাঁর জন্য নিজে খরচা করে ডাক্তার আনিয়েছিলেন, নিজের হাতে মলমূত্র পরিষ্কার করেছিলেন।

উনি চন্দ্রনগরে দই রুটি কিনে গরীব মুসলমানদের খাওয়াতেন এবং প্রয়োজন হলে পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। রাস্তায় কোনো পঙ্গু অক্ষম দুঃখী দেখলে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার দেখা-শোনা করতেন। উনি পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ ও পরের সুখকে নিজের সুখ বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। অঙ্গে মোটা ধুতি, মোটা চাদর এবং পায়ে সাধারণ চটি, এই ছিল ওনার পোশাক। ঐ পোশাকে উনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতেন ও ঐ পোশাকেই গরীবদের অভ্যর্থনা জানাতেন। ঐ ব্যক্তি সত্যকারের ফকির, সন্ন্যাসী অথবা যোগী ছিলেন। ওঁর জীবন পর্যালোচনা করে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

মেদিনীপুর তালুকের ছোট এক গাঁয়ে গরীব মা-বাবার ঘরে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। তাঁর মা খুব সাধ্বী ছিলেন। আপনার মায়ের অনেক গুণ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা খুব কম ইংরেজি জানতেন। তিনি নিজ পুত্রকে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দানের সঙ্কল্প নেন। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং আট বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ষাট মাইল দূরে কলকাতায় পড়তে যান। সেখানে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ওনার স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, উনি কলকাতা পৌঁছাতে-পৌঁছাতে মাইল-স্টোনের সংখ্যা দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখে নিয়েছিলেন। ষোলো বছর বয়সেই ওনার খুব ভালো সংস্কৃত শেখা হয়ে গিয়েছিল এবং উনি সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। যে কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন, ধাপে ধাপে উঠতে-উঠতে সেই কলেজেরই তিনি প্রধান আচার্যের পদ লাভ করেন। সরকার তাঁকে খুব মান্য করতেন। কিন্তু নিজের স্বতন্ত্র প্রকৃতির জন্য, উনি শিক্ষা বিভাগের এক ডাইরেক্টরের কথা সহ্য করতে পারেননি এবং সে-কারণে ঐ কাজে ইস্তফা দেন। বাঙলার তৎকালীন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর

স্যার ফ্রেড্রিক হেলিডে তাঁকে পদত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে অক্ষমতা জানান।

চাকরি ছাড়ার 'পর ঈশ্বরচন্দ্রের মহত্ত্ব ও মানবিকতার পরম বিকাশ ঘটে। তিনি দেখলেন তাঁর সুন্দর মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম। তাই তিনি বাংলায় গ্রন্থ রচনা শুরু করলেন। উনি ছোটদের জন্য খুব সুন্দর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আজ বাংলা ভাষার যে বিকাশ দেখা যায় তার জন্য বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সম্মান পাওয়া উচিত।

তারপর উনি দেখলেন পুস্তক রচনাই যথেষ্ট নয়। তার জন্য তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজ বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রারম্ভ থেকে ঐ কলেজ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত।

উচ্চ শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, প্রাথমিক শিক্ষারও তেমনই প্রয়োজন। সেই কাজে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন ছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর বলেছিলেন যে, সরকার ব্যয়ভার বহন করবেন। সেই আশ্বাসে বিদ্যাসাগর গরীবদের জন্য প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড এলেনবেরি এর বিরুদ্ধে ছিলেন। সে-কারণে বিদ্যাসাগর যখন খরচের জন্য আবেদন জানান তখন তা মঞ্জুর করা হয়নি। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের তাতে খুবই দুঃখ হয় এবং তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেন—'আপনি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করুন।' বীর বিদ্যাসাগর তার জবাবে বলেন—'আমি নিজের প্রয়োজনে আদালতে যাইনি, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব, এ কেমন করে সম্ভব?' তিনি নিজে খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন না, তাই অপরের দুঃখ দূর করতে গিয়ে তাঁর অনেক ঋণ হয়। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিতে তিনি কখনও স্বীকৃত হননি।

উনি উচ্চ শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপন করেই

সন্তুষ্ট হতে পারেননি। উনি দেখলেন, স্ত্রী শিক্ষার অভাবে শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। উনি মনুস্মৃতি খুঁজে এক শ্লোক বার করেন যাতে বলা হয়েছে, স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাই স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপযোগী করে তিনি পুস্তক রচনা করেন এবং বীটন (বেথুন) সাহেবের সহযোগিতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ স্থাপন করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে ছাত্রী যোগাড় করা অনেক কঠিন কাজ। উনি স্বয়ং সাধু-জীবন যাপন করতেন এবং মহান বিদ্বান ছিলেন, সে-কারণে তাঁকে সমস্ত লোক সম্মান করতেন, তাই উনি যখন সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে তাঁদের মেয়েদের কলেজে পাঠানোর কথা বললেন তাতে সকলেই সাড়া দিলেন। সম্মানিত ঘরের মেয়েরা কলেজে যেতে আরম্ভ করল।

কিন্তু তাতেও উনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ছোট মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উনি ঐ কলেজেরই প্রাঙ্গণে পাঠশালা খোলেন। সেখানে মেয়েদের জামা-কাপড়, খাবার, বই প্রভৃতি দেওয়া হ'ত। এসবের জন্যই এখন কলকাতায় হাজার-হাজার শিক্ষিতা মেয়ে দেখা যায়।

উনি হিন্দু-বিধবাদের অসহনীয় অবস্থা দেখে বিধবা-বিবাহের উপদেশ দিতে শুরু করেন। সে কাজের জন্য তিনি পুস্তক রচনা করেন ও বহু ভাষণ দেন। বাংলার ব্রাহ্মণকুল তাঁর বিরোধিতা করেন, কিন্তু তিনি তাতে নিরুৎসাহ হননি। তাঁকে হত্যার জন্যও লোকেদের নীচতা প্রকাশ পায়, তিনি প্রাণের ভয় করতেন না। বিধবা-বিবাহ বৈধ করার জন্য তিনি সরকারকে দিয়ে আইন প্রণয়ন করান। তিনি বহু লোককে বুঝিয়েছিলেন এবং অনেক সম্মানিত বংশের বাল্যবিধবাদের তিনি পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজ পুত্রেরও এক দরিদ্র বিধবার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন।

তখন কুলীন ব্রাহ্মণরা বহু বিবাহ করত। তাদের কি না ত্রিশটি পর্যন্ত

বিবাহ হ'ত। সেই সব স্ত্রীদের দুঃখে বিদ্যাসাগর কাঁদতেন। ঐ কুপ্রথা বন্ধের জন্য তিনি জীবনভর চেষ্টা করেছিলেন।

এইভাবে জীবন-যাপন করে সত্তর বছর বয়সে, ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর মারা যান। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই জন্মেছেন। একথা বলা যেতে পারে যে, যদি ঈশ্বরচন্দ্র কোনো ইউরোপীয় দেশে জন্মাতেন তবে ইংলণ্ডে নেলসনের যেমন স্মারক বানানো হয়েছে, সেই-রকম স্মারক ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরও স্থাপিত হ'ত। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের স্মারক আজ বাংলার ছোট অথবা বড়, গরীব অথবা আমির, সব লোকের হৃদয়ে স্থাপিত।

আমার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করি। সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার মনে চিরজাগ্রত। সেই সময়ে তিনি আমাকে একখানি 'রবিনসন ক্রুশো' উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের হাতে দেওয়া সেই উপহারটি আমি সযত্নে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করিয়াছি। তাহার পর আমার কর্ম-জীবনের আরম্ভে আমি আর-একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁহার মেট্রোপলিটন কলেজে একটি অধ্যাপকের চাকরি দিয়াছিলেন।

'বিদ্যাসাগর' এই কথাটি আমার নিকট একজন মানুষের নাম মাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর —এই কথাটির উচ্চারণেই পুণ্য। ইহা আমার উচ্ছ্বাসের কথা নয়, উপলব্ধির কথা। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, চরিত্র বিকশিত হইয়াছে। তিনিই দেশীয় পোশাকের গৌরব শিক্ষিত-সমাজে প্রথম বাড়াইয়া-ছিলেন; তিনি যদি ধুতি চাদর ও চটিজুতা পরিহিত হইয়া সর্বসমক্ষে যাতায়াত না করিতেন তাহা হইলে আমরা, অন্তত আমি, আজ দেশী পোশাকের প্রতি অনুরক্ত হইতাম কি না সন্দেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অসাধারণত্বের মধ্যে এই একটি।

সেই মহামানবের কর্মকীর্তির কথা আমি আর নূতন করিয়া কি বলিব, আর কতটুকুই বা বলিতে পারি? শুধু ইহাই বলিতে পারি—ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান। পৃথিবীর ইতিহাসেও ঠিক এমন একটি চরিত্রের মানুষ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন, অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধারণ। বস্তুত তিনি অসাধারণত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা; তাঁহার জীবনের অতি ক্ষুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্মী ছিলেন—কল্পনা-বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, উহা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁহার চরিত্র-মহিমায় বাঙালীর বহুদূরের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে আর কেহই তাঁহার ন্যায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু করিয়াছি, তাহা তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া। শিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা। সেই সাধনার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার কথা, পিতামাতার প্রতি ভক্তির কথা এক্ষণে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। পিতামাতা যে আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা—ইহা তিনি যেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন আর কেহ পারে নাই, পারিবেও না। আমার পিতৃদেব প্রায়ই বলিতেন—এই বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরই একমাত্র মানুষ যিনি মানুষের দুঃখ বুঝিতেন, মানুষের দুঃখে কাঁদিতে জানিতেন এবং সেই দুঃখমোচনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। দয়া জিনিসটি যে কি তাহা তিনি যেমন করিয়া শিখাইয়াছেন, এমন আর কেহ পারিল না। এইজন্যই বাঙালীর হৃদয়ে বিদ্যাসাগরের আসন চিরকাল। পৃথিবীর অমর মহামানবদের সমগোত্রীয় তিনি। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

৬. ৪. ১৮৪৬ হইতে ১৫. ৭. ১৮৪৭-এর মধ্যে কোনো এক সময়ের ঘটনা। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ও মিঃ জেমস্ কার হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ।

একদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রয়োজনে সংস্কৃত কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কার সাহেব তখন তাঁহার কামরায় সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পাদুকা-শোভিত পদযুগল সম্প্রসারিত করিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া পদযুগল নামাইলেনও না বা গুটাইলেনও না, বরং পায়ের দিকে যে চেয়ার ছিল অঙ্গুলিসংকেতে তাহাতে বিদ্যাসাগরকে বসিতে বলিলেন। সেই অবস্থায় কথাবার্তা সারিয়া বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কি প্রয়োজনে কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্যাসাগর টেবিলের উপর তাঁহার তালতলার চটি-শোভিত পদযুগল কার সাহেবের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া কথাবার্তা বলিলেন। এই ব্যবহারে কার সাহেব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া উপরিওয়ালার নিকট নালিশ করিলেন। বিদ্যাসাগরের নিকট লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করা হইলে তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অবিকল ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম দুই কারণে; প্রথম, বাংলা অনুবাদে মূলের তীব্র ব্যঙ্গরস রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; দ্বিতীয়, এই সময়ের মধ্যেই তিনি ইংরাজি রচনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগর লিখিলেন, "I thought that we (natives) were an uncivilised race quite unacquainted with refined manners of receiving a gentleman visitor. I learned the

manners of which Mr. Kerr complains from the gentleman himself, a few days ago, when I had an occasion to call on him. My notions of refined manners being thus formed from the conduct of an enlightened, civilised European, I behaved myself as respectfully towards him as he had himself done."

২৮. ১. ১৮৭৪ তারিখে কাশীর হিন্দী কবি ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবকের সঙ্গে বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম বা যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথম দুই ব্যক্তির পরিধানে প্যান্ট, কোট ও বিলাতী জুতা ছিল। বিদ্যাসাগরের কটিতে ধুতি, গাত্রে শুধু চাদর ও পদে তালতলার চটি ছিল। প্রথম দুইজন বিনা বাধায় ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যাসাগরকে দ্বারবান আটকাইল, বলিল, চটি-জুতা খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়া পথে অপেক্ষমান গাড়িতে বসিয়া সঙ্গী দুইটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ছুটিয়া আসিয়া জোড়হস্তে বিদ্যাসাগরকে ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই যাইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, তাঁহার জন্য এক নিয়ম ও সাধারণের জন্য আর-এক নিয়ম হইতে পারে না। যতদিন না সর্বসাধারণে চটিজুতা পরিয়া ভিতরে যাইবার অধিকার পায়, ততদিন তিনি ভিতরে যাইবেন না। এ বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্টে পর্যন্ত বহুদিন ধরিয়া বিস্তর লেখালেখি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা শেষপর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত নিয়ম তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন না। বিদ্যাসাগরও আর কোনোদিন এশিয়াটিক সোসাইটির বা যাদুঘরের ছায়া মাড়ান নাই।

এই পণ্ডিত বেশে, শুধু ধুতি চাদর ও চটিজুতা পরিয়া তিনি সর্বত্র, এমন কি লাটভবন পর্যন্ত যাইতেন। একবার ছোটলাট হ্যালিডে

সাহেব তাঁহাকে ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লাটভবনে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তাহার উত্তরে লাট সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, তাহা হইলে সেইটিই লাট সাহেবের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎকার। কারণ লাট সাহেবের অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার আর লাটভবনে আসা হইবে না। লাট সাহেব অবস্থা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়া পূর্ববৎ দেশী পরিচ্ছদেই বিদ্যা-সাগরকে তৎসকাশে আসিতে বলিলেন।

বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতা-সুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, একথা শুনিয়া তাঁহার একটুও অবিশ্বাস হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের বাংলাদেশে আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যেও তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলেন। অগণিত গুণের বিচিত্র সমাবেশ নিয়ে তিনি একক মাহাত্ম্যে জীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চলে গেছেন। তিনি যে আছেন তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকলে অনুভব করেছে এবং সকলেরই শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি আপনা হতে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর জন্মের সার্ধশতবৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার প্রস্তাব করি।

তাঁর সমসাময়িক মানুষদের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েই এই মূল্যায়ন আরম্ভ করা যাক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু তাঁর সমসাময়িক ছিলেন না, বন্ধু ছিলেন। কাছে থেকে জানবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল। তিনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে স্ত্রীর নিকট মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগর এমন একজন মানুষ 'যাঁর মনীষা প্রাচীন ঋষিদের মতো, কর্মদক্ষতা ইংরেজের মতো এবং হৃদয়বত্তা বাঙালী জননীর মতো।' এই উক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর ওপর প্রযোজ্য তা তাঁর জীবনী হতেই প্রমাণিত হয়।

তাঁর ধী-শক্তির প্রমাণ রয়েছে তাঁর ছাত্রজীবনের অনন্যসাধারণ কীর্তির মধ্যে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্তদর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ এবং স্মৃতির সবগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একটি ছাড়া কোনোটিতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেননি। কলেজের কর্তৃপক্ষ এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত

করে এবং একটি বিশেষ প্রশস্তিপত্র প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন।

মাইকেল তাঁর কর্মশক্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাও তাঁর প্রাপ্য। কর্মবহুল তাঁর সমগ্র জীবনই তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে তাঁর কর্মের ক্ষেত্র কত বিস্তৃত এবং বিচিত্র ছিল তার আভাস পাওয়া যাবে যে কয় বৎসর তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন সে সময়কার বিবরণ হতে। ১৮৫১ হতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তার ব্যাপ্তি। সংস্কৃত কলেজের প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করা ছাড়া এই সময় তিনি দক্ষিণ বাংলার চারটি জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কাজও করতেন। শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের জন্য এই সময় তিনি শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য কতকগুলি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ দায়িত্বে তিনি এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি চালু প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করা অপেক্ষা একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আরও কষ্টসাধ্য। এই নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলার দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করবার জন্য তিনি এই সময় বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি এই প্রসঙ্গে 'বর্ণপরিচয়' হতে শুরু করে 'বোধোদয়', 'কথামালা' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 'শকুন্তলা' গ্রন্থও রচনা করেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজসাধ্য করবার জন্য এই সময়ের মধ্যেই তিনি 'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী' প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন।

একই সময় অতিরিক্তভাবে তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিধিবদ্ধ করতে আগ্রহী হয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন পাস করতে বাধ্য করান। এই প্রসঙ্গে বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থন আছে এমন শাস্ত্রবাক্য অন্বেষণের জন্য তাঁকে অনেক প্রাচীন পুঁথি পড়তে হয়েছিল, জনমত গড়ে তোলবার জন্য একাধিক পুস্তিকা রচনা করতে হয়েছিল; এবং তাদের সমর্থনের জন্য

সভা-সমিতি করতে হয়েছিল। এতগুলি কাজ তিনি অনায়াসে করে যেতে পেরেছিলেন। তা তাঁর কর্মশক্তির সুন্দর পরিচয় দেয়। কাজেই তাঁর চরিত্রের ওই গুণটি যা মাইকেলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তাঁর হৃদয় যে বাঙালী জননীর মতো মমতায় পরিপূর্ণ ছিল তা প্রমাণিত করবার জন্য বেশী তথ্যস্থাপনের প্রয়োজন নেই। অর্থার্থী মানুষের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা যে সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত তা সর্বজনবিদিত। তাঁর অগণিত দাক্ষিণ্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর চরিত্রের এই গুণটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল বলেই সাধারণ মানুষ তাঁকে 'দয়ার সাগর' নামে ভূষিত করেছিল। মানবসেবাকেই তিনি ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন, আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাঁর আয়ের একটি বড় অংশ অভাবী মানুষের আর্থিক কষ্টমোচনে ব্যয়িত হ'ত।

বাংলার আর-একজন বিশিষ্ট সন্তান বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রশস্তি লিখে গেছেন। মনে হয় তাঁর চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে যতখানি মুগ্ধ করেছিল তেমন বাংলার অন্য কোনো বিশিষ্ট সন্তানকে করেনি। দয়া, বিদ্যা ও কর্মশক্তি ছাড়াও বিদ্যাসাগর-চরিত্রে তিনি আরও দুটি অতিরিক্ত গুণ দেখেছিলেন যা তাঁর বিবেচনায় আরও মহত্তর গুণ। তিনি বলেছেন: 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' (বিদ্যাসাগর-চরিত)

সাধারণত ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন মিষ্টভাষী, তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ; কিন্তু তাই বলে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষের অসৌজন্যসূচক আচরণ বরদাস্ত করতেন না। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাই বিদেশী প্রভুর মনোরঞ্জন করতে তিনি নিজের বেশ পরিবর্তন করতেও সম্মত হননি। এইখানেই তাঁর

পৌরুষের পরিচয়। তাঁর এই গুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও কম মুগ্ধ করেনি এবং সেই কারণেই তাঁর রচিত প্রশস্তিতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বলে সম্বোধন করেছেন। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের ঘরে গিয়ে একবার দেখা করবার প্রয়োজন ঘটে। তখন অভ্যর্থনা করা দূরের কথা, মিঃ কার তাঁকে বসতে অনুরোধও করেননি এবং টেবিলে পা তুলে রেখেই তাঁর সঙ্গে আলাপ চালিয়েছিলেন। তার প্রত্যুত্তরে কার সাহেব যখন তাঁর আপিসে তাঁর সহিত দেখা করতে আসেন তখন তিনি তাঁর সহিত অনুরূপ ব্যবহার করে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কথা হ'ল এই—সেকালে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে হলে ভারতীয়দের চোগা চাপকান ও পাগড়ি ধারণ করতে হ'ত। তখন ফ্রেডারিক হ্যালিডে ছিলেন বাংলার লেঃ গভর্নর। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য তাঁর বেলভেডিয়ারের প্রাসাদে ডেকে পাঠাতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ধুতি চাদর এবং চটি দিয়ে সজ্জিত হয়েই তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ছোটলাট তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এইভাবেই বিদ্যাসাগরের আচরণের মধ্য দিয়ে বাঙালী পণ্ডিতের পোশাকের আভিজাত্য রক্ষিত এবং বর্ধিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বিদ্যাসাগরের 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব' বলেছেন তা তাঁর মানবিকতারই একটি দিক। তাঁর মানবসেবায় আত্মনিয়োগের কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। মানবপ্রীতিই তার মূল প্রেরণা। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছিলেন তা হ'ল এই যে, তাঁর মানবসেবা কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল অবহেলিত মানুষই তাঁর সেবার পাত্র ছিল। হিন্দুনারীদের দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার কারণ, সমাজের

প্রতিকূলতায় তাঁরা নানাভাবে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হতেন। মিহিজামে যখন থাকতেন তখন সাঁওতালদের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করতেন, কারণ সমাজে তারা ছিল একটি অবহেলিত সম্প্রদায়। যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে আর্তত্রাণের কাজে ডাক আসত, তখন তিনি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর নিজগ্রামে যখন একবার দুর্ভিক্ষ হয় তিনি সকল দুঃস্থ মানুষের আহার যোগাবার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমান জেলায় যখন একবার ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে প্রকট হয় তখন রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময় যাঁরা তাঁর সেবা পেয়েছিলেন তাঁদের বেশির ভাগ মানুষ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক।

এই মহামানবের চরিত্রে এইভাবে এমন বহু গুণের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল যে, তা বলে এক রকম শেষ করা যায় না। এক কথায় বলা যায় এমন মানুষ বাংলা দেশে আর জন্মায়নি। এইখানেই তাঁর চরিত্রের আলোচনা তাই শেষ করবার প্রস্তাব করি। তবে আর-একটি কাহিনী উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা শক্ত হয়ে পড়ছে। তার উল্লেখ করেই এই ক্ষুদ্র প্রশস্তি শেষ করা যাক। তা তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং সৌজন্যের সুন্দর পরিচয় দেয়।

একবার পাইকপাড়ার রাজার বাড়িতে তিনি কোনো কর্ম উপলক্ষে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন হডসন নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর রাজ-পরিবারের মানুষদের প্রতিকৃতি-অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখে এমন মুগ্ধ হন যে, তাঁর প্রতিকৃতি আঁকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞাভাস্বর, পৌরুষদীপ্ত মমত্বমণ্ডিত চেহারার মধ্যে এই গুণী চিত্রকর নিশ্চয় এমন একটি আঁকবার মতো বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন যার জন্য তাঁর মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক সৌজন্যবোধহেতু সম্মতি দিয়েছিলেন। ছবি আঁকা শেষ হলে বিদ্যাসাগর যখন জিজ্ঞাসা

করলেন পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁকে কত দিতে হবে, হডসন বললেন যে কিছুই দিতে হবে না, কারণ তিনি এটা শখ করে এঁকেছেন। এই তো প্রকৃত চিত্রকর! যখন কিছুতেই শিল্পীকে পারিশ্রমিক নিতে রাজী করানো গেল না, তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে দিয়ে তাঁর পিতা ও মাতার দুটি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেজন্য পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। হডসন-অঙ্কিত এই চিত্রখানি বিদ্যাসাগরের যতগুলি চিত্রের সহিত আমরা পরিচিত তাদের মধ্যে অবিসম্বাদিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর চরিত্রের গুণগুলি যেন এই প্রতিকৃতির মুখচ্ছবিতে সুন্দর প্রতিফলিত হয়েছে মনে হয়।

আমাদের ধারণার অনধিগম্য যে-সমস্ত বিষয় আছে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যমহিমা নিশ্চয়ই তেমন একটি বিষয়। এমন একটি মহাজীবনের আলোকে আমরা কিছুটা আভাস পেতে পারি ভূমা কাকে বলে, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই সুচিরশ্রুত বাণীরই বা অর্থসঙ্কেত কি? তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা, এই তিনটি সিংহদ্বার অতিক্রম করে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীর উপদেশে অনুভূতির সেই রাজ্যে আমরা প্রবেশাধিকার পেতে পারি। এই মহামানবের বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার পরিমাপ করবার মতো পরিপ্রশ্ন-শক্তি আমাদের নেই। তাঁর হৃদয়বত্তা ও ভূরিদান বিগলিত করুণা-মন্দাকিনীর উৎস নির্দেশ করতে পারি এমন সেবা-সুকৃতিও জীবনে সঞ্চয় করা হয়নি। আমাদের সম্বল শুধু প্রণিপাত। এই প্রণিপাত প্রত্যক্ষ করেছি বিদ্যাসাগরের করুণাসিন্ধুর তটস্থ মহাকবি শ্রীমধুসূদনে। কবির স্বানুভবের স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই বিরাট মনুষ্যমহিমা—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে,
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু।

বিদ্যাসাগরের নিকটতম ব্যক্তিসান্নিধ্যে অবস্থান করে এই মহৎ উদার বিশাল কবিপ্রাণ স্বতঃস্ফূর্ত সুগভীর কৃতজ্ঞতার আবেশে জীবন-নাট্যের এক দুর্যোগসন্ধিতে সদ্যঃপরীক্ষালব্ধ নতুন ছন্দে এই কথাগুলি গেঁথেছিলেন। প্রাণসম্পদে রাজাধিরাজ এই মহাকবি নিজের দীনতার অকুণ্ঠ বৈষ্ণবজনোচিত স্বীকৃতি দিয়ে দেবমানবের মনুষ্যমহিমা এবং নামমহিমার কাব্যময় মহিম্নঃ স্তোত্র রচনা করেছিলেন।

'বিদ্যার সাগর তুমি', এ-কথা গভীরভাবে সত্য। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। অদ্বিতীয় বহুভাষাবেত্তা বিশ্বসাহিত্য-রসিক বিদ্বৎকুলাগ্রগণ্য কবি যেন এই পরিচয়ে অতৃপ্ত হয়ে বলছেন, 'এহো হয়,' অথবা 'এহোত্তম', 'আগে কহ আর'। বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশ্ববিমোহন বাচনভঙ্গিতে যেন অতর্কিতে 'আগের কথা'টি পরম পরিতৃপ্তিভরে নিজেই বলেছিলেন, 'করুণার সিন্ধু তুমি'। 'বিদ্যার সাগর তুমি','করুণার সিন্ধু তুমি', কোনটি গভীরতর সত্য? যে 'যৈছে ভজে'। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ'।

ফরাসী-প্রবাসের ঘোর দুর্দিনে একদিন কবি অধ্যয়ন-সমাধিতে মগ্ন। বিপন্না জীবনসঙ্গিনী করুণ ভৎ'সনার ভঙ্গিতে জানালেন, ঘরে একটি কপর্দক নেই। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে মেলায় যাবে বলে। প্রশান্ত দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করে আনমনা কবি বললেন, 'অধীর হ'য়ো না হেনরিয়েটা। এবার আমি দেশের এমন একটি মানুষের কাছে আমার অবস্থাসংকটের কথা জানিয়েছি যিনি প্রজ্ঞায় ভারতের ঋষি, সাহসে কর্মতৎপরতায় ইংরেজ এবং প্রাণের ঐশ্বর্যে বাঙালী মায়ের মতো।' একদিকে বিদ্যাসাগরের সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী জীবনচরিত, আর-একদিকে এই কবি-নিরুক্তি। কোনটির ওজন বেশী?

'বিদ্যাসাগর' সংস্কৃত কলেজের দেওয়া উপাধি, তাঁর নাম নয়। উপাধির এমন পরিপূর্ণ সার্থকতার দৃষ্টান্ত ক'টি মেলে? বাংলাদেশের ইতিহাসে, মানবতার ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর বলতে একটি মানুষকেই বুঝায়। অনেক সরল লোকের ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর বুঝি তাঁর নামই। সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি জ্যোতিষ ন্যায় এবং দর্শনের আরও নানা শাখায় বিদ্যাসাগর যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তার তুলনার স্থল হয়তো এদেশে সেকালের ও একালের কোনো-কোনো পণ্ডিত রয়েছেন। কিন্তু প্রতিভার এমন বহুমুখিতা, বিদ্যার এমন সার্থকতা ও সর্বতোমুখিতা কোনও কালের কোনও এক ব্যক্তিতে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় কি? জীবনচর্যায় পাণ্ডিত্যের এমন রমণীয় পরিণাম প্রত্যক্ষগোচর হয় কি? 'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ

কামসঙ্কল্প-বর্জিতাং', গীতা-প্রোক্ত এমন 'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' সত্যিই 'লাখে না মিলল এক'। সত্যিই অনুভূতির এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য অমর্ত্য। বিদ্যাসাগরের এক শ্রদ্ধালু বন্ধু একদিন অতি দুঃখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি অমুকের এমন কি ক্ষতি করেছেন যে, সে হিংস্র হয়ে অযথা আপনার অপযশ প্রচার করে বেড়াচ্ছে?' 'তুল্যনিন্দাস্তুতি' 'মহাপুরুষ একটু হেসে উত্তর দিলেন, 'কৈ, মনে তো পড়ে না কোনোদিন তাঁর কোনও উপকার করেছি বলে।' স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্তপ্রসাদ হতে বিচ্ছুরিত এই উজ্জ্বল রসিকতার ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই। অথচ বিদ্যাসাগরের ধর্মচেতনা ছিল কি না, তা নিয়ে আমরা ক্রমাগত নানা গবেষণা চালিয়েও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। ধর্মচেতনা যেন জীবন-বহির্ভূত পোশাকী ব্যাপার!

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

অথবা

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

সপ্তশতী-পাঠের সময় এমন শ্লোকের সম্মুখীন হলে জীবন্ত শ্লোকময় যে মনুষ্যমূর্তি মনের চোখে ভেসে ওঠে সেটি বিদ্যাসাগরের।

টোলে প্রাচীন পন্থায় গুরুগত বিদ্যা অর্জন করে তিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, যে-সমস্ত ভারতীয় প্রায় ইংরেজের মতো করে ইংরেজি লিখতে পারেন তাঁদের তালিকা প্রণয়ন করতে গেলে বিদ্যাসাগরের নাম এসে যাবে। ইংরেজিতে লিখিত তাঁর চিঠিপত্র এবং নানা বিষয়ে লিখিত নানা বিবরণী তাঁর লেখনী-সঞ্চালনের সব্যসাচিতা প্রমাণিত করে। সেকালের উচ্চপদস্থ ছোটলাট হ্যালিডে-প্রমুখ ইংরেজের সঙ্গে তিনি সহজভাবে মিশতেন। একযোগে নানা কাজ করতেন, স্বাজাত্যবোধ ও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে সংযোগ ছিন্ন

করতেন, পদত্যাগ করতেন, সে সম্পর্কে সহস্র অবিস্মরণীয় নাটকোপযোগী ঘটনার স্মৃতি দেশের মানুষ ভুলতে পারেনি। আসল কথা এই, শুধু ইংরেজি ভাষা নয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় The spirit of English, পশ্চিমের নবাগত মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত যে মনোবল নতুন জীবন গড়তে আমরা কিছুটা কাজে লাগিয়েছি, আবার অনেকটা আয়ত্ত করতে পারিনি, বিদ্যাসাগরের মতো অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শক্তিশালী চুম্বকের মতো তা অর্জন করতে এলাকা পর্যন্ত ক'জন ভারতীয় পেয়েছেন? বেশ কিছুদিন আগে 'শনিবারের চিঠি'তে একটা ছবি দেখেছিলাম, হ্যাটকোট-পরা বিদ্যাসাগর, পাশে নামাবলীর অঙ্গাবরণে শ্রীমধুসূদন। আমাদের নিত্য-তর্পণীয় জাতীয় পিতৃযুগলের ভাব-কলেবর এক দিক দিয়ে এই শিল্পীর ধ্যানে ধরা দিয়েছিল।

একদিন ছিল যখন এদেশের মানুষ পল-বিপল গণনা করে গাত্রলোমের দৃশ্যাদৃশ্যতা বিচার করে যথাসময়ে আহ্নিক-কৃত্যাদি নিষ্পন্ন করতেন। কিন্তু ইদানীং আমরা 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ' ভুলে গিয়ে 'কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ' কবি-বচনের আনুগত্যে কর্মসূচী পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশায় যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ শিক্ষাগুরু ছিলেন এমন কেউ-কেউ তাঁর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পরে সময়মতো উপস্থিত হয়ে দৈনন্দিন অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করতে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন, আহারান্তে বিশ্রাম ও তন্দ্রাকর্ষণের পর খুশিমতো কলেজে আসতেন। তাঁদের অধ্যক্ষ-শিষ্যটি কিছুদিন দেখে, ঘড়িহাতে সবিনয়ে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত অধ্যাপ্রক-প্রবীণদের অভিবাদন করে তাঁদের প্রতীক্ষারত ছাত্রদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে শৈথিল্যের প্রতিকার হয়েছিল। সময়ের এই মূল্যবোধ দেড়শো বছর পরে আমাদের তো আরও বাড়বার কথা! এক নতুন জামাইবাবু অনায়াসে-বহনযোগ্য একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে রেলগাড়ি থেকে নেমেছেন শ্বশুরবাড়ির দেশের স্টেশনে। ছোট স্টেশন, কুলি নেই। গ্রামবাসী

আরোহীরা সকলেই স্বাবলম্বী। বাবুটি কুলি কুলি করে হয়রান হয়ে হতভাগা স্টেশন ও দেশকে গালি পাড়ছেন। এমন সময় প্রৌঢ় উৎকল-বাসীর মতো দেখতে এক কুলি মিলে গেল। কুলি বাবুজির ব্যাগটি নির্বাকভাবে বহন করে গন্তব্য শ্বশুরালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হলে শ্বশুরমশাই এসে কপালে আঘাত করলেন, কী সর্বনাশ! স্বয়ং বিদ্যাসাগরমশাই জামাইয়ের তল্পি বহন করে এনেছেন! এর দেড়শো বছর পরে আজও দেখা যায়, সত্তর বছরের বেকার বৃদ্ধ পিতা রেশন ব্যাগ হাতে 'দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান' কবিগুরুর এই অভিসম্পাত স্মরণ করে শ্রেণীবদ্ধ প্রতীক্ষায় রত আছেন, আর সংগৃহীত অন্নপানে যাঁরা শক্তিমান হবেন তাঁরা কিন্তু এই জঘণ্যতা পরিহার করে শ্রমের মর্যাদা-সংরক্ষণ ও অন্যত্র অন্যভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন! বিদ্যাসাগর আমাদের কালে জন্মগ্রহণ করেননি, আমাদের জীবনদর্শন, আমাদের আচরণ, আমাদের মত ও পথ গ্রহণ করেননি, এই অপরাধের শাস্তি তিনি অসীম প্রসাদে অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষের হাত থেকে গ্রহণ করছেন।

বিদ্যাসাগরের ইংরেজি শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে কতকটা দূরে এসে পড়েছি। ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসারে তাঁর আগ্রহ ও অবদানের কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। যুগের ইংরেজি শিক্ষিতদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রায় সকলের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের সখ্য ও কর্মসংযোগ ছিল। জানা যায়, তাঁরই অনুরোধে-প্রবর্তনায় প্যারীচরণ সরকার ও লেটাব্রিজ সাহেব প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষার উপযোগী অতুলনীয় পাঠ্যপুস্তক First Book of Reading এবং ক্রমান্বয়ে Second ও Third Book of Reading প্রণয়ন করেছিলেন। আবার তিনি নিজেই লেখনী ধারণ করে সংগ্রাম-সংকুল কর্মজীবন এবং অনলস সেবাব্রতের ফাঁকে ফাঁকে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজে আয়ত্ত করবার উপযোগী করে উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ এবং বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত শকুন্তলার মতো কাব্যগ্রন্থের প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রসাদেই আজও শিক্ষিত বাঙালী সংস্কৃত ভুলে যায়নি, আশ্রয়বৃক্ষের মূলোৎপাটন করেনি, যদিও শিক্ষার আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্ধারণে প্রগতিশীল শিক্ষাবেত্তারা সংস্কৃতের প্রায় Quit India-র ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করে এনেছেন। অথচ পালি-প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব ভারততত্ত্ব প্রাচীন ভারত-ইতিহাস প্রভৃতি অনুশীলনের অজস্র ব্যয়সাধ্য পল্লবগ্রাহিতার পরিপোষক স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সমারোহ দিন-দিন বেড়ে চলেছে। বিদ্যাসাগরের উত্তরসাধকরূপে সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম মধুসূদন ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হরপ্রসাদ এবং তাঁদের যুগসহচরদেরকে। জীবনের সে গতিবেগ প্রগতি-ধারায় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে তো?

সে-যুগে বাঙালীর বাংলাভাষা শিক্ষায় ও প্রয়োগে কি অবহেলা ছিল এবং এ-ক্ষেত্রে কিরূপ অরাজকতা বিরাজ করত 'শিশুবোধক' নামক একখানি পাঠ্যপুস্তকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলেই জানতেন বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বাসুদেব-চরিত, সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি রচনা করে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই অরাজকতা দূর করে সেখানে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এ সমস্ত রচনার বেশির ভাগই পাঠ্যপুস্তক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ থেকেই বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টি শুরু হয়েছে। জীবনস্মৃতিতে ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের শৈশবের অনুভূতি তার প্রমাণ। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বিশ্বকবির শৈশবের মেঘদূত, আমাদেরও বৈষ্ণব পদাবলীর 'রিমিঝিমি'। শব্দসঙ্গীতের এই নব-পরিচয়ের দিন নাকি শিশু-কবির মনে সারাদিন ধরে জল পড়েছিল, পাতা নড়েছিল। বর্ণবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশের কী অদ্ভুত মনোবিকাশের সহায়ক বিজ্ঞানসম্মত কবিত্বপূর্ণ স্তরপরম্পরা! অজ আম ইট ঈশ, কাক গান ঘাস, তিল দিন হিম থেকে আরম্ভ করে অনুশোচনা পরিবেদনা অভিনিবেশ।

বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল। উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়াছে। কৈলাসের পড়িবার বই নাই। তারপর রীতিমত কথাসাহিত্য, গোপাল অতি সুবোধ বালক। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে। মনে পড়ে যায় সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বিদগ্ধ ভক্তপরিকরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।' 'জিহ্বার লালসে জীব ইতি-উতি ধায়।'

সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই সমাজ-সংস্কারক শিক্ষাবিদ পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতার গোপনচারী শিল্পিসত্তা ও কবিপ্রাণের পূর্ণস্বীকৃতি দিতে এখনও ইতস্ততঃ করেন। বাংলা গদ্যশৈলীর জনকত্বের শিরোপা কাকে দেওয়া যায় এ নিয়ে সাহিত্যিক গবেষকেরা এখনও মনঃস্থির করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে নব্যভারতের জনক রাজা রামমোহন, উইলিয়ম কেরি, মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম, অক্ষয়কুমার-প্রমুখ অতন্দ্র সাহিত্য-কর্মীর নাম এসে যায়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে এঁদের প্রত্যেকেরই দান অমূল্য, অবিস্মরণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা গদ্যশৈলীর সহজ সুশ্রব প্রথম সঙ্গীত কখন ধ্বনিত হয়েছিল তার বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও শুধু কান পাতলেই বোধ হয় সিদ্ধান্ত অনেক সহজ হয়ে উঠবে। নানা শাস্ত্র ও নানা ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে পাঠমার্জিতরুচি মনীষী রামমোহন স্মার্ত, মৌলবী পাদরী ও গোস্বামীর সঙ্গে বিচারে উপনিষদের ভাবানুবাদে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ'-জাতীয় মৌলিক গ্রন্থ রচনায় বাংলা গদ্যের বহুল প্রচলন করতে গিয়ে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আবিষ্কার করলেন, বাংলা গদ্যের তখনও হাঁটি-হাঁটি পা-পা। তাই 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ'-এ বিধান দিলেন, 'যাবৎ বাক্যের ক্রিয়াপদ না পাইবেক তাবৎ বাক্যের পাঠ্যসমাপ্তি' ঘটতে পারে না। রাজীবলোচন তাঁর 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্'-এ কালনির্দেশক ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন বাক্যবিন্যাস করতেন, যেমন 'তথাপি বিষণ্ণ শ্রীজদ্দোলার বদন'। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধজনের' হিতার্থে

'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় 'পদদ্বন্দ্ববিগলিত-মকরন্দে'র স্বাদপরিবেশনে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে 'কথোপকথন'-এ উইলিয়ম কেরি পিঠার আঠা ছাড়াবার ঠেলায় নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন।

এমন সময়ে আকাশে 'জলধরপটল-সংযোগ' দেখা দিল। 'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি যাহার শিখরদেশ সতত-সঞ্চরমাণ জলধরপটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আচ্ছন্ন।' 'বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস' ভারতের কবিপিতৃপুরুষেরা বাঙালী অন্তর্লোকে দেখা দিলেন। এই অপূর্ব গদ্যশৈলীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন ও অবকাশ নেই। তৎসম শব্দের প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত এবং গুরুগম্ভীর শব্দসমাবেশ সত্ত্বেও খাঁটি বাংলা বাক্যরীতির সঙ্গে আমাদের এই 'নব পরিচয়', এই পূর্বরাগ। 'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন এবং অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।' বাক্যবিন্যাসের প্রাক্‌কালীন আমাদের মানসচিত্রের অবিকল প্রতিবিম্ব বিদ্যাসাগরের এই বাক্যরীতিতে প্রথম ধরা দিয়েছে বলে আমরা মনে করি। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রে এই রীতিরই প্রসৃতি ও বিবর্তন লক্ষিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতামুখী জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে এই টুলো শিক্ষাবিদ নানা দেশের মনুষ্যত্বের কাহিনীর সৌষ্ঠবময় সমাবেশ করলেন আখ্যানমঞ্জরীতে। আরবের অদ্ভুত আতিথেয়তাও তার থেকে বাদ পড়েনি। পাশ্চাত্য জাতির স্বাজাত্যবোধ স্বাধীনতাপ্রিয়তা স্বাবলম্বন, শ্রমের মর্যাদা, নিয়মনিষ্ঠা কর্তব্যপরায়ণতা, তখনকার জাতীয় জীবনে অপরিদৃষ্ট এই সমস্ত গুণাবলী শুধু গল্পের পথ ধরে আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত হানেনি, মানবতার ইতিহাসে নিত্য-লোভনীয় এই সমস্ত সদ্‌গুণ এই মহামানবের সর্বজনবন্দিত বরেণ্য ব্যক্তিত্বে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এখানেও মনে পড়ে যায়, পাঁচশো বছর আগেকার সেই 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখামু'। এঁরা একাধারে শিক্ষক ও আচার্য; শুধু কথা দিয়ে নয়, আচরণ দিয়ে শিখিয়েছিলেন।

বিশ্বমানবতার প্রথম পূজারীদের অন্যতম হয়েও তিনি আত্মস্থ হয়ে সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে যখন লেখনী ধারণ করলেন তখন গদ্যে কথাসাহিত্যের রূপকল্প আশ্রয় করে শোনালেন সীতা ও শকুন্তলার কাহিনী। এই বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখতে গিয়ে আমাদের যা মনে হয়েছে অকিঞ্চিৎকর হলেও সেটি বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। বিদ্যাসাগরের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব হতেই দেশের দুর্যোগময় যুগসন্ধিতে বাঙালীর অন্তর্লোকে দেখা দিয়েছিল মাতৃমন্ত্রের ক্রমপ্রসার্যমাণ শক্তির স্ফুরণ। মাতৃমহাভাবের পাঠক কবি রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীত ভাগীরথীতীরের আকাশ-বাতাসে তরঙ্গ তুলেছিল। তাঁর নাতিপ্রবুদ্ধ স্বজাতিও অসহায় মাতৃনির্ভর শিশুর মতো মনে মনে সেই গান গাইতে শুরু করেছিলেন। 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে।' তাই গান-ভঙ্গ হয়নি। এর অবব্যহিত পরেই পুণ্যশ্লোকা রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের দেউলে পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল মা-মা ক্রন্দন শোনা গেল। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' দিব্যজীবনে লব্ধাস্বাদ এই স্পর্শমণির ছোঁয়াচ যাঁদের লেগেছিল তাঁদের মধ্যে সে-যুগের দিক্‌পালগণের প্রায় সকলেই ছিলেন। তাঁদের জীবনসাধনার কথা ভাবতে গেলে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একটি মাতৃমহাভাবের সর্বাত্মক সম্প্রসারণ এই যুগ-জাগৃতির মূলে কাজ করেছিল যার ফলশ্রুতি আসমুদ্রহিমাচল ভারতের জাগর-মন্ত্র ঋষি বঙ্কিমের হৃদয়গুহাস্থিত 'বন্দে মাতরম্'—মাটির মা-টিতে পরিণতি। এই মন্ত্রের জীবনময় যুগলমূর্তি, একদিকে গৃহী বঙ্কিম, অন্যদিকে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তার পূর্বেই মধুসূদন বিশ্বসাহিত্যের পরিক্রমা সমাপ্ত করে 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' আবিষ্কার করেছিলেন। বিদেশযাত্রাকালে বাংলাদেশের শ্যামলিম মধুর তটশোভা ধীরে ধীরে দিগন্তে বিলীন হতে দেখে বুকফাটা ডাক দিয়েছিলেন 'শ্যামা জন্মদে' বলে। এই ডাকের মধ্যেই আমরা 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্' মহামন্ত্রের অশ্রুত অস্ফুট ঝঙ্কার শুনেছিলাম।

বিদ্যাসাগরের স্তন্যপীযূষদায়িনী গর্ভধারিণী ভগবতী দেবী। আমরা বহু শতাব্দী ধরে চণ্ডীমণ্ডপে আবৃত্তি করেছি, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ'। বিদ্যাসাগরের জীবনে ভগবতী সাক্ষাৎকার হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সমস্ত শক্তির উৎস এই আদিভূতা সনাতনী। কোটি কোটি ভক্ত যুগ যুগ ধরে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' আবৃত্তি করেছেন। ব্রহ্মপন্থী বিশ্বকবিও গীতাঞ্জলিতে সপ্তশতীর সুরঝঙ্কার তুলে নমস্কার করেছেন—

তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে।

ভগবতীর স্থিতপ্রজ্ঞ প্রৌঢ় সন্তান 'মা মা' বলে বর্ষায় উদ্দাম দামোদরের উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। অনুরূপ প্রেরণায় বিদ্যাসাগর দেশের যে সমস্ত কচি-মায়েরা মাতৃস্নেহবুভুক্ষা ও মাতৃস্তন্যপিপাসা মিটবার আগেই অবগুণ্ঠিতা হয়ে চোখের জলে সপত্নী-ননদীর ঘর করতে গিয়ে অকালবৈধব্য বরণ করতেন তাঁদের অসহায় অবস্থার প্রতিকার করবার দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, একসঙ্গে এতগুলি সংস্কারকার্যে হাত দিয়ে পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শাস্ত্রশাণিত রক্ষণশীল সমাজকে 'কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ' অনুসারে পরাশরস্মৃতি উদ্ধার করে শোনালেন—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

নিজে কিন্তু সমস্ত প্রমাণ হতে গরীয়সী ভগবতী দেবীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করে তরঙ্গসঙ্কুল কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। আমাদের দেশে মাতৃপূজার মতো মাতৃকা-পূজাও (worship of potential mothers, mothers in the making) প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগরও মাতৃকা-পূজার আয়োজনে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে মহাপ্রাণ বিদেশী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন-এর পাশে এসে দাঁড়ালেন, মনুস্মৃতি থেকে সমর্থন যুগিয়ে

দিলেন, 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিরত্নতঃ'। বিদ্যাসাগরের জীবনযজ্ঞের ভাব-প্রেরণার প্রবলতম উৎস একটি বলেই আমার মনে হয়। পূর্বাপর এক শতাব্দীকাল ধরে এই একই ভাব-প্রেরণা নানা রূপে বাঙালীর ধর্মচেতনা, কর্মচেতনা, সমাজচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা ও সংস্কৃতিচেতনাকে আশ্রয় করে কাজ করেছে। এই শক্তি রামপ্রসাদে 'ব্রহ্মময়ী', রামকৃষ্ণে 'ভবতারিণী', বিদ্যাসাগরে 'ভগবতী দেবী, সীতা, শকুন্তলা, বালিকা বধূ, বালবিধবা, সপত্নী-নির্যাতিতা স্বামী-পরিত্যক্তা, এক কথায়—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। এই শক্তি মধুসূদনে 'শ্যামা জন্মদে', 'জননী জাহ্নবী', বহুবার বহুভাবে বহু কাব্যে স্বপ্নে আবির্ভূতা 'কুললক্ষ্মী'। 'নারিনু মা তোমারে চিনিতে।' এই একই শক্তি রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমনোমোহিনী জনকজননী'। এই শক্তির আবেশে বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর সন্তান নরেন্দ্র-বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্রের আবাহন 'ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী······তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।' এই শক্তি কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, আশুতোষ, অশ্বিনীকুমার, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষে—অজয় দামোদর কপোতাক্ষ ভৈরব ভাগীরথী মহানন্দা আড়িয়ালখাঁ ইছামতী পদ্মা-মেঘনা-শীতলাখ্যায় তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে কর্ণফুলীর কূলে কূলে অগণিত অজ্ঞাতনামা ও খ্যাতনামা বীর সন্তানে।

দক্ষিণেশ্বরের পূজারীঠাকুরের একবার খেয়াল হ'ল সমুদ্রস্নানের, অমনি অযাচিতভাবে বাদুড়বাগানের বাড়িতে এসে হাজির সাগর-সঙ্গমে। প্রথম সম্ভাষণও অদ্ভুত রকমের। 'এতদিন ছিলাম খালে-বিলে নদী-নালায়, এবার এসে পড়েছি একেবারে সাগরে।' উত্তরও ঠিক তেমনই, 'তা বেশ, খানিকটা নোনা পানি নিয়ে যান।' 'সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।' একদিকে গুণগ্রাহী আশীর্বাদোচ্ছত সদানন্দ ঠাকুর, অন্যদিকে শ্রদ্ধালু দৈন্যবিনয়মণ্ডিত সমুদ্র-গম্ভীর মহাপুরুষ।

যদ্ যদ্ বিভূতিসৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ ঊর্জিতম্ এব বা।
তত্তদ্ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥

এই সাক্ষাৎকার মনে করিয়ে দেয় দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর পূর্বের আর-একটি সাক্ষাৎকার। এই ভাগীরথীতীরে, সেটি হয়েছিল দক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরে। 'কাঞ্চনপঞ্চালিকা' তুল্যভাবকান্তিময় এক সন্ন্যাসী এবং গৃহীভক্ত বিদগ্ধ এক রাজপুরুষের মধ্যে।

আর এক রকমের মিলন বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটেছে। রাজপথে বিসূচিকাগ্রস্ত বমনশ্রান্ত অস্পৃশ্য অশুচি 'হরিজন'। পাশে অকস্মাদাগত বিদ্যাসাগর, তৎক্ষণাৎ প্রসারিত বাহুবন্ধনে আবদ্ধ রুগ্ণ ব্যক্তি শুশ্রূষা ও চিকিৎসার উদ্দেশে গৃহে আনীত; যুগোপযোগী ভাষায় উপনিবদ্ধ মহাপ্রভুর একটি উক্তি মনে পড়ে, 'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম সার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥' একে কি বলব? দেশাত্মবোধ, না ধর্ম? বিদ্যাসারের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে বহু গবেষণার পরেও আমরা সংশয়বুদ্ধি পরিহার করতে পারিনি। ধর্মবস্তুটিকে আমরা কি ঠাউরেছি, কেউ বলতে পারেন কি? দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের ন্যায় শক্তিশালী বৃহৎ মনোযন্ত্রে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যমহিমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। রমেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথের হীরকের মতো ভাস্বর উক্তির সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। আমাদের পক্ষে অন্ধের হস্তিদর্শনের এই প্রয়াস হয়তো ক্ষমারও অযোগ্য।

নির্গুণ শব্দের অর্থ ভক্তিশাস্ত্রে গুণহীন নয়, গুণাতীত। 'সত্যং পরং ধীমহি' ব্রহ্মগায়ত্রীতে যে তত্ত্বের আরম্ভ বসুদেব-দেবকী, ব্রহ্মা নারদ দুর্বাসা ধ্রুব প্রহ্লাদ পৃথু উত্তানপাদ হিরণ্যকশিপু বেণ, বৃত্র দক্ষ কপিল মৈত্রের উদ্ধব অক্রূর দেবহূতি যশোদা ব্রজগোপী অশেষ-বিশেষে স্তবস্তুতির আশ্রয় নিয়েও যার শেষ করতে পারেননি তারই বিদ্যুদাভাস খেলে যায় এমন একটি মহাজীবনের প্রসঙ্গে।

সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদ্ আশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শুধু ভাগবতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, কবিদৃষ্টিতেও এমন জীবনকে অলোকসামান্যম্' 'অচিন্ত্যহেতুকম্' বলা হয়েছে। এমন জীবন যে শুধু 'কোটিকে গোটি মিলে' তা নয়, জন্ম শিক্ষা ও যুগপরিবেশ দিয়ে এর সবটুকু বুঝা যায় না।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব থেকে দেড়শো বছরের ব্যবধানে আজ সংশয় জাগে বিদ্যাসাগর কি সত্যই আমাদের দেশে এসেছিলেন? হাঁ, পাথুরে প্রমাণ তো আমরা গড়েছিলাম। একালের ইতিহাসও পাথুরে প্রমাণের বশ। কিন্তু আর কোনও প্রমাণ কি আছে? আমাদের যাঁরা ভবিষ্যৎ, আমাদের 'অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান' যাঁরা সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলছেন তাঁদের কাছে একটি মাত্র অনুরোধ করে এই জাতীয়-পিতৃতর্পণের উপসংহার করি। আমাদের ভগ্ন সুরহীন কণ্ঠের সঙ্গে তাঁদের শক্তিশালী সুরময় কণ্ঠ মিলিয়ে একটি গুরুপ্রণামের মন্ত্র তাঁরা পাঠ করুন—

> প্রতিষ্ঠিতং হৃদি তব চিন্ময়ং বপুঃ
> ধৃতং ব্রতং খলু ত্বদুপাসনাত্মকম্।
> ক্বচিদ্ গুরো স্মৃতিপথিকো ভবামি চেৎ
> তদা সা গুণরুচিরা কৃপৈব তে॥

হে গুরু, হৃদয়ে তোমার চিন্ময়মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছি। এবার তোমার ব্রত ধারণ করে তোমার উপাসনার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি। আমরা যে তোমার স্মৃতিপথিক হতে পেরেছি সে তোমারই গুণবিমোহন কৃপা।

কর্মবীর রূপে যিনি সর্বজনবন্দিত, সাহিত্য-শিল্পীরূপেও তিনি রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। জীবনের যে সকল কর্তব্য বিদ্যাসাগরের কাছে সাহিত্য-রচনার চেয়ে বড়ো বলে মনে হয়েছিল, তার প্রতিই তিনি বিশেষভাবে মন দিয়েছিলেন। বই লেখা ছিল নানান কাজের মধ্যে একটি এবং তাও প্রধানতঃ প্রয়োজনের তাগিদে—কখনও বিদ্যার্থীদের জন্য, কখনও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে। তথাপি সাহিত্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত তাঁর অনেক রচনা—বিশেষ, তাঁর সংস্কৃত কাব্যের ভাবানুবাদ 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'। 'শকুন্তলা'র মূলে আছে কালিদাসের বিখ্যাত নাটক ; আর 'সীতার বনবাসে'র প্রথম দুই পরিচ্ছেদের উৎস ভবভূতির 'উত্তররামচরিত', অবশিষ্টাংশের উপাদান প্রধানতঃ বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে নেওয়া। 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামেও একখানি গ্রন্থ তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তার কয়েক পৃষ্ঠার বেশী আর অগ্রসর হতে পারেননি। কাব্যানুবাদের বেলায় কেবল আখ্যান-বর্ণনা ও ভাব-পরিবেশনেই তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন মূল কাব্যের রস আহরণ করতে, গদ্যের চলনকেও ছন্দোময় করে তুলতে। বাক্যগঠনে অবহিত হলে শুধু যে অর্থকে সুবোধ্য করা যায়, তাই নয়, রচনাকে শ্রুতিমধুর ও তরঙ্গায়িত করে তোলা যায়, তার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন।

'এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া

প্রবল বেগে গমন করিতেছে।' [সীতার বনবাস]—এ বাক্যের পর্বে পর্বে যে সুন্দর ধ্বনি-সামঞ্জস্য, তা তাঁর শিল্পবোধেরই অভ্রান্ত নিদর্শন।

রসবোধ ও বিচারশক্তি তাঁর কত প্রগাঢ় ও তীক্ষ্ণ ছিল, তার প্রমাণ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'। প্রকৃত সমালোচনা-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক বলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে জানি, কিন্তু তাঁর পূর্বেই বিদ্যাসাগর উপরি-উক্ত পুস্তকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কাব্য যে শুধু অলংকৃত বাক্য নয়, সেকথা তিনি মাঘের শিশুপালবধ আলোচনায় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন: 'মাঘ অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অতি অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় 'শিশুপালবধ' সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান কাব্য হইত সন্দেহ নাই।' 'সহৃদয়তা'-ই যে কাব্যে প্রাণসঞ্চার করে, এ উপলব্ধির প্রমাণ এখানে বর্তমান। 'কুমারসম্ভব', 'নৈষধচরিত', 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি কাব্যেরও রসবিচার উক্ত গ্রন্থে আছে।

মৌলিক সৃষ্টিকর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেননি। অপরের সৃষ্টি থেকে রসের আদান তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রধান প্রেরণা। সেক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য তর্কাতীত।

কেবল সংস্কৃত কাব্যের রস নয়, ইংরেজী এবং হিন্দী সাহিত্য থেকেও তিনি রস আহরণ করেছেন। শেক্সপিয়রের বিখ্যাত নাটক 'কমেডি অব্ এরর্স্' অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' উপস্থাপনা-গুণে উপভোগ্য হয়েছে। বিলেতী নামধাম বদলে তিনি বাংলা নামধাম প্রয়োগ করেছেন। তাতে আখ্যানটি বিদেশিয়ানার আবরণ থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়েছে। ভাষার সাবলীলতা গল্পের গতিকে রেখেছে স্বচ্ছন্দ। 'রাজপুরুষ জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে লইয়া তদীয় আলয় অভিমুখে প্রয়াণ করিলে পর উত্তমর্ণ বণিক অধমর্ণ স্বর্ণকারকে বলিলেন, তোমায় টাকা দিয়া পাইতে এত কষ্ট হইবেক, তাহা আমি একবারও মনে

করি নাই। হয়তো এই টাকার গোলে আজ আমার যাওয়া হইল না; যাওয়া না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব।. এখন বোধ হইতেছে, সে সময়ে তোমার উপকার করিয়া ভালো করি নাই। স্বর্ণকার কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়, আর আমায় লজ্জা দিবেন না। আমি আপনকার আবশ্যক সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া মরিয়া রহিয়াছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর।' [ভ্রান্তিবিলাস। ৫ম পরিচ্ছেদ]

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'—'বৈতাল পচীসী' নামক হিন্দী গ্রন্থ অনুসরণে রচিত। গল্পগুলি মনোহর এবং এই বাংলা উপাখ্যানগুলিও সমাদৃত হয়েছিল। বিদ্যালয়-পাঠ্যরূপে এ পুস্তক পরিকল্পিত; তাই ছাত্রগণের প্রয়োজনের দিকে লেখককে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে; কিন্তু এখানেও বাগাড়ম্বর নেই, ভাষা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন, কোথাও মন্থর বা আড়ষ্ট নয়।

'নয়নানন্দ কহিল, আমি কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবের প্রতিকূলতা-প্রযুক্ত অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আমি ভাগ্যবলে এক ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এ পর্যন্ত আসিয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোকসকল কে কোন্ দিকে গেল, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে লজ্জা হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না।' [বেতালপঞ্চবিংশতি। ৪র্থ উপাখ্যান।]

বিদ্যাসাগরী ভাষাকে এখন কেউ কেউ কঠিন ভাষা বলেন, কিন্তু আমরা যদি তাঁর সমকালীন লেখকদের রচনার পাশাপাশি রেখে দেখি, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করব, তাঁরা ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য। অন্বয়গুণে প্রতিটি বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট; শুধু তাই নয়, বিন্যাস-

কৌশলে বাক্যগুলি সুললিত। বিষয়ের অনুরোধে স্থানে স্থানে তাঁকে গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে লালিত্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, এবং সন্ধি-সমাসের জটিলতায় অর্থ আচ্ছন্ন হয়নি। অকারণে দুরূহ শব্দ ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয় না। 'কথামালা' এবং 'আখ্যানমঞ্জরী'তে তাঁর ভাষা সম্পূর্ণ সহজ সরল। দুটি দৃষ্টান্ত নিই—

'দেখ ভাই, এ গাছ কোনও কাজের নয়। না ইহাতে ভালো ফুল হয়, না ইহাতে ভালো ফল হয়। বলিতে কি, ইহা মানুষের কোনও উপকারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া বটবৃক্ষ কহিল, মানুষ বড় অকৃত।' [কথামালা। পথিকগণ ও বটবৃক্ষ]

'যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নহে। একদিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন উত্তম সূপ ও উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি। এখানে আসিবার পূর্বে আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই নাই। আমার পিতামাতা প্রায় প্রতিদিন একপ্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাঁহাদের মনে পড়ে।' [আখ্যানমঞ্জরী। পিতৃবৎসলতা।]—এ ভাষা প্রায় আমাদের মুখের ভাষার কাছাকাছি।

'বোধোদয়'-এর ভাষাও স্বচ্ছ ও সুবোধ্য।—'সকল দেশেরই ভাষা পৃথক পৃথক। না শিখিলে এক দেশের লোক অন্য দেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোকে যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী ভাষা মিশ্রিত হইয়া এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে উর্দু বলে। উর্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন ইহা সর্বপ্রকারেই হিন্দী।' [বোধোদয়। বাক্যকথন]

সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন: 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না'—দুটি প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার'—দুটি খণ্ড, 'বাল্য-বিবাহের দোষ' প্রভৃতি। এগুলিতে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, বিচারশক্তি এবং গভীর সহানুভূতির যোগ লক্ষ্য করি। সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই কারণেই তিনি কেবল বিধবা-বিবাহের অনুকূল শাস্ত্রীয় নির্দেশ উল্লেখ করেননি; চিরবৈধব্য প্রথার কুফলগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। 'বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন।...বিধবা-বিবাহের প্রথা-প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিবারণ হইতে পারে।' কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধেও তাঁহার মন্তব্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত: 'কুলীন ভগিনী ও কুলীন ভগিনেয়ীদিগের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়।...সংসারের সমস্ত কাজ নির্বাহ করিয়াও তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্যাদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা সর্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত।'

'আত্মজীবনী' রচনায়ও তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত)' গ্রন্থের দুটি মাত্র পরিচ্ছেদ তিনি রচনা করে গিয়েছেন। তাতে পিতামহ, মাতা-পিতা এবং আশ্রয়দাত্রী রাইমণির চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। ছেলেবেলাকার কথা ছাড়া অন্য কথা এ বইয়ে কিছু নেই। একটি অনুভূতিশীল উদার মনের পরিচয় এই স্মৃতি-কথায় পরিস্ফুট হয়েছে।

'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' একান্তই ব্যক্তিগত রচনা—সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস।

স্নেহের আবেগ এ রচনায় প্রবল : কিন্তু শুধু তাই নয়, ঐ শিশুর শৈশব-লীলার প্রতিটি ভঙ্গী—হাসি অশ্রু আদর অভিমান—বর্ণনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ সাধারণের জন্য নয় মনে করে তিনি জীবনকালে এ গ্রন্থ প্রকাশ করে যাননি। পরে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রে ছাপিয়েছিলেন। শিশুলীলার এমন করুণ মধুর চিত্র—সাহিত্য না-ই হোক—আন্তরিকতাগুণে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

জীবনে এবং কর্মে যাঁকে অনেক সময়েই গুরুগম্ভীর বলে মনে হয়েছে, তাঁর মধ্যেও যে একটি ব্যঙ্গরসিক কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি লুকিয়ে ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত'—'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস'-জাতীয় রচনায়। পরিহাসের ভাষা যেরূপ হালকা হওয়া উচিত, এগুলির ভাষা তাই।—'যাঁহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত, তাঁর মুখের জোর যত, বিদ্যার জোর তত নয়।···আড়াআড়ি বড় মজার জিনিস। মেহনত ও বুদ্ধি খরচ করিয়া, কতকদূর পড়িয়া দেখিলাম, লোকে যাহা বলিতেছে তাহা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত নয়। সত্যসত্যই খুড়'র দফা রফা হয়েছে।···খুড়'র লজ্জা-সরম কম বটে। কিন্তু লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়, তোমার পায়ে পড়ি, এমন করে আর চলিও না ; এবং শতং বদ, মা লিখ, এই উপদেশ-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আর কখনও চলিও না।'

বিষয়-অনুসারে ভাষা-প্রয়োগে যে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, তা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ দেখলেই বোঝা যায়। শিল্পবোধ ছিল তাঁর সহজাত, কিন্তু শিল্পসৃষ্টিতে লেগে থাকার অবকাশ তিনি জীবনে পাননি। তবু তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি রশ্মি সাহিত্য-জগতে বিকীর্ণ হয়েছে এবং তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের নারী-করুণার প্রতিফলন

সুবোধরঞ্জন রায়

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র চার মাস পরে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬) প্রকাশিত একটি চিঠিতে (দীনবন্ধু মিত্রের লেখা বলে প্রকাশ) কোনো বিধবা রমণীর উক্তিরূপে বলা হয়েছে—'প্রতিদিনই কপালে করাঘাত-চ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করিয়া থাকি।' এই স্মরণীয় ও মননীয় বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর অগ্রজের 'জীবন-চরিতে' লিখেছেন—'যখন তিনি পদব্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিত। কারণ এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখন বিদ্যাসাগরের মতো দয়া প্রকাশ করেন নাই।' নারীর বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি বিদ্যাসাগরের এই 'দয়া', এই করুণার্দ্র দৃষ্টি, গভীর হৃদয়বত্তা নিয়ে সেই সুচির সমস্যার প্রতিকার-প্রয়াস যে সকৃতজ্ঞ জন-অভিনন্দনে ধন্য হয়েছিল তারই অভিব্যক্তি উক্ত উদ্ধৃতি দুটি। ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে জানা যায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা সূচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভ-কর্তৃক তাঁর বিধবা কন্যা অভয়ার পুনর্বিবাহদানের ব্যর্থ উদ্যোগে। সেই থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অনেকবার বিধবা-বিবাহের অনুকূলে পণ্ডিতসমাজের সম্মতিলাভের চেষ্টা হয়েছে, নানা প্রখ্যাত ব্যক্তি ও সমাজহিতৈষিণী সভা এই বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আলোচনা ও লেখনী চালনা করেছেন, এমন কি, ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিদ্যাসাগরের আগেই (১৮৪৫) বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, যদিও কার্যত তা ফলপ্রসূ হয়নি। যা হোক, প্রথম উদ্যোক্তা না হলেও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম ও কীর্তি যে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেল, তার কারণ —বিদ্যাসাগর সমস্যাটিকে বিতর্ক যুক্তি ও প্রবল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেমন তুলে ধরেছিলেন, তেমনি শুধু যুক্তি নয়—হৃদয়ানুভূতি এবং মানবিক কারুণ্যের আবেদন নিয়েও উপস্থিত হয়েছিলেন সমাজের কাছে। ১৮৫০ সালে (আগস্ট) প্রকাশিত 'সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর-রচিত 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে দেখি— 'বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়, এবং পতিবিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাসদিবসে পিপাসানিবন্ধে কিম্বা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায় তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধদানেরও অনুমতি দেন না।' এই করুণাসঞ্জাত উপলব্ধিরই অভিব্যক্তি ঘটেছে ১৮৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক প্রথম পুস্তিকায়, এবং ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হ'লো উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ—যাতে হৃদয়বান মনীষী বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবারিধি মন্থন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রসম্মত বিধান। সতীদাহপ্রথা বিলোপের জন্যে আন্দোলন করতে গিয়ে একদা রাজা রামমোহন যে শাস্ত্রনির্ভর যুক্তি-ভিত্তিক বিতর্ক সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন তারই আদর্শরূপ দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তকে। বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য এর হৃদয়সমুত্থ সহমর্মিতার দিকটি। করুণার উৎসমুখে যেমন কবি বাল্মীকির আদিশ্লোকের সঞ্চার, তেমনি নারীর বৈধব্যযন্ত্রণায় করুণাকাতর বিদ্যাসাগরও সমস্ত যুক্তি-সিদ্ধান্তের শেষে আবেদন করলেন

দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রবন্ধে তারই একটা রূপরেখা এঁকে আমরা দেখবো, নারীর বৈধব্যবেদনায় বিচলিত বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও হৃদয়বত্তার সংক্রমণ ঘটেছে সহৃদয় সামাজিক-চিত্তে; বিধবার প্রতি সমবেদনার সূত্রে সমগ্র নারীজাতিই সাহিত্যে সাগ্রহ পরিচর্যা লাভ করেছেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রাবল্যকালে পয়ার-ত্রিপদীতে বহু ছড়া গান কবিতা রচিত হয়েছিল নানা পত্র-পত্রিকায়। 'সমাচার-সুধাবর্ষণ', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতিতে প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্ত ও অন্যান্যের কবিতা, দাশরথি রায়ের এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ পালা গান, শান্তিপুরী কাপড়ের পাড়ে লেখা গান—সেই উদ্দীপনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে সেগুলো বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হয়েছে বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ' (৩য় খণ্ড) এবং ইন্দ্রমিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে। এই পদ্যগুলোর সাময়িক প্রয়োজন অচিরেই নিঃশেষিত হয়েছিল বলে আমি সে সম্পর্কে উল্লেখমাত্র করলাম। কেননা, বিষয়টি স্থায়ী রসসাহিত্যে কিভাবে ধরা পড়েছে তাই আমাদের বিচার্য।

॥ ২ ॥

জানা কথা, নাটকই হ'লো কোনো বিশেষ ভাবধারা প্রচারের শক্তিশালী বাহন, সামাজিক সমস্যা প্রতিফলনের উজ্জ্বল দর্পণ। কৌলীন্য-প্রথার বিষময় ফল প্রদর্শন করে ১৮৫৪ সালে রচিত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক। এতেও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা যশোদার মুখে—বিবাহরাত্রেই সে হয় বিধবা অন্যান্য বোনদের সঙ্গে।

তখনি বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হই সপ্ত স্বসা
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব।

বিধবা-বিবাহ-প্রয়াস তখনি যে কিছুটা সূচিত হয়েছে, তার আভাস পাই যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে। ফুলকুমারী যশোদাকে আশার কথা শোনাচ্ছে 'ঠানদিদি! তোর অবাক হয় এই, ও পাড়ায় শুনলেম

ষাঁড়ের বে নাকি চলতি হবে, তবেই তো তোর হ'লো।' বিধবা-বিবাহ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। পরের বছরে বিধবা-বিবাহ বিল প্রবর্তিত হ'লো, এবং সেই বছরেই বিধবা-বিবাহের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনটি নাটক লেখা হয়েছিল—উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ', উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ', রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন'। এর মধ্যে উমেশ-চন্দ্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এতে শুধুমাত্র বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততাই তুলে ধরা হয়নি, এই সামাজিক সমস্যাটি সম্পর্কে একটা বাস্তব ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। নাটকে বালবিধবা সুলোচন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে লোকলজ্জা এড়াবার জন্যে বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল। পূর্বে বিদ্যাসাগরের যে আবেগময় আবেদনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে সমাজে এই ধরনের শোচনীয় ঘটনার সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত দিয়ে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়-তার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিষের জ্বালায় ছটফট করে হতভাগিনী সুলোচনা জল চাইছে, আর ঐদিনই একাদশী বলে (বিধবা বিধায়) তাকে জলপান করতে দেওয়া হচ্ছে না—এই ধরনের মর্মান্তিক দৃশ্য সামাজিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই প্রবন্ধের গোড়ায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) রচনাটি থেকে যে অংশটুকু উদ্ধার করা হয়েছে তাতেও বিধবার নিরম্বু একাদশী পালনের নির্মম বিধান সম্পর্কে বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচ্য নাটকে বিধবা প্রসন্নকে পুনর্বার বিবাহ দিয়ে বিধবা-বিবাহের সদর্থক দিকটিও প্রতিফলিত করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থের বক্তব্য ও যুক্তির প্রভাব সে নাটকটিতে রয়েছে তা পণ্ডিতদের আলোচনা-দৃশ্যের বিতর্ক থেকে বোঝা যায়। এটি প্রহসন বা নকশা নয়, চার অঙ্কে গাঁথা বিয়োগান্ত নাটক। ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর নাকি এর অভিনয় দেখে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। দেখা যায়, আন্দোলনের সূচনা থেকেই

বিদ্যাসাগর নারীর বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি সাহিত্যিকদের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা হয়েছিল বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা পরিণয়োৎসব' নাটক, সিমুয়েল পীরবক্সের 'বিধবা-বিরহ' নাটক, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা-চিত্ত-চাপল্য' প্রভৃতি নাটক। নকশাধর্মী এই সব নাটকের নাট্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নেই, তবে বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রয়াসকে সাধ্যমত সমর্থন জানিয়ে এই নাট্যকাররা সাহিত্যিক কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেননি।

দীর্ঘকাল পরে বৈধব্য-সমস্যাকে নাটকের মাধ্যমে আবার তুলে ধরলেন শক্তিশালী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তার 'বলিদান' (১৯০৫) নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু হ'লো বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে পণ-প্রথাজনিত কন্যাদায়-সমস্যা। মনে রাখতে হবে—কৌলীন্য-প্রথা, পণ-প্রথা, বহুবিবাহ-প্রথা, সবই সুচিরকাল ধরে অসহায় নারীর জীবনে দুর্ভাগ্য বহন করে এনেছে। 'বলিদানে' করুণাময়ের দ্বিতীয়া কন্যা বিবাহের স্বল্পকালমধ্যে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এল এবং সেখানেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট উন্মত্তপ্রায় পিতার গঞ্জনায় অবশেষে জলমগ্না হয়ে বৈধব্যযন্ত্রণার অবসান ঘটাল। এই শোচনীয় বাস্তব চিত্রটি পণ-প্রথা ও কন্যাদায় সমস্যার গুরুত্বকে প্রগাঢ় করে তোলার জন্যেই এসে পড়েছে। এখানে নাট্যকার বৈধব্যের লাঞ্ছনাটুকুই দেখিয়েছেন, বিধবার পুনর্বিবাহ-সমস্যাকে টেনে আনেননি। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সংশয়াত্মক ধারণা প্রকাশ পেয়েছে 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে (১৯০৮)। এখানে তিনটি বিধবা নারীর জীবনকে তিন দিক থেকে প্রতিফলিত করে গিরিশচন্দ্র সমস্যাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নাটকে প্রসন্নকুমারের বিধবা পুত্রবধূ নির্মলা আপন ভাগ্যকে শান্তমনে মেনে নিয়ে ব্রহ্মচর্য ও সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে। তার ধারণা -'বিধবা-বিবাহ শুনলে আমার হৃদ্‌কম্প হয়। মনে হয় বুঝি হিন্দুসমাজে সতীত্ব লোপ পাবে'। প্রসন্নকুমার নিজে কিন্তু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। তাঁর বক্তব্যে বিদ্যাসাগরের কথাই যেন

প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীনে থাকতে, ভ্রূণহত্যা হবে না, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবে না।'—তাঁর জ্যৈষ্ঠা কন্যা বিধবা ভুবনমোহিনীকে তার মৃত স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত জেনে প্রসন্নকুমার কনিষ্ঠা কন্যা বিধবা প্রমদাকে পুনরায় বিবাহ দিলেন লম্পট অর্থলোভী ঘেঁচির সঙ্গে, জামাতার কীর্তি প্রসন্নকুমারের অজ্ঞাত ছিল। ব্যর্থ হ'লো প্রমদার দ্বিতীয়বারের সংসার-জীবন। নাটকে ছদ্মবেশী মহাপুরুষ পাগলের মুখ দিয়ে এইরূপ পরিণতির আশঙ্কাই গিরিশচন্দ্র প্রকাশ করেছেন—'অর্থলোভে সমাজভয়বর্জিত ব্যক্তি ব্যতীত বিধবা-বিবাহ করতে কেউ সম্মত হবে কি না সন্দেহস্থল। এরূপ অবস্থায় বিধবা-বিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব।' আশঙ্কাটি একেবারে অমূলক ছিল না। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর নিজেও কম প্রতারিত হননি এই ধরনের খলপ্রকৃতির লোকের কাছে, যারা তাঁর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বিধবা-বিবাহের নামে বহুবিবাহই করেছে। সমাজে অনুষ্ঠিত অনুরূপ প্রতারণার ঘটনা হয়তো বা গিরিশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিম্বা জেনেছিলেন। যা হোক, তিনি সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বটে, কিন্তু বিধবা-বিবাহের আনুকূল্য করতে পারেননি তার সদর্থক দিকটি চোখে পড়েনি বলে এবং চিরাচরিত সতীত্বের আদর্শে অবিচলিত আস্থাসম্পন্ন ছিলেন বলে।

বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনোত্তর কাব্য-কবিতায় আমরা দেখতে পাই—হৃদয়বান উদার কবিরা নারীর বৈধব্যবেদনার মর্মন্তুদ ছবিটি গভীর সহ-মর্মিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা বিধবার পুনর্বিবাহ-সমস্যা ও তার শুভ-অশুভ দিকটি নিয়ে বিচারে বসেননি, কবিতা তার উপযুক্ত ক্ষেত্রও নয়। বরং নারীর বৈধব্যযন্ত্রণায় উদ্গত অশ্রু বিদ্যাসাগরের ব্যাকুলতা ও করুণার্দ্র উপলব্ধিকে তাঁরা ভাষা দিয়েছেন গভীর আবেগে, তাই বিবৃতিধর্মিতা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতার উদ্দেশ্য-সাফল্য স্বীকার্য। ১৮৭১ সালে রচিত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যে নারীর বৈধব্য-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের উক্তিরই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই—

হিন্দুর আশ্চর্য কিবা লজ্জার সংস্কার !
অতি লাজ বাসে দিতে বিয়া বিধবার !
কন্যা ভগ্নী ব্যভিচার লাজ নাই তায় !
শত ভ্রূণহত্যা করে,
সে পাপে না কেহ ডরে,
নরকে না ডরে, ডরে নরের কথায় !!
যাক ধর্ম, দেশাচার রক্ষা যদি পায় ॥

এই কবিতায় কবি আপন প্রিয়তমাকে তাঁর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করবার অনুমতি জানিয়ে রীতিমত দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে একটি স্তবকে কবি বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের প্রশস্তিও রচনা করেছেন। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর 'বালবিধবা' (শঙ্খ) কবিতার সূচনায় বলেছেন--

হারায়েছে পতি নবম বরষে
বিবাহের প্রায় দু'মাস পরে ;
লোকে বলে তার কি পোড়া কপাল,
এমন স্বামী কি অকালে মরে ?

সামাজিক সংস্কার এমনি করে দুর্ভাগ্যের দায় চাপিয়ে দেয় অসহায়া কন্যাটির উপর। সহানুভূতিসিক্ত কবি অকাল বৈধব্যপীড়িতা বালিকাটির মর্মবেদনা স্বামীর অস্পষ্ট স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন গীতি-কবিতাটিতে। স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস 'ফুলরেণু' কাব্যে জনৈকা মোক্ষদার সদ্য বৈধব্যপ্রাপ্তির মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটি সনেটে। প্রথম কবিতার স্বল্পভাষণেই কবির সহমর্মিতা সুস্পষ্ট--

শীতান্ত সায়াহ্ন—সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়,
জ্বলিছে শ্মশানে শব চিলাই-এর তীরে,
... ...
নয়নে গলিত ধারা মুখে হাহাকার,
এলোমেলো বেশে বালা শোকে ম্রিয়মাণ।

নিবিঙ্গ চিলাই'র চিতা—জ্বলিতে সর্বদা,
ঘরে গেল মহাচিতা—বিধবা মোক্ষদা।

হেমচন্দ্রের 'বিধবা রমণী' (কবিতাবলী) কবিতাটি মূলত বিবৃতিধর্মী ও কাব্যোৎকর্ষে ন্যূন হলেও সহৃদয়তায় সিঞ্চিত—

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে,
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে।

... ...

হায়রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারীবধ করে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এদেশের শাস্ত্রের লিখন,
এদেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?

হেমচন্দ্র যে বিদ্যাসাগরের বেদনার্ত ভাবনায় ভাবিত ছিলেন তা উল্লিখিত কাব্যাংশের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থের শেষ সতাকর উক্তির সাদৃশ্য থেকে বোঝা যাবে।—'হায়, কী পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।' নারীর বৈধব্যবেদনার প্রতি অনুরূপ সমবেদনাসিঞ্চিত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে নবীনচন্দ্রের 'বিধবা কামিনী' (অবকাশরঞ্জিনী) কবিতায় এবং 'রৈবতক' কাব্যে বিধবা সুলোচনার মূর্তি অঙ্কনে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিধবা' (আলেখ্য) কবিতায় কোনো প্রচারাত্মক বক্তব্য নেই, শুধু জনৈকা সুন্দরী বিধবার স্মৃতিচারণের বেদনাবিধুর বর্ণনাতেই তা মর্মস্পর্শী। প্রবন্ধ দীর্ঘ হতে চলেছে বলে কতিপয় মহিলা কবির কবিতার উল্লেখ আর করা হ'লো না, যদিও

তাঁদের কয়েকটি কবিতায় ব্যক্তিগত বেদনার করুণ স্পর্শ লেগেছে। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছাড়া আর কোনো কবি ঠিক বিধবা-বিবাহের অনুকূলে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেননি, তবে বৈধব্যসমস্যার প্রতিকার যে একান্ত কাম্য—তা তাঁদের কবিতায় আভাসিত হয়ে উঠেছে সহৃদয় উপলব্ধি-সূত্রে।

এ বিষয়ে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্নতর। যদিও তিনি 'কুন্দ' কবিতায় (শেফালিগুচ্ছ) কুন্দকুসুমের উদাস শুভ্রতার সঙ্গে বঙ্গরমণীর বৈধব্যবেদনাকে মিলিয়ে দেখেছেন এইভাবে—

তোরি মত কত শত নব তপস্বিনী
আছে বঙ্গ ঘরে!
আশৈশব শ্বেতবাস অশ্রুজল বারোমাস,
দেশাচার-শৃঙ্খলেতে তাহারা বন্দিনী।

তবু অন্তরে অন্তরে ঐ দেশাচারকেই পবিত্র বিধানরূপে মেনে নিয়ে অবস্থাবৈগুণ্যে সর্বংসহা বিধবা নারীর প্রশস্তি রচনা করেছেন, তার কৃচ্ছ্রসাধনার উপর চিরাচরিত রীতিতে বিপুল মহিমা আরোপ করেছেন। 'পারিজাতগুচ্ছ' কাব্যের 'বিধবার ঠেঁটি (শ্বেতবস্ত্র) কবিতার প্রাক্‌ভাষণে কবি আবেগপূরিত গদ্যে যে বৈধব্য-মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন তা থেকে তাঁর পূর্বোক্ত মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।—'মা! তুমি বাঙ্গালীর ঘরে কুললক্ষ্মী······আমি কবিমুখে শুনিয়াছি, দিব্যকর্ণে শুনিয়াছি, দেবতাদিগের মুখে শুনিয়াছি, যেদিন বঙ্গগৃহে তপস্বী ব্রতধারিণী বিধবা থাকিবে না, সেদিন বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ হইবে।' তাই আমার ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে বঙ্গবিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক ছিল, সব রাশীকৃত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি।' এই মনোভাব নিয়েই তিনি বৈধব্যের নিদর্শন শ্বেত অঙ্গবাসের মহিমা-গাথা রচনা করেছেন—

কাজ কি রে মিছে আর চক্ষু রেখে,
দেখিতেই যদি তোরা না পেলি চোখে।

দেখ বিধবার অঙ্গে
ঝলকে রে রঙ্গে ভঙ্গে
রত্নময় শাড়ি খানি !—মরি যে শোকে !
'সাদা ঠেঁটি' বলে ঘৃণা করে গো লোকে !

নাটকে যেমন উমেশচন্দ্র মিত্র, কবিতায় যেমন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, উপন্যাসে তেমনি বঙ্কিম-সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত বিধবা-বিবাহের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁর 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসদ্বয়ে। তাঁকে বঙ্কিমের আগে রাখছি আলোচনার সুবিধার জন্যে। 'সংসারে' বালবিধবা সুধাকে বিবাহ করার জন্যে শরতের আগ্রহ, রূপাসক্তি প্রেমোন্মাদনা থাকলেও তা কামোন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়নি। সুধার বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি আন্তরিক বেদনাবোধ শরতের বিধবা-বিবাহ সংকল্পকে সুদৃঢ় করেছে, সমাজের অসম্মতি বা অসন্তোষকে উপেক্ষা করার মনোবল যুগিয়েছে। উপন্যাসটির মধ্যে বহু যুক্তিতর্ক-আলোচনা এসে পড়েছে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্যে, যাতে অনুরণিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকালীন অনুকূল ও প্রতিকূল মন্তব্যাদি। তার দরুন ঔপন্যাসিক রস ও শিল্প-ঔচিত্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের সদর্থক দিকটি উজ্জ্বল করে তুলে ধরার সাহিত্যিক প্রয়াস হিসাবে এর গুরুত্ব স্বীকার্য। যা হোক, নায়ক শরতের বৃদ্ধা মাতা সুচির সংস্কারের বশে প্রথমে পুত্রের বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবটিকে মেনে নিতে না পারলেও পরে তাতে সম্মতি দিয়েছেন। তাঁর গুরুদেব বিধবা-বিবাহের বিধান দিতে গিয়ে বলেছেন—'মা, একদিন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবা-বিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন আমি শাস্ত্রবিদ্যাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন, তাঁহার কথাটি প্রকৃত। বিধবা-বিবাহ

সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে।' শরৎ ও সুধার বিবাহ-উৎসবের সময় সমাজের আনুকূল্য ও বিরুদ্ধতার যে বর্ণনা রমেশচন্দ্র দিয়েছেন, তাতে বিদ্যাসাগরকর্তৃক আয়োজিত ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম ঐতিহাসিক বিধবা-বিবাহ উৎসব সমারোহের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়, সেই বিবাহের পাত্র ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং পাত্রী বালবিধবা কালীমতী দেবী। রমেশচন্দ্র শরৎ ও সুধার বিধবা-বিবাহোত্তর দাম্পত্যজীবন সুখপূর্ণ করে চিত্রিত করেছেন, অবশেষে সামাজিক স্বীকৃতি তাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

নাটকে যেমন গিরিশচন্দ্র, উপন্যাসে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন বা সমস্যাকে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। নারীর বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি করুণা-পারবশ্য থেকে নয়, বরং বিধবা নারীর চিত্তেও প্রেমের উদ্দীপ্তি ঘটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেই প্রেমের গতি কুটিল ও জটিল হতেই যে বাধ্য, এই বিশ্বাস থেকেই বঙ্কিম বৈধব্য-সমস্যা এনেছেন তাঁর উপন্যাসে, তাকে তিনি নরনারীর চিরন্তন সমস্যা-রূপেই দেখেছেন—রসসাহিত্যের যা উপজীব্য। রমেশচন্দ্র শরৎ ও সুধার প্রণয়ে পারস্পরিক আকর্ষণকে উপেক্ষা না করলেও সেখানে সামাজিক প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে। যা হোক, বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই প্রথম বিধবা-বিবাহ-প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। পশুপতির পত্নী হৈমবতী দীর্ঘকালের নানা ঘটনা বিপর্যয়ে মনোরমায় রূপান্তরিত হ'লো। বিধবা বলেই মনোরমা তখন পরিচিতা। নিজেকে বিধবা জেনেই মনোরমা পশুপতির দিকে আকৃষ্ট হ'লো। পশুপতিও তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থনের কথা যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাকে বোঝালো, এবং তার মনোভাব অনুকূল করে তুললো। পশুপতি বিধবা-বিবাহের সমর্থক, এবং রাজা বল্লালসেনের মতো নূতন সমাজবিধান প্রবর্তনের প্রয়াসী। কিন্তু পশুপতির এই উদ্যম বিধবা রমণীর দুরবস্থার প্রতি অনুকম্পা সঞ্জাত নয়, আপন প্রবৃত্তি-অনুপ্রেরিত। রমেশচন্দ্রের 'সংসারে'র শরতের মতো উদার উপলব্ধি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পশুপতির নেই। অন্যান্য

গ্রন্থেও বঙ্কিম পশুপতি-পোষিত মনোভাবই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ প্রেমের প্রবল আবেগ ও দুর্বার রূপাসক্তির তাড়নায় নারী-পুরুষ পরস্পরকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে থাকে, বিধবা বলেই কোনো নারীর নারীত্ব ঘুচে যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে, বিধবা নারীর সামাজিক দুর্দশার দিকেই প্রধানত দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেও নারীর এই মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবধর্ম ও প্রবৃত্তি-প্রভাব সম্পর্কে বিদ্যাসাগরেরও ধারণা এবং বক্তব্য কি যথেষ্ট সুস্পষ্ট ছিল না? বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের শেষে আকুল আবেদনের অন্তে দেখি—'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া মনে হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কী বিষময় ফল ভোগ করিতেছ!' সেই বিষময় ফল ফলিয়ে তোলার অভিপ্রায়েই বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' রোপণ। নায়ক নগেন্দ্রনাথ অনাথা অনূঢ়া কুন্দকে যখন আশ্রয় দিয়েছিলেন তখন হয়তো বা কারুণ্যবৃত্তিই ছিল প্রবল, কিন্তু পরে বিধবা কুন্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণে ছিল রূপ-মোহের প্রণোদনা, প্রণয়বঞ্চিতা নবযৌবনা কুন্দের হৃদয়ে প্রেমোন্মেষের মূলেও ছিল তাই। সুতরাং প্রবৃত্তি-পরবশ কুন্দ-লুব্ধ নগেন্দ্রনাথ বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতার আশ্রয় নিলেন—'যদি কেহ বলে যে, বিধবা-বিবাহ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব, তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য?' সহজবোধ্য যে নগেন্দ্রনাথের এই যুক্তি উদার সমাজবোধ-প্রসূত নয়, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়-প্রসূত।

বঙ্কিম নগেন্দ্র ও কুন্দের এই বিবাহ ঘটিয়ে তুললেন, অর্থাৎ বিষবৃক্ষ রোপণ করলেন এই বলে—'রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ, ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রেই উপ্ত হইয়া থাকে।' সুতরাং এর পরিণতিও অনতুমেয় ছিল না। বিধবা-বিবাহসূত্রে নগেন্দ্র-কুন্দের মিলনের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তবে সেই ব্যর্থতার মূল রয়েছে দ্বন্দ্বসংকুল হৃদয়ের গভীরে। এই শোচনীয় পরিণতি রসসাহিত্যেরই দাবি মেটাতে চেয়েছে, সমাজের কাছে কোনো সিদ্ধান্ত বঙ্কিম সম্ভবত রাখতে চাননি। অবশ্য 'সাম্য', গ্রন্থ থেকে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত কিছুটা জানা যায়। 'বিধবা-বিবাহ ভালোও নহে, মন্দও নহে।' সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভালো নহে। তবে বিধবাগণের ইচ্ছামতো বিবাহের অধিকার থাকা ভালো।' এই অভিমত যুক্তিপূর্ণ হলেও বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহের সাফল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে বিধবার প্রেমানুরাগ সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি ও অনুকম্পা যে স্বল্প ছিল না তার পরিচয় রয়েছে কুন্দ-চরিত্রে এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর, রোহিণী-চরিত্রে। দুঃসাহসিক বঙ্কিম এখানে গোবিন্দলাল ও বালবিধবা রোহিণীর মিলন বৈধ-বিবাহ-সংস্কারের মধ্য দিয়ে ঘটিয়ে তোলেননি, যেহেতু এই উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ বড় কথা নয়, (বিধবা রোহিণীর কাছে হর-লালের বিবাহ-প্রস্তাব যে স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত, তা তো সুস্পষ্ট)-যথার্থ প্রেম ও রূপমোহের মধ্যে সংঘাতকেই বঙ্কিম প্রধান উপজীব্য করেছেন ঔপন্যাসিক-নৈপুণ্য সহকারে। এই ধারাই চলেছে পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যে। রমেশচন্দ্রকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তাঁদের পরবর্তী লেখকরা বিধবা নারীকে আর সামাজিক লাঞ্ছনা বা বিধবা-বিবাহ সমস্যার দিক থেকে দেখেননি, দেখেছেন প্রণয়বাসনাবিক্ষুব্ধা চিরন্তন নারীরূপে। তাদের বৈধব্যদশা প্রণয়দ্বন্দ্বে জটিলতা সৃষ্টির সহায়তা করেছে মাত্র।

বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিধবা বিনোদিনীর মধ্যে

দেখি সেই প্রেমবুভুক্ষা। তা সমাজনীতি-বিরোধী বলেই এত দুর্বার, নারীহৃদয়ের অতলান্ত রহস্যে ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় সংক্ষুব্ধ। বিধবার পুনর্বিবাহ এখানে সমস্যা নয়। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র অনেক বেশী সহানুভূতিশীল। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-দান সমস্যা শরৎচন্দ্রকে ততটা উদ্দীপ্ত করেনি, তাঁর মধ্যে গভীরভাবে সংক্রামিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের প্রবল নারী-অনুকম্পা, সমাজ-নিপীড়িত নারীকে যথার্থ নারীত্বের-মর্যাদা দানের উদ্যম। তাই মনে হয়, অন্তত নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে হৃদয়বান বিদ্যাসাগরের সার্থক উত্তরপুরুষ দরদী শরৎচন্দ্র। সেই হৃদয়ের ঔদার্যে তিনি নারীকে কখনো ছোট করে দেখতে পারলেন না, সেই হার্দ্য অনুভূতিকে পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি দিয়ে তুলে ধরলেন 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র মাধবী, 'পল্লীসমাজে'র রমা, 'শ্রীকান্তে'র অভয়া, 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী, 'শেষপ্রশ্ন'এর কমল সবাই নিঃসন্দেহে বিধবা, কিন্তু তাদের সমস্যা বৈধব্যের নয়, নারীত্বের। ততদিনে বিধবা-বিবাহকে সমাজ অনেকটা স্বীকার করে নিয়েছে, যদিও বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পরিমাণ সুপ্রচুর নয়।

দেখতে পেলাম - বিধবা নারীর দুর্ভাগ্যের প্রতি করুণায় যে উৎসমুখ একদা বিদ্যাসাগর খুলে দিয়েছিলেন, তা আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে বিচিত্রমুখী হয়ে। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের চরম সার্থকতা নিহিত রয়েছে নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করার মধ্যে। আমাদের সাহিত্যে সেই উদার দৃষ্টির প্রতিফলন অনস্বীকার্য।

বিদ্যাসাগরকে বাঙ্গালা গদ্যের জনক বলা সুযুক্তিসম্মত কি না সে-বিষয়ে মতভেদের অবকাশ যদি-বা থাকে, তবু, বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজের জনক বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা থাকিবার কথা নহে। সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়া একথা মানিয়া লইতেই হইবে যে, বিংশ শতকের শিক্ষিত-সমাজের জন্মই হইয়াছে বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে। বঙ্গসন্তানকে কেমন করিয়া শৈশব হইতেই ধাপে ধাপে শিক্ষার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে তাহা তিনি গভীর ও ব্যাপকরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন। যথার্থ শিক্ষা-বিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। যে-কালে বিদ্যাসাগর বর্তমান ছিলেন সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-সম্পর্কে তাঁহার অবদান পর্যালোচনা করিলে মনে হয় কোনো একজন বাঙ্গালীর দ্বারা শিক্ষা-জগতের এমন সর্বাঙ্গীণ উপকার আর কখনও সাধিত হয় নাই। সর্ববিধ শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার দান অপরিসীম।

এ-দেশীয় বালক-বালিকার সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যদিও তিনি অনুভব করিতেন, তবু, তৎকালীন প্রথানুযায়ী টোল বা চতুষ্পাঠীর দীর্ঘসূত্রী শিক্ষায় তাঁহার আস্থা ছিল না। তখনকার দিনে যে সংস্কৃত-শিক্ষাক্রম দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া আয়ত্ত করিতে হইত তাহা ছয় মাসে আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর করিয়াছিলেন তাঁহার 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' প্রণয়ন করিয়া। তিনি চাহিয়াছিলেন সমকালীন জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তার করিতে। বাঙ্গালা দেশের মানুষ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান অর্জন করুক—ইহাই বিদ্যাসাগরের কাম্য ছিল। তৎকালীন পরিবেশে

এই কথাটি তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা ও ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়াই দেশের মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সহজ হইবে। "এই কারণে তিনি বাংলা 'বর্ণপরিচয়' দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, এবং শিশুকে ধাপে ধাপে 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'জীবনচরিত', 'চরিতাবলী' ও 'আখ্যানমঞ্জরী'-র গল্পগুলির মধ্য দিয়া পূর্ণবিকশিত মনুষ্যত্বের দ্বার পর্যন্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন।" এবম্বিধ শিক্ষা পরিকল্পনার শুরুতেই যে-গ্রন্থের সহিত বিদ্যার্থী বালকের প্রথম পরিচয় হইবার কথা, তাহা, বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'বর্ণপরিচয়'-১ম ও ২য় ভাগ। বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি এই 'বর্ণপরিচয়'। সুকুমারমতি বালক-বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ পোক্ত করিয়া গড়িবার কাজেই এই গ্রন্থের গৌরব সীমায়িত নহে, বাঙ্গালা গল্পসাহিত্যের জন্ম-সম্ভাবনার আকর এই 'বর্ণপরিচয়'।

শুধু বর্ণজ্ঞান বা বানান প্রকরণ নহে, শিক্ষিত হইয়া উঠিবার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধ বিষয়ের ন্যূনতম উপাদান ছড়ানো রহিয়াছে 'বর্ণপরিচয়'-এর মধ্যে। বাঙ্গালা দেশের শিশুকে জ্ঞানোন্মেষের প্রথম মুহূর্ত হইতে যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে পড়িতে হয় তাহা স্মরণে রাখিয়া শিশুর চিত্ত-বিকাশের উপযোগী পর্যাপ্ত উপকরণ ইহাতে সুচারুরূপে বিদ্যাসাগর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে যাহা আজ আমাদিগের নিকট অতি সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত, তাহা সেদিন, বিদ্যাসাগরের কালে, গ্যালিলিও, কোপর্নিকাস বা কলম্বসের আবিষ্কারের ন্যায়ই অভাবিত ছিল। সে-যুগের শিশুপাঠ্য পুস্তক যে কত নীরস ও দুর্বোধ্য ছিল তাহা না দেখিলে 'বর্ণপরিচয়'-রচনায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব পরিমাপ করা সহজে সম্ভব নহে। তৎকালের 'শিশুবোধ' ও 'শিশুশিক্ষা'র সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিবার সুযোগ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা সহজেই এই উক্তির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় 'heart of a Bengali mother' বিদ্যাসাগরের ছিল। বাঙ্গালী মা তাঁহার শিশুর জন্য যে মমতা, স্নেহ ও সহানুভূতি পোষণ করেন, এদেশের আগত ও অনাগত অগণিত শিশুর জন্য সেই মমতা, স্নেহ ও সহানুভূতি লইয়া বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' রচনা করিয়াছেন। শিশুর কল্পনার দৃষ্টিকে উন্মোচিত ও প্রসারিত করিয়া দিতে তিনি সচেষ্ট থাকিয়াছেন। ঠাকুমা-দিদিমা, মা-মাসীর মুখে রূপকথার গল্প শুনিতে অভ্যস্ত এ দেশের শিশু চিত্ত; ঘুম-পাড়ানী গান শুনিতে অভ্যস্ত তাহাদের মন; এক কথায়, চিত্র, সুর ও গল্প— এই তিনের প্রতিই শিশুর প্রাথমিক প্রবণতা। 'বর্ণপরিচয়' রচনা করিতে বসিয়া বিদ্যাসাগরের মন এই বিষয়ে খুবই সজাগ ছিল। সেখানে তিনি কথা দিয়া ছবি আঁকিয়াছেন, শব্দযোজনার মধ্য দিয়া সুর জাগাইয়াছেন, এবং পরিশেষে ছোটখাট বিষয় লইয়া গল্প গড়িয়াছেন।

শিশুর চিত্তে অক্ষরের পরিচয় মুদ্রিত করিয়া দিবার যে সহজ পন্থাটি তিনি বাছিয়া লইয়াছেন তাহা শিশুর নিত্য-দেখা আনারস, লিচু, ওল, কোকিল, খরগোস, গরু, ঘোড়া ইত্যাদির সামীপ্যে যুক্ত করিয়া। 'অ' চিনিতে শিশুর মনে 'অজগর' উঁকি দিল, 'আ' চিনিতে গিয়া সে 'আনারস' দেখিল, 'ক' চিনিতে গিয়া মনের মধ্যে জাগিল 'কোকিলের' ছবি, 'খ' বলিতেই সেখানে 'খরগোস' দৌড়িয়া আসিল। শিশুর শিক্ষা যেন তাহার চিত্তে ভীতির সঞ্চার না করিয়া কৌতূহল ও কৌতুক উদ্রিক্ত করে সেদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি ছিল সজাগ।

এইভাবে 'বর্ণপরিচয়'-এ বাঙ্গালা বর্ণসমূহের সহিত শিশুকে পরিচিত করাইয়া লইয়া তিনি 'পাঠ' শুরু করিলেন। ১ম পাঠে 'বড় গাছ', ছোট পাতা'; ২য় পাঠে 'হাত ধর', 'বাড়ি যাও'; ৩য় পাঠে 'জল পড়ে' 'মেঘ ডাকে'। শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টি জগৎ ও জীবনের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছে তাহারই মধ্যে তাহার পাঠের বিষয় ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। যেন 'বড় গাছে ছোট পাতা'

দেখিয়া বিস্মিত শিশুটি বয়স্কদের 'হাত ধরিয়া বাড়ি যাইবে' তখনই যখন 'মেঘ ডাকিবে, জল পড়িবে'। চলমান জগতের চিত্র শিশু-চিত্তে জাগাইতেছেন বিদ্যাসাগর, সেইসঙ্গে সুরের দোলায় দোলাই-তেছেন তাহাকে। ক্রমে শিশু যখন ৮ম পাঠে আসিয়া পঁহুছিয়াছে তখন জগতের দিকে চাহিয়া সে দেখিতেছে—'জল পড়িতেছে', 'পাতা নড়িতেছে', 'পাখী উড়িতেছে', 'গরু চরিতেছে'।

এই পর্যন্ত চিত্র ও সুর লইয়া শিশুচিত্তকে অল্পে অল্পে জাগাইয়াছেন বিদ্যাসাগর; এইবার তাহাকে গল্পের জগতে লইয়া যাইবেন। শুরু হইল 'বর্ণপরিচয়'-এর ৯ম পাঠ। গোপাল, মাধব, রাখাল, যাদব ও ভুবন আসিয়া পড়িল। তাহারা শিশুর নিত্যসঙ্গী। তাহাদের চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য। এইটি তাহাদের নিজস্ব জগৎ। ১৩শ পাঠ পর্যন্ত সেই জগৎ সৃজনের কাজ চলিয়াছে। ১৪শ পাঠ-এ আসিয়া সেই শিশুজগতে ঘটনার সূত্রপাত হইল। 'আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিলে চলিবে না।' ক্রমে ১৫শ পাঠ-এ—'বেলা হইল। পড়িতে চল।' ১৬শ পাঠ হইতে ক্রমান্বয়ে শুরু হইল বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র পরিচয়। 'রাম কাল পড়িবার সময় গোল করিয়াছিল।' 'নবীন কাল ভুবনকে গালি দিয়াছিল।' 'গিরিশ কাল পড়িতে আসে নাই, সারাদিন খেলা করিয়াছে।' 'গোপাল বড় সুবোধ, গোপালকে যে দেখে সে ভালবাসে', —'রাখাল তেমন নয়, রাখালকে কেহ ভালবাসে না।' এইভাবে শিশু-চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের স্বাদ জাগাইয়া 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগ সমাপ্ত হইল।

শুরু হইল 'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগ। সংযুক্তবর্ণ শিক্ষা করিতে বসিয়া প্রথমেই শিশুমন 'ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য'র ঝঙ্কার শুনিল। তাহার পরে ১ম ও ২য় পাঠ-এ কুবাক্য কহা; শ্রম না করা ও মিথ্যা কহা যে অপরের ঘৃণা উদ্রেক করে সে জ্ঞান শিশুকে দেওয়া হইল। আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধানে শিশুকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন বিদ্যাসাগর।

তাই, ৩য় পাঠ-এ আসিয়া 'সুশীল বালক'-এর পরিচয় দিলেন। কিন্তু শুধু পরিচয় বর্ণনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইবেন না। তিনি গল্পের জগৎ রচনা করিবেন। সেই জন্য ক্রমে ক্রমে আট বৎসরের যাদব, নয় বৎসরের নবীন ও দশ বৎসরের মাধবের কথা বলিলেন। চরিত্র ও ঘটনা- এই দুই-এর যোগে গল্পের সৃষ্টি। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের শিশুচরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া তাহার পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘটনার জগতে প্রবেশ করিতেছেন। পরিশেষে 'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগের ১০ম পাঠ-এ আসিয়া বিদ্যাসাগর পরিপূর্ণ গল্প উপহার দিলেন—

"একদা, একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল।...তাহার মাসী তাহাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন।...তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল।...কিছুকাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল।...বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসীর আজ্ঞা দিলেন।...ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মতো, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐস্থানে আনীত হইলেন এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট গেলেন।...মাসীর নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকট মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া মাসীর একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসীর কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এ পুরস্কার হইল।"

'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগের এই ১০ম পাঠ শুধু শিশুর পাঠ নহে, ইহা

শিশুর অভিভাবক-শ্রেণীর পাঠ। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গল্প। এই গল্প সেদিন বাঙ্গালীর মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন এই গল্প আমাদের দেশের মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজ কোনও তরুণ যখন চোঙা-জাতীয় পাৎলুন পরিধান করিয়া রঙ্গীন ছিটের ব্লাউজ বা কুর্তা গায়ে দিয়া চুলের সম্মুখভাগে সিঙ্গাড়ার ন্যায় চূড়া বানাইয়া বই খুলিয়া পরীক্ষা দিতে বসে তখন 'ভুবনের মাসী'কে মনে পড়ে। মনে হয়, উহাদের অভিভাবকদের 'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগের ১০ম পাঠটি পড়া হয় নাই। কিন্তু, উহা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে ; আমাদের প্রতিপাদ্য বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গল্পের জনক, এবং সে গল্পের জন্ম 'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগে।

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনটিই ছিল গল্পকারের মন। শুধু যুগ-প্রতিবেশ ছোট গল্প রচনার অনুকূল ছিল না বলিয়াই তিনি পরিপূর্ণ গল্প-রচনায় মনোযোগী হয়েন নাই। জাতীয় জীবনের গতিবেগ যখন দ্রুত হয় তখনই সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য দেখা দেয়, মন্থরগতি জীবনে রচিত হয় মহাকাব্য বা উপন্যাস। বিদ্যাসাগরের কালে এই দেশ তাহার দীর্ঘকালপোষিত মন্থরগতি জীবন হইতে দ্রুতগতিবেগসম্পন্ন জীবনের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সেই প্রস্তুতির প্রভূত উপকরণ স্বয়ং বিদ্যাসাগরই অনেকাংশে রচনা করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার ও ভাষা-সংস্কারে লিপ্ত থাকিয়া তিনি অগ্রিম গল্প লিখিয়া ফেলিয়াছেন। গল্পের দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল খুব। হিন্দী গল্প, সংস্কৃত গল্প, ইংরাজী গল্প সব দিকেই তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'কথামালা' এবং 'আখ্যানমঞ্জরী' বা 'শকুন্তলা' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' তাহারই সাক্ষ্য দেয়। বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতৃদেবকে যখন কাশীতে লইয়া যান সেই সময়ে নৌকায় রাত্রিযাপন প্রসঙ্গে অমৃতলাল বলিয়াছেন —"সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বসিলাম—গল্প বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন, 'গল্প শুনবি ?

কি রকম গল্প বলবো—তু' মিনিটের মতো, না, আধ ঘণ্টার মতো ?' ছোট-বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য়, পৃঃ ৭৫)। বিদ্যাসাগরের তিরোভাবের পর 'সখা' পত্রিকায় তাঁহার লিখিত তু'তিনটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৩-এ জর্জ ওয়াশিংটনের কাহিনী অবলম্বনে 'মাতৃভক্তি' নামক গল্প, ১৮৯৪-এ 'ছাগলের বুদ্ধি' নামে অপর একটি গল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন কখনও '**মুকুল**'-এ, কখনও 'ধ্রুব'তে তাঁহার লিখিত গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সে যুগ গল্পের যুগ নহে, গঠনের যুগ। প্রতিভার পূর্বগামিতার বলেই বিদ্যাসাগর উপযুক্ত যুগ আসিবার পূর্বে গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা গল্পের যে রাজরথ রবীন্দ্রনাথের নিপুণ সারথ্যে একদা বিশ্ববিজয়ে বাহির হইবে, পূর্ব হইতেই তাহার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। সেই প্রস্তুতির প্রকৃষ্ট পরিচয় বর্ণপরিচয় ২য় ভাগের ১০ম পাঠঃ বাঙ্গালা গল্পের প্রথম অনবদ্য চরিত্র ভুবন ও ভুবনের মাসী।

বিদ্যাসাগর সেকেলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন, কিন্তু সেকেলে মানুষ ছিলেন না। তিনি বিধিমতো বিদ্যা-ব্যবসায়ী টুলো পণ্ডিত হয়ে রইলেন না, হলেন বিদ্যাজীবী হিউম্যানিস্ট। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বহমান কালের সঙ্গে চলতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয়ে ও সামাজিক মানসে লোক-কল্যাণের আদর্শকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। লোকহিতকর বিদ্যা-ভাবনায় তিনি যেমন বর্ণপরিচয় ও বোধোদয় লিখেছেন, তেমনি বাসুদেবচরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, বাঙ্গালার ইতিহাস, শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, মহাভারত, আখ্যানমঞ্জরী ও ভ্রান্তিবিলাস লিখেছেন। বেতালপঞ্চবিংশতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের পাঠার্থে রচিত এবং এদেশের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই প্রচলিত হয়। শকুন্তলা ও সীতার বনবাসও দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। তাই তাদের জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর। অথচ মহাভারত ও ভ্রান্তিবিলাস ছাত্রদের পাঠার্থে গৃহীত হয়নি বলে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। তাঁর এই গ্রন্থগুলি স্বাধীন রচনা নয়; কোনো-না-কোনো প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য মূল অবলম্বনে লেখা। বিদ্যাসাগরের স্বাধীন রচনা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার, আত্মচরিত, প্রভাবতী সম্ভাষণ ইত্যাদি। প্রয়োজনমূলকতাই অন্যান্য গ্রন্থগুলির প্রেরণা, শিল্পগত প্রেরণায় লেখা শুধু আত্মচরিত ও প্রভাবতী সম্ভাষণ।

শকুন্তলা (১৮৫৪) বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে সমাদৃত রচনা। এটির মূল অবলম্বন কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক। বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, সংস্কৃত নাটকটির উপাখ্যানভাগ মাত্র বাংলায়

সংকলিত করলেন—মূল গ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। একটা নাটককে গদ্য-আখ্যায়িকায় রূপায়িত করতে গেলে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তিনি সঠিকভাবে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। তাই তাঁর রচনা থেকে বাদ গেছে—প্রস্তাবনা ভাগ, কাব্যাংশ ও নাটকীয় মুহূর্ত। তিনি কোথায়ও বর্জন করেছেন বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ও আভিধানিক শব্দ; কোথাও মূলের যথোচিত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পটিকে তখনকার বাঙালী পাঠক, বিশেষ করে কিশোরদের কাছে উপযোগী করার দিকে লক্ষ্য রেখে ঢেলে সাজিয়েছেন। অথচ মূলের বিকৃতি কোথাও ঘটেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কালিদাসের ক্লাসিক পর্যায়ের নাটকটিকে গদ্য-আখ্যায়িকায় রূপান্তরণের এই আদর্শ বিদ্যাসাগর কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তাঁর সামনে যে-কোনো প্রাচ্য আদর্শ ছিল না, তা সুনিশ্চিত। আমরা জানি, য়ুরোপে প্রাচীন কাব্য-নাটককে সহজ গদ্যভাষ্যে উপস্থাপিত করার রীতি প্রচলিত আছে। ইংরেজীতেও এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব নেই। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে ল্যামের (Lamb) লিখিত 'Tales from Shakespeare' (১৮০৭)। এটি প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত Children's classic বলে পরিচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটি শকুন্তলার সাতচল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ল্যামের বইটি বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল, যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করতে পারি। কারণ হিন্দু কলেজের আমল (১৮১৭) থেকে এদেশে সেক্সপীয়ার-চর্চা চলে আসছে। বিদ্যাসাগর সেক্সপীয়ার পড়তেন এবং তার রসগ্রহণ করতে সমর্থ ছিলেন। তিনি ইংরেজী নাট্যকারের 'The Comedy of Errors'-এর এক বাংলা ভাষ্য 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন। সুতরাং ল্যামের 'Tales from Shakespeare'ই যে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা রচনার আদর্শ ছিল, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে,

ল্যামের মতো ছাত্রপাঠ্য ও কিশোরপাঠ্য Children's classic রচনা করা বিদ্যাসাগরেরও লক্ষ্য ছিল। উভয় গ্রন্থের গল্প বলার ঢঙ ও বর্ণন-রীতির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে; উভয় গ্রন্থকার নাটকেরই গদ্য-রূপান্তর রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

দুই

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য মূল অবলম্বনে বিদ্যাসাগর যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন তাদের 'বিজ্ঞাপন' (ভূমিকা) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

(ক) রচনাকে পাঠকের কাছে প্রীতিপ্রদ ও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা তিনি করতেন।

(খ) ভাষার দুরূহতা, অসংলগ্নতা ও অশ্লীলতা দূরীকরণে তিনি সচেতন ও সচেষ্ট ছিলেন।

(গ) অর্থবোধ ও তাৎপর্য অনুধাবনে পাঠকের যাতে সুবিধা হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন।

(ঘ) মূলের উৎকর্ষ ও চমৎকারিত্ব যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তবে সব ক্ষেত্রে যে সেটা সাধ্য নয় সে-সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন।

(ঙ) মূলের সঙ্গে বিষয়গত ঐক্য যথাসম্ভব রক্ষা করতে তিনি অভিলাষী ছিলেন—কখনও মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করতে চেয়েছেন, কখনও বা মূল বিষয়টিকে নিজের মতো করে বলতে গিয়ে প্রায় নূতন সৃষ্টির স্বাদ দিতে এগিয়েছেন।

(চ) ক্ষেত্রবিশেষে মূল গ্রন্থের নামধাম পরিহার করা ও তার বদলে দেশী নামধাম গ্রহণ করে পাঠক-মনের সংস্কারানুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের রচনাবলী সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রযোজ্য এই কথাগুলি বিশেষভাবে শকুন্তলা সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। গ্রন্থটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের গৌড়ীয় রূপ নয়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত রূপ অবলম্বনে লিখিত। এ-সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুর তাঁর অনুবাদ-নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলার ভূমিকায় বলেছেন —'পণ্ডিত-চূড়ামণি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার নব-সংস্করণ প্রচার করেন।' অনুবাদেও ঐ নব-সংস্করণই তাঁর আদর্শ ছিল।

মূলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রচনা মিলিয়ে নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, কোথাও তিনি ভাবানুবাদ করেছেন, কোথাও বা আক্ষরিক অনুবাদ। অনুবাদের ব্যাপারে তিনি কোনো পূর্বপরিকল্পিত সূত্র সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। যখন যেমন উচিত বিবেচনা করেছেন তেমনি লিখেছেন। অন্তর্নিহিত ভাব উপস্থাপনার খাতিরে তিনি কখনও কখনও বিস্তার বা বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। যেমন—

'তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগবতী গীতি শ্রবণ করিয়া রাজা **অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন; কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,** কেন এই **মনোহর** গীতি শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে। প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; **কিন্তু আমার প্রিয়জনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না।**

উদ্ধৃতির স্থূলাক্ষর অংশগুলি যে মূলানুগ নয়, তা মূল ছত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়—

'কিং খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি।'

বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ অনেক বেশী মূলানুসারী। তিনি অবশ্যই বিদ্যাসাগরের অনুবাদ দেখেছেন এবং অতিরিক্ত অংশগুলি বর্জন করা শ্রেয় মনে করেছেন—

'রাজা।—(স্বগত) কোনো প্রিয়জনের বিরহে মন যেরূপ উৎকণ্ঠিত হয়, গানটি শুনে আমারও যেন সেইরূপ হয়েছে। কেন এরূপ হ'লো? তার কারণ বোধ হয়—' —পঞ্চম অঙ্ক।

সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে, বিদ্যাসাগর অতিরিক্ত অংশগুলি কেন যোজনা করলেন ? আমার মনে হয়, তার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ, নাটকে উপস্থিত চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ; তবু কাহিনীর ধারাবাহিকতার মধ্যে যে ফাঁক থাকে তা দৃশ্যসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি, আবহ-সঙ্গীত ইত্যাদির দ্বারা ভরিয়ে তোলা হয়। কিন্তু গদ্য-আখ্যায়িকার রূপবন্ধ আলাদা বলে সে সুযোগ থাকে না, তাই সংলাপে বা বর্ণণায় অতিরিক্ত অংশ জুড়ে দিয়ে কাহিনীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। নাটকে যা 'প্রদর্শিত' হয়, আখ্যায়িকায় তা অন্ততঃ অংশতঃ 'বর্ণিত' হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগরের অনুবাদে অতিরিক্ত কথাগুলি অনিবার্যভাবেই এসেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাসাগরের স্পর্শকাতর ও করুণাঘন চিত্তবৃত্তি আভ্যন্তর তাগিদে মধুর ও দুঃখপূর্ণ অংশে আত্মসংবরণ করতে পারেনি—ঈপ্সিত রসসৃষ্টির লোভে অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক অংশ যোজনায় উৎসাহী হয়েছে। এর ফলে শকুন্তলার অনুবাদ কোনো কোনো স্থলে আক্ষরিকতার সীমা ছাড়িয়ে ভাবধর্মী হয়েছে এবং প্রায় নূতন সৃষ্টিরই আকার ধারণ করেছে। অতএব শকুন্তলাদি গ্রন্থে অনুবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো জরুরী হয়ে পড়ে যে, বিদ্যাসাগর অনুবাদমূলক রচনায় তিনটি সূত্র অনুসরণ করেছেন—মূলানুগত্য, রূপ (form)-আনুগত্য ও স্বানুগত্য।

তিন

বিদ্যাসাগরের বিষয়-সমাধি ও তার ভাষাগত পরিণাম উল্লেখ করার মতো। বিষয়ের সঙ্গে একাত্মকতা তাঁর সাহিত্যিক সিদ্ধির চাবিকাঠি। তাঁর রচনার ভাষাবিভঙ্গে ভাববস্তুরই অনুক্রম দেখতে পাই। শুধু শব্দসজ্জা, অন্বয়শৃঙ্খলা ও বাক্যনির্মাণের খণ্ডাংশে নয়, ভাষার রূপাবয়বের সামগ্রিকতায় বিষয়-শ্রদ্ধা অনুস্যূত বলেই তাঁর লেখার ব্যক্তিনিষ্ঠ স্টাইলের একটা নৈর্ব্যক্তিক রস-পরিণতি ঘটেছে। যে বিষয় যেমনভাবে

লেখা উচিত, সেই বিষয় তেমনিভাবে লেখা হলে তা সকলের হয়ে দাঁড়ায়। যে ভাষারীতি সীতার বনবাসে, শকুন্তলার ভাষারীতি তা থেকে পৃথক ··আত্মচরিতের ভাষারীতি প্রায় যোজন দূরে। এ থেকে শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষার ক্রম-পরিণতি বোঝা যায় না, বিষয়ভেদে ভাষাভেদের তাৎপর্যও বোঝা যায়। মূলের ভাষাপদ্ধতি অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে, সন্দেহ নেই; তবু তাতে বিষয়বোধ ও ভাষাবোধের সাক্ষ্য আছে। শকুন্তলার তিনটি অনুচ্ছেদ ধরা যাক—

(১) মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ন হইলে কেন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত অমাত্য আমায় তদীয় সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছে। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল. এবং বহু যত্নে বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

(২) রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবলবেগে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্-শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে,

ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদগদ-বচনে কহিলেন, বাছা, ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

(৩) শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি—এইমাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি তাহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

লেখকের হৃদয়-রসে জারিত হইয়া এই তিনটি অনুচ্ছেদেই বেদনাভর অনুভূতির জলতরঙ্গ বেজে উঠেছে। এই মূলগত ঐক্য সত্ত্বেও তিনটি ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম শ্রুতির স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায়। প্রথম উদাহরণে দুষ্মন্ত কর্তৃক সন্তানসম্ভবা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের ভাবানুষঙ্গে সন্তান-হীনের খেদ অনুরণিত। দ্বিতীয় উদাহরণে অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনের ক্ষণে বিস্ময়, অনুতাপ ও আনন্দের বিচিত্র মিশ্র স্বাদ আছে। স্মরত প্রদীপের কাঞ্চন-শিখার লজ্জারক্তিম শিহরণ তৃতীয় উদাহরণে অভিব্যক্ত। সুতরাং অনুভূতির নিগূঢ় ছন্দে অনুচ্ছেদত্রয়ের বিভিন্ন রসপরিণাম। এর মূলে আছে বিদ্যাসাগরের পৃথক পৃথক বিষয়ের মানস-সান্নিধ্যে অনুভবের প্রাতিস্বিকতা এবং প্রত্যেক বিষয়ে গভীর আত্মলীনতা।

ধনমিত্রের প্রসঙ্গে দুষ্মন্তের অন্তঃস্পন্দন নানা মাপের বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মধ্যখানের ছোট্ট বাক্যটি যেন বেদনার কেন্দ্রবিন্দু ('সে ব্যক্তি নিঃসন্তান'); আর তারই চারপাশে দুঃখের আবর্ত ক্রম-দীর্ঘ রূপ নিতে নিতে আত্মশোচনার দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতম বাক্যবৃত্ত রচনা করেছে। 'নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়'—এ-বাক্যে শব্দসজ্জার চটক নেই নতুন শব্দ বানিয়ে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টির প্রয়াস নেই; অথচ এর আবেদন পাঠকের মনে চারিয়ে যায়। সার কথা, বিদ্যাসাগর তাঁর

বিষয়ভাবনায় সমাধিস্থ হতেন বলেই তাঁর সিদ্ধি ঘটতো এমন তর্কাতীত।

দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম দুটি বাক্য রুদ্ধশ্বাস ঝড়ের রূপক স্মরণ করিয়ে দেয়। বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে দেখে বিস্ময়াপন্ন দুষ্মন্তের আলোড়ন যেন উত্তুরে হাওয়ার বিপরীত দিগন্তপ্রসারী বিস্তার, আর দুষ্মন্ত-দর্শনে শকুন্তলার প্রতিক্রিয়া দখিনা হাওয়ার আদিগন্ত উত্তরায়ণ। তাই বাক্যগুলিরও অপরিহার্য দীর্ঘতা। তারপর পুত্রের প্রশ্নে শকুন্তলার বিক্ষিপ্ত মনের আকাশ থেকে শুরু হয়েছে ছোট বাক্যের বৃষ্টিফোঁটা। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, নায়ক-নায়িকার আবেগের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যাসাগর বাক্যধারা রচনা করেছেন। এ সিদ্ধি লেখকের বিষয়মগ্নতা থেকে উৎসারিত।

বিদ্যাসাগরের রসিকচিত্তের শিল্প-স্বাক্ষরে তৃতীয় উদাহরণটি উজ্জ্বল। শকুন্তলার উক্তি প্রথম দিকে অসম্পূর্ণ রেখেই তার লজ্জার ব্যঞ্জনাটুকু সম্পূর্ণ করে তুলেছেন লেখক। নায়িকার ব্রীড়াবনত কান্নাসুন্দর মুখখানি নিঃসন্দেহে পাঠকের মন টেনে নেয়। এখানে বিদ্যাসাগরের 'emotional attitude to his subject' শকুন্তলার অনুভবের মধ্যে একটা যৌবনবেদনারস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বহুবার 'বিদ্রোহী' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। প্রধানতঃ নারীচরিত্রের নবমূল্যায়ণের দুঃসাহসিকতার জন্যই শরৎচন্দ্রের উক্ত বিশেষণ অর্জন। বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম দেখালেন: জীবনে একবার পদস্খলন ঘটলেই কোনো নারীর সমগ্র জীবন ঘৃণিত হয়ে ওঠে না। শরৎচন্দ্রের গভীর সহানুভূতির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদি, অভয়া, কমল, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি চরিত্রগুলি আপন বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। সর্বস্তরের রমণীকুলের প্রতি অসাধারণ মমতায় যে অনুপম চরিত্রসৃষ্টি করেছিলেন—তার জন্যই তিনি তৎকালীন একশ্রেণীর সমাজকর্তাদের কাছে ধিকৃত হয়েছিলেন এবং স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীলদের কাছে পেয়েছিলেন 'বিদ্রোহী' আখ্যা। অপরিমেয় সহানুভূতিসত্ত্বেও শরৎচন্দ্র কখনও প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করেননি। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে একমাত্র ব্যতিক্রম অভয়া, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মর্তব্য: নরপশু স্বামীর সঙ্গে সর্বপ্রকার প্রয়াসসত্ত্বেও মিলনে ব্যর্থ হয়ে অভয়া বরমাল্য দিয়েছিল আপন দয়িতের কণ্ঠে—তাও বাংলাদেশে নয়, সুদূর বর্মায়। শরৎচন্দ্রের 'অভয়া' নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু বালিকাবয়সে বৈঁচিফুলের মালা দিয়ে বর হিসেবে বরণ করা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী কি সারাজীবনে একবারও দেহে-মনে স্বীকার করে নিয়েছিল শ্রীকান্তকে? বিধবা রমা ও তার বাল্যবন্ধু রমেশ—দুটি জীবন-নদীর সমান্তরাল স্রোতধারা কোনোদিন কি খুঁজে পেয়েছিল মিলনের সঙ্গম?—এই সঙ্গে স্মরণ করি শরৎচন্দ্রের জীবনকাল: ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, আর বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর একশো আঠারো বছর আগে। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যা সারাজীবন পারেননি তাঁর প্রবল সহাভূতিসত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবে তাই করেছিলেন

তাঁর শতাব্দীকাল পূর্বে। বিস্ময়কর কিছুই নয় যে—বিদ্যাসাগরও 'বিদ্রোহী' আখ্যায় ভূষিত হবেন, আর এই আখ্যা তাঁর বাইরের ভূষণ ছিল না— প্রতীত হয়েছিল দেহের অঙ্গ হিসেবে। 'করুণাসাগর' 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের তুলনায় লোকসমক্ষে বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন। তা হলেও তাঁর এই ব্যক্তিত্ব সেই যুগেই অনেকের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল, আপন জীবদ্দশাতেই পেয়েছেন 'বিদ্রোহী' আখ্যা : 'মহাত্মা বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজের সর্বপ্রধান বিদ্রোহী। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথম বিদ্রোহী, তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্রোহী-শব্দে উল্লেখযোগ্য।'

ইতস্ততঃ দুয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহীসত্তার প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে ব্রতী হলেন। তখন পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ভর্তি হতে পারত না। প্রিন্সিপাল হবার পরই ৯ই জুলাই থেকে বিদ্যাসাগর নিয়ম করে দিলেন—কায়স্থ ছাত্ররাও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারবে। সেকালের কঠোর ও গোঁড়া সমাজব্যবস্থার আলোকে বিদ্যাসাগরের এই কাজের বিচার করলেই তাঁর নির্ভীক সংস্কারহীনতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমানকালেও শিক্ষাবিদ্‌দের সশ্রদ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালে তিনি Council of Educationএর কাছে শিক্ষাসংস্কারের বিষয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই চিঠিতেই বিদ্রোহী শিক্ষাবিদ্ অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলেন :

That the Vendanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute.

এ সম্বন্ধে বরং একজন প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করি—

"অক্ষয় দত্তের প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া মানসিক জগতে বিপ্লব ও অরাজকতার যে সম্ভাবনা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন···বিদ্যাসাগরের 'বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্তদর্শন' উক্তি তাহার চেয়ে কম বৈপ্লবিক সম্ভাবনাস্থল নহে। তারপর এই উক্তির গুরুত্ব শতগুণ বাড়িয়া যায় যখন স্মরণ করি যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন দেশের সংস্কৃতচর্চার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ (অধ্যক্ষ), নিজে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের সন্তান, সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিতে 'বিদ্যাসাগর'। আজকার দিনে কয়জন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকাশ্য-ভাবে, লিখিত আকারে মন্তব্য করিতে পারেন যে, 'বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শন ভ্রান্ত'? বোধ করি কেহই পারেন না, যদিচ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, মনে মনে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ দুই দর্শনকে, অন্তত বেদান্তকে, 'ভ্রান্তদর্শন' মনে করিয়া থাকেন। এই উক্তিটির জন্যই পণ্ডিতসমাজের গোঁড়া অংশ এখনো বিদ্যাসাগরকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।···প্রকাশ্যে বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন ঘোষণা করাই দুঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিকতম কার্য। ঐ এক উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগসঞ্চিত সংস্কার ও অহম্মন্যতার মূলে আঘাত করিয়াছেন।" এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মানসিকতার আলোচনা করে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহীসত্তার রূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্রোহীসত্তার পরিপূর্ণ ও পরিণত প্রকাশ তাঁর বিধবা-বিবাহ প্রচলন-প্রচেষ্টার মধ্যে। অবশ্য এস্থলে একথা স্মর্তব্য যে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল বিবেক বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব—তিনিই শাস্ত্রের সমর্থনে এবং আইনের সাহায্যে একে বাস্তবে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। বিদ্যাসাগরের সমাজমানসকে প্রথম আলোড়িত করেছিল বাল্যবিবাহের কুফল। বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধীয় রচনায় বিধবার দুঃখময় ব্যর্থজীবন তাঁর হৃদয়কে ব্যথা-ভারাক্রান্ত

করে তুলেছে: "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগ-দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাসদিবসে পিপাসানিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না।"

অতি স্বাভাবিক, সর্বশাস্ত্র তোলপাড় করে একগুঁয়ে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের সমর্থনে যুক্তি সংগ্রহ করবেন, আর তারই ফলস্বরূপ যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছে—

(১) বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব: প্রথম পুস্তক, প্রকাশকাল—জানুয়ারি, ১৮৫৫।

(২) বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব: দ্বিতীয় পুস্তক, প্রকাশকাল অক্টোবর, ১৮৫৫।

শুধু শাস্ত্রের সমর্থন সংগ্রহ করে গ্রন্থরচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টা, তিনি অনুভব করেছিলেন—আইনের আনুগত্য না পেলে বিধবা-বিবাহ প্রচলন অসম্ভব হবে। তাই এ-সম্বন্ধে প্রায় এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদন-পত্র পাঠিয়েছেন ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে বাস করেই আমরা অনুমান করতে পারি উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে আলোড়ন কতটা উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রকার বাদ-বিসম্বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও অবশেষে বিধবা-বিবাহ আইনানুগ হ'ল, জয় হ'ল বিদ্যাসাগরের।

লোকের ধারণা ছিল—বিধবা-বিবাহ আইনানুগ হলেও বাস্তবে এটা সম্ভব হবে না। কিন্তু সেটাও অমূলক প্রমাণিত হ'ল। নথিপত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে—সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত

হ'ল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। পাত্র—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী—কালীমতী দেবী; স্থান—বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতা।

স্বভাবতই সেদিন শহর কলকাতা ভেঙে পড়েছিল বরকে দেখবার জন্য, বিদ্যাসাগর এসব অনুমান করে আগে থাকতেই পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

এ বিবাহের পরপর আরও কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'ল। বিধবা-বিবাহের বিরোধীদের মর্মপীড়া দুঃসহতর হয়ে উঠল। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি তাদের আক্রোশ হয়ে উঠল অশান্ত, হিংস্র, রাস্তায় বার হলে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করা হ'তো, কটূবাক্য, প্রহারের ভীতিপ্রদর্শনে তীব্র হয়ে উঠত, বস্তুত কয়েকবার চেষ্টাও হয়েছে প্রাণ-হননের, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র—

উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা—পারিজাত ঘ্রাণে।

সর্বোপরি, ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রকার প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, তিনি যে বিদ্রোহী। আপন সন্তানকে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অবশ্যকর্তব্য সম্বন্ধে সোচ্চার দেশ-প্রেমিকেরা আজকাল সুলভ। বিদ্যাসাগর ছিলেন বিপরীত মেরুর লোক। তাই তিনি শুধু অপরের সন্তানের বিধবা-বিবাহে উৎসাহী ছিলেন না—নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রেরও বিধবা-বিবাহে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন? তাঁরা কি বিধবা-বিবাহের পক্ষে?

"...আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ আমাকে বিশেষ অনুরোধ করায় মহাশয়কে লিখিতেছি।...ইহারা আমাকে বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরের (বিধবা) বিবাহ দিউন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই,

নারায়ণের বিধবা-বিবাহ দিলে আমরা আর তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারি এমত বোধ হয় না, কারণ তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিলে সমাজে রহিত হইব আর নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইবে, এই কারণেই নারায়ণের (বিধবা) বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি। এতাবৎকাল মহাশয়দের অনুগত ও আশ্রিত থাকিয়া অতঃপর আমাদের কি দশা ঘটিবে স্থানান্তরে যাইলে আমাদিগকে কেহ হুঁকো দিবে না ও উপহাস করিবেক··"

আত্মীয়-স্বজনের বিরূপ ও প্রতিকূল আচরণের সঙ্গে, এই স্থলে স্মরণ করি যে, ইতিমধ্যে বিধবা-বিবাহের সক্রিয় সমর্থন ও অনুষ্ঠানে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় সর্বস্বান্ত।

কিন্তু কোনো প্রতিকূলতা কি তাঁকে সঙ্কল্প থেকে প্রতিহত করতে পেরেছিল কোনোদিন?

বিধবা কনের নাম—ভবসুন্দরী। পিতা--খানাকুল-কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কালীচরণ ঘোষের গৃহে ১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ নারায়ণের শুভ বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হ'ল।

'অক্ষয় মনুষ্যত্ব' ও 'অজেয় পৌরুষ'-এর অধিকারী বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন এক অনন্য পুরুষ। তাঁর অসাধারণ আধুনিকতা, তাঁর সহানুভূতি, তাঁর কারুণ্যই তাঁকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল যার অন্যতম প্রকাশ বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তনের মধ্যে। বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের অন্যতম কীর্তি—তা শ্রেষ্ঠতম কর্মের স্বীকৃতি না-ও পেতে পারে: Vidyasagar will be remembered more for his charity, his educational work, his literary work, and his reforming spirit, than for the single legislative measure he succeeded in getting passed. —এ মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

তবু একথা মানতেই হবে যে, বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন বাংলাদেশের

(আংশিকভাবে তৎকালের ভারতবর্ষেরও) সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক প্রকাণ্ড পরিবর্তন, নবযুগদিশারী একটি আলোকস্তম্ভ। এই একটি ঘটনার মাধ্যমেই, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহীরূপ প্রোজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত।

"অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ শুধু বিধিবদ্ধ হইয়া আছে, কার্যতঃ হিন্দুসমাজ এই সংস্কারের সঙ্গে কোনোরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। বিধবা-বিবাহ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে" বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর এক যুগ পরে তখনকার একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকার এই উক্তি এখনও অনেকাংশে প্রযোজ্য। এবং এর মধ্যেই যুগপ্রবর্তক, বিদ্রোহী বিদ্যাসাগরের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মনীষী ব্যক্তির আত্মজীবনী নানা কারণে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। জীবনের এমন আত্মনিষ্ঠ চিত্র-বিচিত্রের ছবিঘর আর কোথাও তেমন সহজলভ্য নয়। বহুমুখী জীবন, ভিন্ন ভিন্ন জগতের নানা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা, সমাজ ও পরিবারের অনেক উত্থান-পতনের হাসি-কান্না, বৈচিত্র্যপূর্ণ মানসগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে যখন লেখক নিজের জীবন আমাদের সামনে মেলে ধরেন তখন যুগপৎ লেখক ও পাঠক-মনে জন্ম নেয় তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসের এক বিচিত্র খেলাঘর। বিশেষত, সাহিত্যসৃষ্টির মৌল উপাদানের অন্বেষায় শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবন-স্মৃতিকথায় এ কৌতূহল স্বভাবতই দ্বিগুণ।

এ জাতীয় রচনার সামাজিক মূল্য তথা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। সাহিত্যিক মূল্যও যে তার কম নয়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় তার অন্তর্ভুক্তি দেখেই তা অনুমান করা চলে। কিন্তু আজও তাকে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র শাখার আলোয় এবং মর্যাদায় বিচার করা হয়নি। অবশ্য তা হয়নি, কারণ, বাংলা গদ্যের ইতিহাসই অর্বাচীন। যেহেতু আলোচ্য স্মৃতি-সাহিত্য (আত্মজীবনী/Autobiographical Studies) গদ্যসাহিত্যেরই পুষ্টি সাধন করেছে, সেহেতু গদ্যের ভূমি প্রস্তুত হবার পরবর্তীকালেই তার যাত্রারম্ভ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্মৃতি-সাহিত্যের এই ধারা বিশেষ একটি রূপ লাভ করতে থাকে। তার অব্যবহিত পূর্ব শতককে যদি এই ধারার (কাব্যে) বাল্যাবস্থা বলা চলে, তবে তারও পূর্ব-পূর্ববর্তী কালকে (চর্যাপদ থেকে যার সূচনা) ভ্রূণাবস্থা বলতে পারি। কবির আপন জীবন-স্মৃতি চারণার উপযুক্ত ক্ষেত্র কাব্য নয়, একথা মেনে নিয়েও বলা চলে তাঁরা নিছক আত্মপরিচিতি দানে সচেতনভাবেই বিরত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসাধনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, শিল্পী ভাবুকের ঐহিক আত্মপ্রকাশে অনীহা বড় প্রকট। প্রাচীন ও মধ্যযুগের (অংশ বিশেষে) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তো এই আক্ষেপ ঐতিহাসিক। ইতিহাসকারেরা এই আত্মগুপ্তির পরিণাম ভোগ করেছেন অশেষবিধ অতিরিক্ত শ্রমস্বীকারে। এ প্রসঙ্গে 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' বা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম' প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর হবে।

সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার বেঁচে থাকার বাসনা। সে বাসনা যুগ যুগ ধরে চরিতার্থও হয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে আপন বংশপরিচয় বা নাম-মাহাত্ম্যের বাসনা আদৌ প্রকট ছিল না। কেবল নামটুকু উল্লেখের প্রয়াস (তাও ক্ষেত্রবিশেষে ছদ্মনাম ব্যবহৃত) অর্থাৎ ভণিতাসূত্রে আমরা চর্যাপদ থেকেই দেখি। সে পথপরিক্রমা বৈষ্ণবপদ পেরিয়ে শাক্তপদে এসে ঠেকেছে। বলা চলে, সংক্ষিপ্ত ভণিতা রচনার পর্ব এখানেই পরিসমাপ্ত। তবু সূত্রাকারে হলেও তার মুখচ্ছবিটুকু লক্ষ্য করেছি সাহিত্যের সেই অস্পষ্ট আলোকে। তা সম্ভব হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের উষাকালেই। কিন্তু সেই অবগুণ্ঠনটুকু খুলতেই আরও পাঁচ শ' বছর লেগেছিল।

সচেতনভাবে কবির আত্মপরিচয় দানের প্রয়াস পনরো শতক থেকে লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যে তথাকথিত ভণিতা-পর্বের পূর্ণ ছেদ টেনে দিয়ে কবি কৃত্তিবাস ওঝাই সম্ভবত প্রথম ভাবীকালের জন্য স্মৃতি-সাহিত্যের একটা ভূমিকা প্রস্তুত করে গেছেন। মনে হয় আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির সৃজ্যমানতার যুগে এই মানসিকতা বাঙালী কবির নিজস্ব জীবন-রস-রসিকতারই পরিচায়ক। তারই পরিবর্ধিত রূপাবয়ব দেখি পূর্ণায়ত মঙ্গলকাব্যে। মঙ্গলকাব্যের রূপকার যে-ভাবে প্রতিবেশ ও ইতিহাস-সচেতন হয়ে আত্মজীবনের খুঁটিনাটি বাস্তব বর্ণনা করেছেন, আমরা তাকেই পরবর্তীকালের স্মৃতি-সাহিত্যের প্রাথমিক রূপকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তথাপি

এ সাহিত্যের স্বনিষ্ঠ পূর্ণাবয়ব (গদ্যে) পেতে আমাদের আরও একাধিক শতক অপেক্ষা করতে হয়েছে।

॥ ২ ॥ স্মৃতি-সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণাদি বুঝে নেবার আগে তার গদ্যরীতি বিচার করা চলে। স্মৃতিকথা এতাবৎ প্রবন্ধরূপেই গণ্য হয়ে এসেছে। কাজেই সংক্ষেপে প্রবন্ধের স্বরূপটুকু দেখে নিতে চাই।

এক গবেষণা-গ্রন্থে ডঃ অধীর দে প্রবন্ধের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রবন্ধের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখক যখন কোনো ভাব বা বিষয় যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানতঃ সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গি নিয়মিত করেন, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।' অর্থাৎ এই সংজ্ঞার নির্গলিতার্থ হচ্ছে, শৃংখলিত যুক্তি-চিন্তা-ভাবনিষ্ঠ সরস গদ্য-রচনাই প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটি ইংরেজী Essay অভিধায় বিধৃত এবং Essay-সূত্রের অপরিহার্য পরিণামে প্রবন্ধেরও দুটি ভাগ। প্রথমটি, Formal বা Objective Essay অর্থাৎ তত্ত্ব ও তথ্যে পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যেই তার অধিষ্ঠান। মস্তিষ্কের কাছেই যার প্রধান আবেদন। দ্বিতীয়টি, Informal বা Subjective Essay অর্থাৎ আত্মভাবমুখর বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। হৃদয়রাজ্যেই তার প্রধান বিচরণক্ষেত্র।

কাজেই স্মৃতি-সাহিত্য Objective Essay নয়; Subjective Essay-এর সঙ্গেই তার নিকটতম সম্পর্ক। কিন্তু হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে বা আত্মকথনরীতির প্রাবল্যে Subjective Essay-এর অনেক সময়েই রম্যোপন্যাসে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রম্যোপন্যাস রূপেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দপ্তরের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক

মোহিতলাল মজুমদারও বলেছেন, 'উহা একটি সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যিক রচনা-রূপ ; উহাতে গল্প, কাব্য, আত্মচিন্তা, সমাজ-দর্শন, সমালোচনা - একাধারে সকল উপাদান একই ভাবমণ্ডলের মধ্যে অপূর্ব কৌশলে সমাবিষ্ট হইয়াছে, একটা গোটা মানুষের হৃদয় ও মনের সবগুলি মুখ (faces) চারিদিক ঘুরাইয়া দেখানো হইয়াছে। আমরা যে প্রবন্ধের কথা বলিতেছি তাহা উহার একটা লক্ষণ মাত্র, সেই জাতীয় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট গুণ উহাতেও আছে ; কিন্তু তথাপি গল্পের ঐ আবরণটির জন্য ব্যক্তিটা আড়ালে রহিয়াছে, এবং উহার নিজস্ব গঠন বা রূপ নিজের নিয়মে সার্থক হইলেও, উহাকে প্রবন্ধ বলা যাইবে না।' সুতরাং সঙ্গত-কারণেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারিঃ একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণা না হয়েও যদি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মতো রচনা প্রকৃত রূপে প্রবন্ধ পদবাচ্য না হয়ে থাকে, তবে স্মৃতি-সাহিত্য আদৌ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ এতে কেবল 'একটা গোটা মানুষের হৃদয় ও মনের সবগুলি মুখ'ই প্রদর্শিত হয় না, সেই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিজীবনের পটে পারিবারিক ও সামাজিক-সম্পর্কিত একাধিক আত্মীয়-পরিজনের জীবনবাসনাজাত নানা রঙের হৃদয় ও মনের প্রতিচ্ছবি। কাজেই স্মৃতি-সাহিত্যকে 'একটি সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যিক রচনা-রূপ'ই বলতে হয়।

এই বিস্তৃত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' পর্যালোচনা করতে চাই।

॥ ৩ ॥ বিদ্যাসাগরের জীবনে যখন স্মৃতি-কথা রচনার বাসনা জেগেছিল, তখন তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তেমন রচনার অনুকূলে ছিল না। দেহ তখন ভেঙে পড়ছিল এবং ততোধিক জর্জরিত হচ্ছিলেন উপকৃতের কৃতঘ্ন-বাণে। জনসমক্ষে অতীত জীবনের পাতা মেলে ধরার জন্য যে মানসিক স্থৈর্য ও প্রশান্তির প্রয়োজন, বাহ্যত তখন তাঁর তা থাকার কথা নয়। সেই জন্যই সম্ভবত তিনি তাঁর আত্মচরিত সম্পূর্ণ করে যেতে

পারেননি। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন এক দুর্লভ মানসিকতার অধিকারী। তার পরিচয়মাত্র দু'টি পরিচ্ছেদেই বিধৃত।

বিদ্যাসাগরের তিরোধানের (জুলাই, ১৮৯১) পর তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই দুই পরিচ্ছেদবিশিষ্ট অসম্পূর্ণ রচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' নামে (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) প্রকাশ করেন। যে কোনো সহৃদয় পাঠকের মনেই এই অসম্পূর্ণ আত্মকাহিনীর জন্য গভীর আক্ষেপ সঞ্চারিত হবে। কারণ, এর ভাষা-নির্মিতি, সরস বর্ণন-কৌশল, প্রসন্ন কৌতুক বিদ্যাসাগরের পরিণত রচনার অনবদ্য নিদর্শন। এটি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করলে আমাদের একাধিক কৌতূহল ও তৃষ্ণা নিবারিত হ'তো, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। যৌবনের ধ্যান ও ধারণা, ছাত্রাবস্থার সুদীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ হলে আত্মকথা একটি মূল্যবান দলিলে পর্যবসিত হতে পারতো। তাঁর আপন সত্তার গভীরে প্রতিটি স্মরণীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও স্বকীয় ব্যাখ্যা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তেমনি বঞ্চিত হয়েছি তাঁর আপন জবানী থেকে : তিনি নাস্তিক ছিলেন বা কতখানি ঈশ্বরবাদী ছিলেন, কেনই বা তৎকালীন কোনো কোনো পণ্ডিতমহলে তিনি খ্রীষ্টান বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। আর একটি জিজ্ঞাসাও থেকে যায়। হিন্দু কলেজের এত নিকটে থেকে 'ইয়ংবেঙ্গলের' উত্তালতরঙ্গ তাঁকে কতটা স্পর্শ করেছিল। সেই আন্দোলনের অনেক মুখ্য-চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েও তিনি নীরব ছিলেন কেন। অথবা তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াই বা কেমন হয়েছিল। এমন অনেক প্রশ্নই তাঁর জবানীতে সমাধান হতে পারতো। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় ('বিজ্ঞাপনে') তাই যথার্থ উল্লেখ করেছেন, 'যদি তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবনচরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হইত।' অনুরূপ আক্ষেপ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে, 'আত্মচরিতখানি সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরের সমকালীন

বাংলাদেশের মনঃপ্রকৃতি ও চারিত্রমূর্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যেত, তেমনই বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবনের অনেক রহস্য দূর হতে পারত।'

কিন্তু তবুও তাঁর আত্মচরিতের যতটুকু অংশ আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলেও একাধিক কারণে বিস্মিত হতে হয়। প্রথমেই লক্ষ্যপথে পড়বে তাঁর স্বচ্ছন্দ গতিভাষা। অসাধারণ চরিত্র-চিত্রণ-ক্ষমতার প্রতিও নীরব থাকা সম্ভবপর হবে না। অবাক হতে হবে পিতৃ-মাতৃকুল পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাঁর নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী দেখে। বালক বয়েসে কোন কোন চরিত্র তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উনিশ-শতকী নগরকেন্দ্রিক নবজাগরণের পটে গ্রামবাংলার প্রকৃত চিত্র কিরূপ ছিল। নিঃসীম দারিদ্র্য, আত্মকলহ, কুসংস্কার প্রভৃতি গ্রামীন সভ্যতাকে কেমন গ্রাস করে ফেলছিল। সর্বোপরি এতে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং প্রসন্ন কৌতুকরস আমাদের মুগ্ধ করবে।

॥ ৪ ॥ আত্মচরিতের ভাষা বিদ্যাসাগরের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় কিছু স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। ভাষা এখানে অনেক সহজ ও সাবলীল হয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের (তৎসম, তদ্ভব, দেশ, বিদেশী প্রভৃতির) অকুণ্ঠ ব্যবহারও লক্ষণীয়।—পূর্বাপেক্ষা ভাষা, পরিণামে অনেক স্বচ্ছন্দগতি লাভ করেছে। উপরন্তু কথ্যরীতির ঢঙ্ অনেক স্থলেই পরিস্ফুট। প্রসঙ্গত, একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। বাংলা গদ্যভাষায় 'বিদ্যাসাগরী রীতি' বলে একটি ভাষা-মতবাদ বহুল প্রচলিত। সম্ভবত এই মতবাদের পশ্চাতে ভাষার সর্বত্রগামিতা ও স্থিতিস্থাপকতার অভাবই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুণ্ঠিত অলঙ্কার-বহুল জবুথবু ভাষাই 'বিদ্যাসাগরী-রীতি'র দোষ বলে গণ্য করা হয়। আমরা এই মতবাদের সমর্থক নই। তবু নির্দ্বিধায় বলা চলে আত্মচরিতের ভাষা তথাকথিত সে-দোষেও দুষ্ট নয়। প্রসঙ্গতঃ, দীর্ঘ হলেও, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর উক্তি স্মর্তব্য, 'এই রচনাটি (আত্মচরিত) উদ্ধার করিবার কারণ, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত আর ইহাতে তাঁহার এমন একটি রীতির পরিচয় পাওয়া যায় যাহা "বিদ্যাসাগরী রীতি" হইতে স্বতন্ত্র। "বিদ্যাসাগরী রীতি" লইয়া

কিছু ভুল বোঝাবুঝি চলিয়া আসিতেছে। এই ভুলের উৎপত্তি তাঁহার সমকালে, আর এই রীতিকে যাঁহারা ভুল বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন। দুরূহ ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে গঠিত জবুথবু বাক্যকে যেন তাঁহারা বিদ্যাসাগরী রীতি মনে করেন। এর চেয়ে ভুল আর কিছু হইতেই পারে না। প্রসাদগুণে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ লেখক কয়জন? "সীতার বনবাস" গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ কিছু বেশি—কিন্তু সে বস্তুমাহাত্ম্যে। তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ মিশাইতে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ কয়জন? প্রমাণ তাঁহার রচিত বিতর্ক পুস্তিকাগুলি। আর প্রধানতঃ তদ্ভব ও দেশী শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনার সৃষ্টি করিতেও যে তিনি সমান দক্ষ তাহার প্রমাণ আত্মচরিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "বিদ্যাসাগরী রীতি" নামে একটি ভাষারীতি আছে, বা বলা উচিত এক সময় ছিল—এই রীতির প্রধান লক্ষণ দুরূহ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। এখন, এই রীতি আর যাহার রচনাতেই পাওয়া যাক, বিদ্যাসাগরের রচনায় কখনো পাওয়া যাইবে না। উহা কেন যে তাঁহার নামে চলিল জানি না। বিদ্যাসাগরের ভাষা ও স্টাইল বিষয়ানুগ, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, মার্জিত ও সুললিত। সর্বোপরি তাঁহার ভাষারীতি একটি নয়, অন্ততঃ তিনটি। সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি এক রীতিতে লিখিত; বিতর্ক-পুস্তকাগুলি অন্য রীতিতে লিখিত; আর আত্মচরিত তৃতীয় রীতির অন্তর্গত।' এই সিদ্ধান্ত আমাদের যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়েছে। আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্ববাদীসম্মত কর্মযোগী পুরুষ। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মের আভ্যন্তরীণ তাগিদেই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু আত্মচরিতে তাঁর লেখনীর প্রেরণা ছিল স্বতন্ত্র। বলাবাহুল্য, সে প্রেরণা সাহিত্যের চিরাচরিত অপ্রয়োজনের। তাই তার স্বাদ ও রীতিপ্রকরণ স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের স্বকীয়তা এখানে তাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে।

আত্মচরিতের ভাষাদেহ-নির্মিতিতে ও শব্দ-প্রয়োগে তিনি যথার্থ

সংস্কারমুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাক্যগঠন ও পদবিন্যাসে কথ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অকুণ্ঠ-ব্যবহার সহজেই চোখে পড়ে। অনভিজাত শব্দ প্রয়োগেও কোন কুণ্ঠা লক্ষ্য করা যায় না। অবলীলাক্রমে যেমন 'মাইল স্টোন', 'সাহেবদিগের হৌস', 'কালেজ', 'ল কমিটি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে 'এঁড়ে বাছুর', 'পোতা', 'টাটানি', 'ফেসাতে', 'থাবড়া', 'বাটনাবাটা' ইত্যাদি। ভাষা এখানে উপযুক্তভাবেই ভাব ও বিষয়ের অনুগামিনী হয়েছে।

॥ ৫ ॥ আত্মচরিতে দু'টি মাত্র পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগরের পিতৃ-মাতৃকুলের বিস্তৃত পরিচয় বিধৃত। জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলের বাসভূমি ছিল না, ছিল পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের শ্বশুরালয়—এ বিবরণ যেমন আছে তেমনি আছে পৈত্রিকভূমি বনমালি-পুর এবং মাতুলালয় পাতুল গ্রামের পরিচয়। পিতা ঠাকুরদাসের কলিকাতায় দারিদ্রের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠার কাহিনীর সঙ্গে তাঁর (বিদ্যাসাগরের) জন্ম থেকে পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বকাল পর্যন্ত এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

পাঁচ বছর থেকে আট বছর আট মাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উপজীব্য। এর মধ্যে পিতামহ রামজয়ের মৃত্যু। বিদ্যাসাগরের কলকাতা আগমন, পথি-মধ্যে ইংরেজী রাশিগণনা শিক্ষা, বড়বাজারে ভগবতী সিংহের কন্যা রাই-মণির স্নেহাশ্রয় লাভ। সংস্কৃত কলেজে ভর্তির আয়োজন-সংবাদ প্রভৃতি এই পরিচ্ছেদে প্রাধান্য লাভ করেছে।

আত্মচরিতের চরিত্রচিত্রণ-পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বল্প রেখার টানে চরিত্র কেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে এ কৌশলও বিদ্যা-সাগরের অনায়ত্ত ছিল না। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতামহ রামকান্ত তর্কবাগীশ, মাতৃদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি চরিত্রই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন একদিকে যেমন চারিত্রিক দার্ঢ্যে শাণিত

অলোয়ার তেমনি ছিলেন কৌতুকপ্রিয় প্রসন্নচিত্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাসাগর সম্ভবত এই গুণটি পিতামহের নিকট হতেই পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের জন্ম-সংবাদটি রামজয় পুত্র ঠাকুরদাসের নিকট পরিবেশন করেছেন নিতান্তই কৌতুকচ্ছলে। তিনি বলেছেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।' ঠাকুরদাস কিন্তু প্রথমে বিষয়টির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। তাই তিনি গোয়ালঘরের দিকেই চলেছিলেন। 'তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন "ওদিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।' এই মন্তব্যের তাৎপর্য বিদ্যাসাগর নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। পরিহাসচ্ছলে মন্তব্যটি উক্ত হলেও বিদ্যাসাগরের ক্রমাগত একগুঁয়েমি লক্ষ্য করে পিতা ঠাকুরদাসও বলেছেন, 'বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।' আমাদের পুলকিত করে যখন দেখি বিদ্যাসাগর এতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে নিজের প্রতিও পরিহাসকুশল হয়ে ওঠেন—'জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।'

তর্কভূষণ মহাশয় নানা কারণেই তাঁর শ্বশুরালয় বীরসিংহ গ্রামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। আত্মকলহ, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি হীন আচরণ সে গ্রামের প্রধানদের মধ্যে প্রকট ছিল। তাই তিনি সুযোগ পেলেই সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলে বেড়াতেন, 'এ-গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু।' এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বর্ণনা রামজয় তর্কভূষণের চরিত্রের একটি দিক উন্মোচন করে। নির্মম স্পষ্টবাদিতায় ও শাণিত ব্যঙ্গে চরিত্রটি লৌহ-কঠিন হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'একদিন, তিনি (রামজয়) একস্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঐ স্থানে লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্লের একব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ

মহাশয় ও স্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইতেছি না ; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।'

রামজয় কেবল দুর্জয় মনোবলের অধিকারীই ছিলেন না ; তাঁর বাহুবলের পরিচয়ও উল্লেখ্য। সে পরিচয়ও বিদ্যাসাগর দিয়েছেন, 'একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। একস্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুক আক্রমণ করিল। ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন! ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।'

মাতামহ রামকান্ত তর্কবাগীশের চরিত্র বিদ্যাসাগর বিস্তারিত করেন নি। কিন্তু একটি তুলির টানে চরিত্রটির করুণ পরিণতি ফুটিয়ে তুলেছেন। নির্বিকল্প মানসিকতা না থাকলে এমন চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। রামকান্ত নিজের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হেতু তিনি টোল তুলে দিয়ে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হন। বিষয়টি বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলি, 'তর্কবাগীশ (রামকান্ত) মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই শব-সাধনের ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে, তিনি, তুড়ি দিয়া "মঞ্জুর" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে, উন্মাদগ্রস্ত হইলেন।' নিঃসন্দেহে পরিণতিটি বড়ই করুণ ; কিন্তু বর্ণনভঙ্গিটি লক্ষণীয়।

মাতা ভগবতীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের চরিত্র উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হয়েছে। রাধামোহন যে নিপুণ হস্তে একান্নবর্তী পরিবার

সমদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন এবং পরিবারের সকল সুখের মূলে ছিল তাঁরই কৃতিত্ব, একথা বিদ্যাসাগর বেশ গুরুত্ব দিয়েই বিবৃত করেছেন। তাঁর আপন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব দেখেছিলেন বলেই হয়তো তিনি বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবার কেন ভেঙে পড়ে এবং ঐ পরিবারের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে রাধামোহনের কৃতিত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাই বলেছেন, 'তাঁহার (রাধামোহন) কর্ত্তৃত্বকালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের, অধিকদিন পরস্পর সদ্ভাব থাকে না ; যিনি সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকা, কোনও মতে ঘটিয়া উঠে না। এজন্য, অল্পদিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে ; অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া, পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি জনেই (রাধামোহন-সহ চার ভ্রাতা) সমান ছিলেন ; এজন্য, কেহ, কখনও, ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্র-কন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।' এহেন রাধামোহনকে 'প্রাতঃস্মরণীয়' বলে বিদ্যাসাগর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাবেন তাতে আর বিচিত্র কি। কারণ তাঁর নিজের চরিত্রের মধ্যেই তো ঐ উপাদানগুলি তিনি দেখতে চেয়েছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাসের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে ভিন্ন পটভূমিতে। সামান্যতম

প্রতিষ্ঠার তাগিদে নিদারুণ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামরত একটি নিষ্ঠাবান মানুষ—কলকাতার পথে ঘাটে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা—দেশের বাড়ির আত্মজনের সুখবিধানে কি নিষ্ঠুর আত্মপীড়ন —সততা, কঠোর শ্রম ও সাধনার দ্বারা মাসিক দু'টাকা থেকে দশ টাকা বেতন লাভ পুত্র বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের আন্তরিক প্রয়াস ইত্যাদির মধ্যেই চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। লক্ষ্য করা যাবে, এ চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর আঙ্গিক ভিন্ন।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা আজ কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হয়েছে; কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে মাতা ভগবতীদেবীর চিত্রটি বিশেষ ফুটে ওঠার অবকাশ পায় নি। তবে স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের অন্তরে যে ঐতিহাসিক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জাগরূক ছিল, তাঁর সেই মানসগঠনের উপাদানস্বরূপ আমরা এখানে দু'টি চিত্র পাই। এ দু'টি চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। একটি রাইমণির চরিত্র-চিত্র, অপরটি ঠনঠনের মুড়িমুড়কি বিক্রেত্রী এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারীর।

ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে পিতা ঠাকুরদাস পথে ঘুরতে ঘুরতে ঠনঠনের কাছে এসে কি ভাবে এই বিধবা নারীর সস্নেহ সহানুভূতি লাভ করলেন এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করলেন তার জীবন্ত বিবরণ দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। শুধু তাই নয়, মহিলাটি এমনও আশ্বাস দিয়েছেন যখনই ঠাকুরদাসের তেমন অনাহারের আশঙ্কা দেখা দেবে তখনই যেন তিনি অতি অবশ্যই 'এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।' সে কথার উল্লেখশেষে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, 'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনিই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।'

বিদ্যাসাগর কলিকাতায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এসে বড়বাজারের ভগবতী সিংহের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। রাইমণি সেই

ভগবতী সিংহের কন্যা। রাইমণির স্নেহ-যত্নে তিনি কেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই দয়াময়ীর ব্যবহার তাঁর জীবনে কতখানি রেখাপাত করেছিল তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি, 'ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'

কলিকাতায় আগমন-পথে মাইলষ্টোন দেখে বিদ্যাসাগরের ইংরেজী রাশিজ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়ার প্রিয় কাহিনী আজ বাংলার আবালবৃদ্ধ-বণিতার একান্ত পরিচিত। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তাঁর যে অসীম আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠেছে সেটি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। নিতান্ত বালকবয়েসেই আপন বিচার বুদ্ধির ওপর গভীর আস্থা ক্ষণজন্মা পুরুষেরই লক্ষণ। বিবরণটি সংক্ষেপে এই: কলকাতার দূরত্বক্রমেই কমে আসছিল। বিদ্যাসাগরের ইংরেজী রাশিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে কি না পরীক্ষা করার জন্য ঠাকুরদাস কৌশলে ছ'নম্বর মাইলস্টোনটি দেখতে দেন নি, আড়াল করে রেখেছিলেন। 'অনন্তর, পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন মাইলস্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইলস্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে, এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।' বালকের একবারও মনে হ'লো না, নিজের ভুল হতে পারে। বিদ্যাসাগরের

অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের কাহিনী আজ ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। বাল্যকালের এই ঘটনা তার সূচনা মাত্র।

আত্মচরিতে গ্রামবাংলার নিঃসীম দৈন্য-দারিদ্র, স্বার্থপরতা, আত্মকলহ প্রভৃতির বিবরণ আছে; কিন্তু নেই তার সৌন্দর্যের বর্ণনা। জন্মভূমির প্রতি মানুষের একটা সহজাত দুর্বলতাও থাকে, তেমন দুর্বলতাও প্রকাশিত হয় নি। তাঁর শকুন্তলায় বা সীতার বনবাসে যে অসাধারণ প্রকৃতিবর্ণনা বা নিসর্গচিত্র আছে এখানে সে কলম একেবারেই বিমুখ।

॥ ৬ ॥ কালানুক্রমিক বিচারে বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত স্মৃতি-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশের গৌরব অর্জন করে নি। তিনি সাহিত্যের এই অভিযাত্রায় সম্ভবত তৃতীয় পদাতিক। রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' (১৮৬৮) প্রকাশের পর কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়।

কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ'-এ আত্মকথনের মাধ্যমে জীবনতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষ কেশবচন্দ্র কেমন করে সাধক কেশবচন্দ্রে রূপান্তরিত হলেন তার বিবরণ আছে। জীবনবেদের ভাষা প্রাঞ্জল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ভাষা তাঁর লেখনীপ্রসূত নয়। তাঁর বক্তৃতাবলী শিষ্যগণ কর্তৃক অনুলিখিত। কাজেই অনুলিখিত রচনা মৌলিক রচনার প্রসাদগুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

অপরপক্ষে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' সাহিত্যিক রচনা হয়ে উঠতে পারে নি। ভাবের অনুগামিনী ভাষা সেখানে সহজ ও প্রাঞ্জল হলেও সাহিত্যিক সৌকর্য ও লালিত্যের অভাব তাতে বিদ্যমান। তাঁর কৃতিত্ব, প্রথম মহিলা হিসেবে ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্রের মাধ্যমে তিনি উনিশ শতকের নারী জাগৃতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী প্রচার করেছেন।

তাই 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' প্রথম সাহিত্যিক রচনারূপে চিহ্নিত হতে পারে। স্মৃতি-সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এ

কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবিও রাখে। তাঁর আত্মচরিতের সর্বত্রই একটি কৌতুক সরস নির্মল প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধ ভাবমাধুর্য বর্তমান—নানা উদ্ধৃতির মধ্যেই তা আমরা লক্ষ্য করেছি।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। আত্মচরিতে বিদ্যাসাগর ভাষা-দেহে যে কথ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সেই রীতি ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' (১৯০৫)-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-তে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই ফল-শ্রুতিটুকু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্মরণ করি—

ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরু তল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে॥

ধর্ম জীবনের ধারক ও বাহক। বাস্তব জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করে চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব সমাস। এই জীবনের প্রতিশব্দ তাই সংগ্রাম। যে দেহ জীবনকে পালন করে তার আছে মস্তিষ্ক, আছে হৃদয়। মস্তিষ্ক বুদ্ধি পরিচালনা করে—হৃদয় বিশ্বাসে অন্ধ—যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধির হাতিয়ারে অনেক তর্ক চালাতে পারে কিন্তু তবু বিশ্বাস বিসর্জনীয় নয়। বিশ্বাসকে আঁকড়েই যুক্তির বিকাশ। আবার শুধু তাই বা কেন? জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা কুলায় না। কারণ মানুষের অবস্থান বিচিত্র বিপরীত স্রোতের ঘূর্ণিতে। আপেক্ষিকতার প্রাধান্যে যুক্তি পথ হারায়। তখন বিশ্বাসই জীবনের একমাত্র আশ্রয় হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের একান্ত যোগ। বিশ্বাসই ধর্ম, বা ধর্মই বিশ্বাস।

মোটামুটি বলা চলে অনন্তকালের প্রবাহে ব্যক্তি-জীবন একটি ক্ষণিকের পরিচয়। তাই অব্যক্তের পরিধিতে জীবন বিশ্বাস ছাড়া বেতালা হতে বাধ্য। কোথায় ছিলাম? কোথায় যাব? উত্তর কি হবে? কি করবো? কে নির্ধারণ করে দেবে?—একমাত্র ধর্মবোধই এই সীমা ও ভূমার সূত্র দুটির সমন্বয়ের পথে তর্জনী নির্দেশ করতে পারে—আর কেউ না। স্বর্গ, নরক, ইহকাল, পরকাল, গত জন্ম, পর জন্ম—যত পথ মতও তত প্রকার। কিন্তু সব মতের সার মর্ম—সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর। যুগে যুগে ধর্মকে নানা ভাবে সংস্থাপন করতে এসে ও অধর্মের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে গিয়ে যুগ-পুরুষরা এই সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের কথাই পরিবেশ-মত প্রকারান্তরে প্রচার করে গেছেন।

ভারতবর্ষ 'হিন্দু' দেশ। এ 'হিন্দু' কোন সম্প্রদায়-বিশেষ নয়। এ হিন্দু একটি বিশেষ বোধের চেতনা। সেই চেতনাই মহান মিলনের

সঙ্গম-তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে একজায়গায় বলেছেন, "ভারতের মুসলমান হিন্দু-মুসলমান"। এই উক্তিটি 'হিন্দু' শব্দের প্রতিক্রিয়াটি বড় স্পষ্ট করে দেয়। ভারতবর্ষ ধর্ম-বিষয়ে' চিরদিনই উদার। আধুনিক ধর্মবোধে ব্যক্তি-সত্তার (Individual) প্রাধান্য স্বীকৃত। তাই এর নামকরণ হয়েছে 'মানব ধর্ম'। কিন্তু এই মানব ধর্মের কেন্দ্র-বিন্দুতেও রয়েছে সেই চিরাগত সত্যবোধ এবং তার মঙ্গল-সুন্দরে প্রতিষ্ঠা। ধর্মে এই ব্যক্তি-মানুষের আত্মনিষ্ঠার অনুপ্রবেশের ইতিহাসটি কিন্তু এদেশে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ অতিক্রম করে তবে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাংলায় তথা ভারতে জৈন, বৌদ্ধ, নাথপন্থ, যোগীদের মত ও বৈদিক ধর্ম ইত্যাদি নানা মতবাদের প্রচার একে একে এদেশের বাতাসে সাধনার আকাশকে নানা ভাবে উদারতায় আচ্ছন্ন করেছে। বর্তমান যুগেও বিচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্মের পাশাপাশি আর্যসমাজের অনুষ্ঠান-নিষ্ঠা কিছুমাত্র অশোভন হয় নি। পরমহংস রামকৃষ্ণের উদার সন্ন্যাসধর্ম সারা ভারতের হৃদয় জয় করেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—ধর্ম জীবনের কোন্ সমস্যার সামঞ্জস্য করে ? তার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় কাজ নেই—তবে লোকজীবনানুগ করে বলতে গেলে বলতে হয় যে—জীবন-সংগ্রামের ঐহিক একমাত্র পুরস্কার যে আত্যন্তিক দুঃখবোধ, পার্থিব যন্ত্রণা, সেই তাকে জ্ঞানের বেদনায় প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্মবোধের ফলশ্রুতি। ধর্মবোধটির সক্রিয় অনুশীলন তাই জীবনে সৎকর্মে, যার পটভূমিটি সৎচিন্তা। উৎস থেকে এই জীবন-প্রবাহ আত্মজ্ঞানে গিয়ে পরিণামের পূর্ণতা স্পর্শ করে। মধ্যে থাকে ভাবভাবনার বাঁধনে কর্মস্রোত। ভাবভাবনার উজান ঠেলে কর্ম যতদূর পর্যন্ত নিষ্কাম হতে পারবে পার্থিব মন ততখানি প্রশান্তি মগ্ন হতে পারবে। তার বেশী নয়।

হাজার হাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় ধর্ম তার চলার পথে বারে বারে কুসংস্কারের ক্লেদে গ্লানিময় হয়ে উঠেছে। আর মাঝে মধ্যেই তাকে স্বচ্ছ করেছেন যুগপুরুষগণ যুগে যুগে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংক্ষিপ্ত

পরিসরে বাংলার ধর্মযুদ্ধটি বড় আশ্চর্য পথে আধুনিক মতবাদের মর্ম স্পর্শ করেছে। নবজাগরণের ঢেউ বাংলা সংস্কৃতিতে গত শতকে বহু জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। রাষ্ট্রশাসনে তখন পালা বদলের কাল। বিদায়ী মুসলমান মসনদের ক্ষয়িষ্ণুতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের দুর্বলতাজাত সংহতির অভাব।—এই সুযোগে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার একটা সুলভ বিকাশ পথ পেয়ে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নব্য বাঙালীর মন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তখন উৎকেন্দ্রিক হয়েই রয়েছে। তাই ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রভৃতি গুরুকুল তাতে ইন্ধন যোগালেন মাত্র —একশ্রেণীর বাঙালীর সাহেব বনে যাওয়ার স্বপ্ন ও সাধনা অতি সহজেই সফলতা লাভ করলো। যে রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠীর গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়ায় নব্য-বাঙালী সাহেবদের জন্ম হলো—তাদের সৃষ্ট জীবন প্রণালীর তাড়নায় গোঁড়ার গোঁড়ামি বৃদ্ধি পেল বই হ্রাস পেল না। এই দুটি শক্তির টানা-পোড়েনে যে তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হলো তাঁরাই বাংলার সংস্কৃতির সেদিন যথার্থ রক্ষকরূপে স্বীকৃতি পেলেন। এই তৃতীয় শক্তির পুরোধায় যদি রামমোহন তবে পূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ। ধর্ম দৃষ্টির এই তিনটি শাখার মতকলহ ও বাগ্‌বিতণ্ডার সেদিন অন্ত ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মই প্রধানতঃ এই দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করে—মুসলমানগণ একেবারে নিশ্চেষ্ট না থাকলেও রঙ্গমঞ্চে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সে ধর্ম আসে নি বললে সত্যের অপলাপ করা হয় না। তবে উনিশ শতকীয় নব্য জীবনবোধের ধর্মপথ চূড়ান্তরূপে নির্দেশিত হলো পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচর্যায়। আধুনিক যুগানুগভাবে তো বটেই, হিন্দু-ধর্মের সার্বভৌম এই পুনরভ্যুত্থান বাংলাকে ছাড়িয়ে ভারতকেই শুধু স্পর্শ করলো না—আন্তর্জাতিক রূপরেখায় চিহ্নিত হলো। ধর্মে যে উদারতার কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে উনিশ শতকে এই মহামানবের প্রাণবেদনায় ক্রমবিকাশের পথে তারই চরমতম পরিণতি দেখা গেল।

সেদিন হিন্দুধর্ম যে বিক্ষোভের সম্মুখীন হয় রামমোহনের ব্রহ্ম সভা প্রথম থেকেই বরাবর তাকে পক্ষে গ্রহণ করে। তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথমেই সতর্কতার সঙ্গে স্মরণীয় যে, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণকে আমরা আধ্যাত্মসাধনার গুরুরূপে যে অর্থে গ্রহণ করি, সে অর্থে রামমোহন একজন ধর্মসংস্কারক ও উপলব্ধির অধিকারী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। রামমোহন ছিলেন সেই মহাবতরণের বৈতালিক। শ্রীরামকৃষ্ণে প্রাচীন ভারতের প্রাণ-সত্যের পুনরুজ্জীবন, সেই প্রাণসত্যেই বর্তমান ভারতের প্রতিষ্ঠা এবং তাতেই বর্তেছে অনাগত ভারতের উত্তরাধিকার। ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী যখন দীর্ঘদিনের কুসংস্কারের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে বুঝলেন, তখন বৈদান্তিক রামমোহন 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এর প্রেরণায় তাকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট হলেন। যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক যুক্তি-শৃঙ্খলে ভাবের প্লাবনের ক্ষয়ক্ষতিকে বন্দী করতে চাইলেন, নিয়ন্ত্রণ করলেন অন্ধ আবেগের ঘোলাটে স্রোতকে। সেই অর্থে রামমোহন আধুনিক যুগ প্রবর্তক সন্দেহ নেই।

বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁর পরবর্তী পৌরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। তিনি সর্বতোভাবে একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ যথার্থ আধুনিক মানুষ। তাঁর আধুনিকতা স্বাভাবিক কারণেই ঔদার্যে মহান—'মানুষ শ্রেষ্ঠ' এই বোধের চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় মানবিকতা বোধের আদর্শ এদেশে রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, পজিটিভিজম্-প্রচারক রামকমল ও কৃষ্ণকমল প্রমুখদের চিন্তা ও রচনার মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও পুরোপুরি নিরীশ্বর কোনো মতাদর্শই এদেশের শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধতে পারে নি। বিদ্যাসাগরের মানবিকতার আদর্শ ঈশ্বর জিজ্ঞাসার সঙ্গে লিপ্ত না হলেও কেবলমাত্র ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবিতও নয়। বঙ্কিম-মননে ধ্রুববাদের সঙ্গে গীতার কর্মজ্ঞান এবং পুরাণের ভক্তিবাদের আদর্শ এসে মিশেছে। প্রথমজীবনে দার্শনিক কোঁতের নিরীশ্বরবাদও বঙ্কিমকে কিছুটা নাড়া দেয়, সন্দেহ নেই।

মোটকথা সচেতন বিদ্যাশিক্ষার প্রত্যক্ষতায় উনিশ শতকের অনুসন্ধানীরা যখন ঈশ্বর প্রসঙ্গে তর্কে কালান্তর প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী—সেই সময় অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নীরব সাধনায় সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ণই সত্যি করে ধর্মবোধে যুগান্তর আনলো। ধর্মের গতির সূক্ষ্মতা ও নীতির সরল প্রশস্ততাকে মেনে নিয়ে বিদ্যাসাগরের ধর্মবোধ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর দানসাগরও ছিলেন। নিজের কায়িক শক্তি সামর্থ্য থেকে সুরু করে মন ও মনন পর্যন্ত—সর্বস্বে তিনি মানুষের মঙ্গল কর্ম-সাধনায় রিক্ত হয়েছেন—নিজের অবলম্বনরূপে এতটুকুও অবশিষ্ট রাখেন নি। এইখানেই তাঁর দৃশ্য জীবনের সাফল্য ও দর্শনাতীত জীবনে নৈরাশ্যের বীজটি নিহিত। বিদ্যাসাগর হিন্দু ছিলেন না ব্রাহ্ম ছিলেন—এ জিজ্ঞাসা নিরর্থক। ঠিক ততখানি অপদার্থ প্রশ্ন হতে পারে বিদ্যাসাগর আস্তিক ছিলেন না নাস্তিক ছিলেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন এমন একটা মত এককালে জোরদার ছিল। কিন্তু পরবর্তী বিশ্লেষণে বহু জন বিচিত্রভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন ঠিক তার বিপরীত কথাকে। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম সংঘাতের বিবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠ মন ও মনন কিছুটা পাশ কাটিয়ে নিরলস কর্মযজ্ঞে সমর্পিত ছিল এ তথ্যের বিপক্ষে মত নেই। তবে প্রত্যেক মানুষের মত এই বিশেষ মানুষটিও ছিলেন বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ।—হৃদয় ভরা আর্দ্র করুণার প্রস্রবণ, আবার তাঁরই মস্তিষ্ক ভরা বিদ্রোহী যুক্তির নিদাঘ। এই ব্যাপারটি ঠিকমত বুঝতে পারলে তাঁর সক্ষম জীবনে কর্ম-বিপ্লবকে বেশ ব্যাখ্যা করা যায়। অথচ অক্ষম জীবনের সায়াহ্নে তাঁর নৈরাশ্যের অতলতা কিন্তু নানা প্রশ্নবোধক চিন্তার সম্মুখীন করে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিদ্যাসাগর দুঃখের সাড়া যেখানে যতটুকু পেয়েছেন অস্থির হয়েছেন তার প্রতিকারের জন্য। মনীষী রাধাকৃষ্ণাণ গৌতমবুদ্ধ সম্পর্কে বলছেন—'Individual instances of suffering to Buddha

were illustrations of a universal problem. All that was fixed in him was shaken and he trembled at life.' [অনুবাদ : ব্যক্তিগত কষ্টের দৃশ্য বুদ্ধের নিকট বিশ্বজননী সমস্যার দৃষ্টান্তের সামিল হয়। তা তাঁর সমগ্র ধ্রুববোধকে দ্বিধান্বিত ক'রে জীবনকে আলোড়িত করে] বিদ্যাসাগরের এই ভাব। পূর্ণ জ্ঞানী বুদ্ধও মানব জীবন ধারণ ক'রে সংসার গ্রহণ করেন। আবার নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ তো করেনই, সংসারকেও সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন। বুদ্ধের নির্বাণ জগৎ হিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরও 'পরহিতায়' আত্মোৎসর্গ করেন। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ কোথাও নেই। তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট হবে, বুদ্ধ তাঁর আত্মজ্ঞানের পথ আপন হস্তে খনন করেছেন ও সাধনায় তাকে প্রস্তুতও করেছেন—কিন্তু তিনি অন্যের মত ও পথ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। সে নীরবতার ঔদাসীন্য কিন্তু বিদ্বেষ-জাত নয়। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের পথটি এবং পন্থাটিও তাঁর আত্মসৃষ্ট—এখানে তাঁর পরানুকরণ বা ঋণের সন্ধান করতে যাওয়া নিরর্থক। ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মব্রত উদযাপনে আবার একই ধরনের নীরব ঔদাসীন্য এবং তাতে অন্যের মত ও পথের প্রতি বিদ্বেষহীনতাই প্রকাশ পায় নি কি? তবে সন্ন্যাসীর মত 'অহং' টুকুকে বিসর্জন কোথাও তিনি দেন নি। দিতে চান নি কি দিতে পারেন নি বলা যায় না—তবে অগ্রাহ্য করেছেন বরাবর এটুকু লক্ষ্য করা যায়।

বাক্ সংযম বিদ্যাসাগরের যতই থাক—অক্লান্ত কর্মস্রোতে আস্তিক্য-বুদ্ধিই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে। নইলে সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে এত প্রাধান্য দিলেন কেন! যৌক্তিক মন ব্যবহারিক জীবনের মঙ্গলার্থে আত্মনায়কত্বকেই সত্য বলে স্বীকৃতি দিল না কেন? আসল কথা কর্মক্ষেত্রে তিনি আপন ধর্মনির্ভর বুদ্ধি ও প্রাচ্যপ্রতীচ্যের দর্শনের যুগানুগ ফলিত প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্ধ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার গর্জন।

যে মানুষ বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন বলতে কুণ্ঠিত নন—সেই মানুষই আবার প্রসঙ্গান্তরে বেদান্ত শিক্ষার উপযোগিতাকে স্বীকার করেছেন। উপরোধের খাতিরে বোধদয়ে বললেন 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—ব্যাস ওই পর্যন্ত। বুদ্ধিগম্য পথে বা হৃদয়ের স্রোতে কোথাও তিনি গুহা নিহিত ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করার প্রেরণাই বোধ করেননি। তাঁর পৃথিবীতে সত্যিকারের দেবতাকে যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অকপটে তাকে স্বীকারও করেছেন।—'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'—একথা এক বস্তুনিষ্ঠ কর্মযোগীর—এতে এতটুকু আবেগ বা মননের ভেজাল মিলবে না। অথচ ইম্যানুয়াল কান্টের নির্মম কর্তব্য পরিচালিত কর্মচক্রে আবর্তিত হতেও বিদ্যাসাগরকে দেখা যায়নি। মমতাবোধ তাঁর অতি মাত্রায় ছিল। গীতার নিষ্কাম কর্মবাদকে মেনে চলাই শ্রেয়ঃ একথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেও—তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন কি? অন্যত্র সে আলোচনায় আসা যাবে। এখন কথা হ'লো তাঁর সব বিরোধী মন্তব্যকে আপাত বিবেচনায় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। মানুষের সীমিত বুদ্ধি বৈপরীত্যে চঞ্চল, সর্বদা সর্বথা। বরং গভীর যা অতলান্ত যা, তাকে বিদ্যাসাগর নিজ জীবনে কোথাও মৌখিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেননি।

আসলে ভাব নিয়ে ভাবনা করবার অবসরই তাঁর ক্রিয়াশীল জীবন পদ্ধতিতে ছিল না। আবার এও বলা যেতে পারে তিনি সেই অবসরের সুযোগকে আমল দিতে চাননি বা পারেননি। যুগপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ না কি নিজে গেলেন 'সাগর' দর্শনে। অতএব ক্ষেত্রটি যে উচ্চ সাত্ত্বিকতার ভাবাশ্রয়ী তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রসঙ্গত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' একটু কান পাতলে শোনা যাবে—

'শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরে কি বিচার করে জানা যায়। তাঁর দাস হ'য়ে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁকে ডাক।'

(বিদ্যাসাগরের প্রতি, সহাস্যে) 'আচ্ছা, তোমার কি ভাব?'

'বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, 'আচ্ছা সেকথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলিব।' (সকলের হাস্য।)
একথা বিদ্যাসাগরের আর বলা হয়নি। বোধ করি বলতে চাননি। প্রশ্ন করা যেতে পারে—বলতে পারতেন কি? তবে বিদ্যাসাগরের আত্মা কিন্তু রাজার প্রতাপ নিয়ে মানব-মঙ্গল সাম্রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করেছেন। এ শাসনের অঙ্কুরটি মানব-প্রীতির নিগূঢ় বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। মানুষের সামান্যতম দুঃখ-বেদনার কথায় কেঁদে তিনি ভাসিয়েছেন। তা হলে বলা যায় না কি যে ভাব তাঁর অপর্যাপ্ত ছিল কিন্তু ভাব নিয়ে তিনি ভাবনা করেননি! ফকিরের গাওয়া গানে মনের মানুষের আকুতি তাঁকে বিচলিত করেছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু করেনি ভাবলোকের পথ-বিপথের সন্ধানে। আত্ম ভাবনার পথ ধরে তিনি আত্মা ভাবনার চড়াই-উৎরাইকে বর্জন করেছেন সচেতনভাবে।
মাত্র ক'বছর পরে স্বামীজী বাঙালী তথা ভারতবাসীর সুপ্ত আত্মাকে ঐহিকতামুখীন করতে চেয়েছিলেন। তাদের আত্মার জড়ত্বের কারণ রূপে তিনি হিন্দু ধর্ম দর্শনের পরলোকের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতিকে দায়ী করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবন সম্পূর্ণরূপে ঐহিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে তারই যেন নজির সৃষ্টি করতে আবির্ভূত হয়েছিল স্বামীজীর অভ্যুদয়ের শুকতারা রূপে। জীবন-বিরোধী ভূমাবোধকে বিসর্জন দেওয়ার ফলে ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু তিনি জীবনকে অতিক্রম করে তাঁর মন ও মননকে শান্তির সমুদ্রে লীন করতে পারলেন না। গৌতমবুদ্ধের মতো ত্যাগের পথে নাই বা হ'লো —জীবন ও জগৎকে নশ্বর তিনি বাধ্য হয়েও ভাবতে পেরেছিলেন কি? অভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর অজ্ঞ শিশু প্রভাবতীর মৃত্যু প্রসঙ্গে বলছেন—'সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না' বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কর্মেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য আসবেই—এবং উপযুক্ত

মনোবল না থাকলে এই নৈরাশ্য ও হাহাকার এড়ানো অসম্ভব। দেহ যখন দেহধারীর বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন মনকে দেহাতীত এক আদর্শের আকাশের স্থাপন না করে উপায় নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ জীবন, সে জীবন ভোগের জীবন নয়, এত অধিক সত্য ছিল যে তিনি মানুষের দুঃখ দেখলে আবেগের আতিশয্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বেও প্রশ্ন তুলতে সাহসী হয়েছেন। যদিও তিনি নিজে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বারে বারে তাঁর নানা আচার আচরণের ও কথায় স্বীকৃতি দিয়েছেন আমরা জানি। মূল কথাটি হ'লো তাঁর তেজোদীপ্ত অন্তঃকরণ মানুষের, আবার নিজেরও, দুঃখের প্রতিবাদে প্রতিরোধের আগুন ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও প্রজ্জ্বলিত করেছে। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের একটি পংক্তিকে এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—'তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করিবার সাধনা করেন নাই। মানুষের দুঃখ দৈন্য তাঁহার নিকট চরম সত্য ছিল।' তাই তিনি পরম যা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সদর্পে। তাই দর্প যেদিন দৈহিক দৌর্বল্যের বাত্যায় বিতাড়িত তখনই তিনি অসহায় বোধ করেছেন। ধ্রুব সহায় তাঁকে দিক নির্দেশ করতে পারেনি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠিপত্র অনুসন্ধান করলে তাঁর চেতনায় হতাশার রূপটি সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে তিনি লিখছেন—'ফল কথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দ্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।' বিদ্যাসাগর বৃহতের চরণ-ধূলায় তাঁর সকল অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করতে পারেননি। তাই আত্মবোধের চৌহদ্দিতে তাঁর প্রতিদানের প্রত্যাশাজাত এই শ্রেণীর সুতীব্র অভিমান। তবে সাধারণ স্তরের মানুষ কৃতকর্মের ভুল ভ্রান্তি নিয়ে যে হাহাকার করে থাকেন—এই অসাধারণ মনটিতে কিন্তু সেই নিম্ন মানের অনুতাপ বা অনুশোচনা নেই। রাজনারায়ণ

বন্ধুকে লিখছেন—'লিখিয়াছেন Second Master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার সহিত অস্বরস হইলে, অসুখের বিষয় ঘটিতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত মিল করিয়া লওয়া ভাল। আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত অধিক করিয়া খাইবেন, আপনি ধর্মতঃ আপন কর্ম নির্বাহ করিবেন তাহা হইলে ধর্মদ্বারে খালাস।' এ কোন বিদ্যাসাগর! ইনি তো বিপুল অসন্তোষের ঝড়কে অতিক্রম করেও ধর্মতঃ কর্ম নির্বাহের পক্ষপাতী!

রবীন্দ্র-রচনার একটি অনুচ্ছেদকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত। —'একথা মানতেই হবে যে, বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন; তার কারণ হচ্ছে যে, যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পাননি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যভ্রষ্ট হননি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড়ো তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান তাঁরা এই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে—অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।' রবীন্দ্রনাথের এই সংবেদনশীল বিশ্লেষণটির দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যায় যে—জীবনমাত্রেই বিষাদান্ত। এই বিষাদকে তুচ্ছ করার ক্ষমতা অর্জনই জীবন-যজ্ঞের শুভ প্রসাদ। সাধারণ মানুষের সাধনার অকিঞ্চিৎকরতাই তার জীবনকে নিয়তি-নির্যাতনের হাহাকারে বিষাদান্ত করে তোলে। সমগ্র জীবনকে একটা বিভ্রান্তির বিলাস বোধ করায় তার আত্মিক ভারসাম্য খোয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের মানসভূমির উচ্চতা তাঁকে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না করলেও অপার্থিব চেতনায় নিবেদিত প্রাণ করেতে পারেনি -এ তথ্য তাঁর জীবন-নাট্যে সুস্পষ্ট। জগৎ-তত্ত্বই তাঁর সাধনার অবলম্বন ছিল সেখানে আত্মতত্ত্বকে যদি তিনি বর্জন করে না চলতেন তবে অতলান্ত সমুদ্রবক্ষে জ্বালাযন্ত্রণার তরঙ্গ বিক্ষোভের পরিবর্তে অনাসক্তির নিস্পৃহতায় দেখা দিত না কি নিশ্চল শান্তির তারল্য ?

সমকালীন শিক্ষা-পরম্পরায় ঈশ্বরচন্দ্রের ধারাপাত

পঞ্চানন মণ্ডল

সমকালীন শিক্ষা-পরম্পরা

বিগত শতাব্দীর যুগসন্ধিকালে অবিচ্ছিন্ন পুরাতন দেশজ শিক্ষা-ধারার সংস্কারে, এবং বাঙ্গালীর নব-জীবনের জীবন-বেদ-রচনায় বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের দান ছিল অপরিমেয়। সে-বিষয়ে আলোচনার পূর্বে, তাঁর সমকালে প্রচলিত আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিচ্ছি।

পুরাতন পুঁথিপত্র, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ অনুসন্ধান করে সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছয়টি সুস্পষ্ট ধারা-প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।—(১) সংস্কৃত-শিক্ষা (২) বাংলা-শিক্ষা (৩) ব্যবহারিক ও কারিগরি শিক্ষা (৪) কীর্তনগান-পুরাণ-কথকতা (৫) পুঁথিলেখা আর (৬) ইংরেজি শিক্ষা।

বিশ্বভারতী যে সকল তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন, তা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দের শেষপাদ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসরের স্বদেশী-শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তার রূপরেখাটির উল্লেখ করব মাত্র।

সে-কালে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা টোলে সংস্কৃত-শিক্ষা-লাভ করতেন। টোলে পাঠ্যক্রম কিরূপ ছিল, নানা সূত্র থেকে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তিথি-উদ্বাহ-প্রায়শ্চিত্ত-দুর্গোৎসবাদি রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব'—এই সকল গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য ছিল। 'টোল ও গোয়ালি প্রস্তুত হইয়াছে ছাত্র ৮ জনা হইয়াছেন পাঠ ব্যাপ্তিপঞ্চকপক্ষতা সামান্য নিরুক্তির ভট্টাচার্য প্রভৃতি হইতেছে'– এই

সংবাদ পাওয়া গিয়েছে নান্নুর থেকে সংগৃহীত একখানি পত্র থেকে। বেহালার টোল থেকে ন্যায়-শাস্ত্রের ছাত্রগণের নাম-তালিকা মিলেছে। বর্তমানের বিদ্যালয়-পরিদর্শকদের মতো সে-কালের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ 'স্বাধ্যায়বকাসে···চৌপাড়ি' পরিদর্শন করে 'চক্ষুঃ সাফল্যলাভ' করতেন। ধনী জমিদারগণ চৌপাড়িতে বিশেষ সাহায্য দান করতেন। গ্রামের জনসাধারণের বাড়ি থেকে বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি কর্মে 'চৌপাড়ি' আদায় করা হ'তো। রাজস্ব বা শিক্ষা-করের মতো এ ছিল অবশ্য দেয়। এইভাবে আনুকূল্য লাভ করে সেকালের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হয়েছিল। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ রাজা প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সন ১২৪৩ সালে অম্বিকা সাকিমের রামলোচন ন্যায়বাগীশ আরজ্ করেছিলেন—

'মহারাজাধিরাজ রাজার কীর্ত্তী নবকৈলাষ নিকট টোল চৌপাড়ি করিয়া কতকগুলিন ব্রার্হ্মণ সন্তানদির্গের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছি কিন্তু ঞিহাদিগে নির্বাহ এবং আত্মপরিবার নির্বাহ অতিসয় দ্ব্যর্থ হইতেছে মহারাজাধিরাজ রাজা বাহাদুরের পূর্বপুরুশের দর্ত্ত ভূমিসকল কোম্পানিতে বাজেআপ্ত করিয়াছে ইহাতে পরম দুখী হইয়াছি অতএব কাঙ্কীত অনুগ্রহ দ্বারা আমি প্রতিপালিত হই।'—অবশ্য এই আবেদনে সদ্য সদ্য ফল ফলেছিল। 'বাদ মোলাহেজা হুকুম হইল জে—বর্ধমানের রাজধানি পৌছিয়া চৌপাড়ির তর্ত্তাবধানে মোনজোগ হইবেক।'

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে 'রাঢ়ী' বা 'বঙ্গীয়'—এই রকম কোনো প্রভেদ সেকালে করা হ'তো না। তবে, এই বিভেদটি ছিল সুপরিজ্ঞাত —"আমার এখানে দুইটি ছাত্র আছে একটি বঙ্গদেশীয়"—এই ধরনের উল্লেখ থেকে এটা বেশ বোঝা যায়। নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্বে রাঢ়দেশে এবং বিশেষ করে, দক্ষিণ রাঢ়ই ছিল এদেশের সারস্বত-সাধনার কেন্দ্র।

বাঙ্গালা-শিক্ষা পাঠশালায় সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ ছাত্রও কচিৎ থাকত। মুসলমান ছেলেরাও

এই পাঠশালায় পড়তে পেত। মক্তব মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান ছাত্রেরা পাঠশালায় পড়তে চাইত। বিশিষ্ট ব্যক্তির ছেলেদের পাঠশালায় প্রবেশ লাভ করতে গেলে' কখনো কখনো অভিভাবক ও গুরুমহাশয়ের মধ্যে পাট্টা-কবুলিয়তের মতো দলিল সম্পাদন করা হ'তো। একটি দুর্লভ নিদর্শন দেওয়া যাচ্ছে—

/৭ শ্রীশ্রীহরি

সন ১২৬৬ সাল

মহামহিম শ্রীযুত সোনাতন সরকার বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীশেখ কালাচাঁদ সাং নওপাড়া পরগণে হাবিলী কস্য একরার পত্রমিদং কার্জ্যানাঞ্চ আগে আপনকার চৌপাড়ি আমাদের গ্রামে থাকায় আমার পুত্র শ্রীশেখফোজুলু হোসেন ও শ্রী তর্ষুদ্দিক হোসেন এই দুই লোককে আপনকার নিকট লেখাপড়া কোরিবার কারণ পাট কেলট্ট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশ বাঙ্গালার হিসাবে ও হরফে ও ইস্তাহামে পুরা কোরিআ দিবেন আর বাঙ্গালার হিসাব ও সন্ধান স্বরআ আঁকজোঁকে তৈআর কোরিআ দিবেন ইস্তাহামে পুরা কোরিআ দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাং সন ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈআর কোরিআ দিবেক আর আমার নিকট দরমাহা মাঘমোট চুক্তী সর্বযুদ্ধা কোং ২৫৲ পোচিষ টাকা দিবো টাকার করার ফি মাহাতে ॥০ আট আনা দিবে। পরে এই কেলট্ট কট করারের পরে ইস্তাহামে পুরা করিআ ইস্তাম নিআ আপনকার মাহীনে হিসাব নিকাস করিআ দিবো আর এই করারের ভিতর তৈআর কোরিআ না দীতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনকার ঠাই লৈইবে। আর এই টাকা জখন দিবেন এই একরারের পীষ্ঠে রোশীদ দিবো এইতদাথ্যা একরার পত্র লিখিআ দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ শ্রাবণ

ইসাদ— শ্রীসেখকালাচাঁদ

সাং—নওাপাড়া

/শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৬৬ সাল

মহামহিম শ্রীযুক্ত শেখকালাচাঁদ মহাসয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীসোনাতন সরকার কাচগড়্যা পরগণে বায়ড়া কোস্য একরার পত্র মিদং কার্জ্জ্যনঞ্চাগে আমার চৌপাড়ি পাঠাসা[লা]য় মৌজে নওপাড়া গ্রামে স্বরকারি কর্ম্মো করিতেছি এক্ষ্যাণে মবাঁসএর পুত্রু শ্রীসেখ ফোজুলু ও শ্রীসেখ তোষুদ্দক এই দুই জোনাকে পাট কেলট্টক [ট] ইস্তক সন ১২৬৬ সাল নাগাইদ সন ১২৬৭ সালের মাহ শ্রাবণ তক পাট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশী কর্ম্মে তৈআর কোরিআ দিবো আমার মাহীনে মায় খোর পোষাক স্বর্দ্ধা কোং ২৬ ছাব্বিস টাকা পাইবো মহাসএর পুত্রদীগরকে তৈআর করিআ দিবো উক্ত ছাত্রদির্গেক ত্বআর না করিআ দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফিরৎ দিবো আপনার পুত্রুদীগর সাভালি করিআ কামাঞী করে এবং অন্ন কোন উজর হয় তবে আমি মহাসয়কে মোং কোলকাতা তক্ চিটী লিখিআ জানাইবো টাকার উপর…আমার একরার স্বক মাহীনে লৈইবে। কিন্বে এই কর্মে আমার গাফিলি হয় তবে আমি এই চুক্তীর টাকায় বাদ দীব এই তদাথ্যা একরার পত্র আপন খুশীতে লিখিআ দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ই শ্রাবণ

ইসাদ

এই একরার-পত্রগুলি পাঠ করলে, পঞ্চতন্ত্রের অমরশক্তি-বিষ্ণুশর্মার চুক্তিপত্রের 'কথামুখ' মনে পড়ে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি এদেশে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত লোককথার সংকলন। সুতরাং, আমাদের সংগৃহীত বাঙ্গালা-পাঠশালার একরার-পত্র-লিখনের এই ধারাটি ভারতীয় প্রাচীন লৌকিক পরম্পরারই একটি বিশিষ্ট নিদর্শন-স্বরূপে গণ্য হতে পারে।

এই একরার-পত্রে লক্ষণীয় বিষয় অনেক। প্রথমতঃ 'সরকারী'

অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্যে অবারিত বাঙ্গালা-পাঠশালাকেও 'চৌপাড়ি' অর্থাৎ চতুস্পাঠি বলা হচ্ছে—সংস্কৃত পাঠের টোলের অনুকরণে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ'ঘরের ছেলেকে চৌকস হতে গেলে, কি কি বিষয় অধ্যয়ন করা তার পক্ষে আবশ্যিক ছিল, তার হদিস জানা যাচ্ছে। একশত বৎসর পূর্বে, এককালীন সর্বসাকুল্যে ছাব্বিশ টাকা বেতনে, মায় খোরাকে পোষাকে, উপযুক্ত শিক্ষক মিলছে, ছেলেদের শিক্ষা পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত, সম্পূর্ণ করে দেবার জন্যে। অক্ষর-পরিচয়, খাতাসহি, হিসাব-নিকাশ, সন্ধান-স্বরআ, আঁক-জোখ ইত্যাদি শিক্ষা সমাপ্ত হ'তো প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই। তবে, বিশেষ লক্ষণীয় হ'লো এই; ছাত্র তার ব্যক্তিগত কারণ ব্যতীত, পরীক্ষায় ফেল করলে গুরু-মহাশয়ের নিস্তার ছিল না। একবারে লিখিত বেতনের সমূহ টাকা সুদ-সমেত তাঁকে এককালে ফেরত দিতে হ'তো। এই লেন-দেনের জন্যে পাট্টা-কবুলিয়ত সম্পাদিত হ'তো যথারীতি। প্রসঙ্গতঃ মুসলমান 'কালাচাঁদ' এবং হিন্দু 'সোনাতনের' সামাজিক সম্প্রীতির সম্পর্কটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ব্রাহ্মণেতর হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রেরা সাধারণতঃ পাঠ গ্রহণ করত বাঙ্গালা পাঠশালায়। গণিতের আর্যা-শিক্ষায় দেখা যায়, কায়স্থের ছেলের প্রাধান্য। ছাত্রসকলকে বিদ্যা অধ্যয়ন করাবার জন্যে আটানব্বই রকমের 'প্রস্ত' (item) পাওয়া গেছে বীরভূম জেলার খুজুটিপাড়া গ্রাম থেকে। 'বহিদার' বা এই পুঁথির মালিক ছিলেন ব্রজবাসী দাস সৌ—সময় হ'লো ১২৭১ বঙ্গাব্দ। এই আটানব্বই প্রকার 'প্রস্তের' বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়।

তবে, এককথায় বলা যায়, সাধারণ গৃহস্থঘরের একটি ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক থেকে পূর্ণ-পরিণত করে দিতে, এই প্রস্থধৃত শিক্ষা-প্রণালী পর্যাপ্ত ছিল। এতে প্রাচীন পরম্পরা-গত হিন্দু-যুগের মুসলমান আমলের এবং ইংরাজ রাজত্বের বহু ব্যবহারিক

বিষ্ঠাই স্থানলাভ করেছে। এবং নিশ্চিত বলা যায়, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বাঙ্গালী হিন্দু যুগোপযোগী শিক্ষাধারাকে কালে কালে গ্রহণ এবং তার সমীকরণ করে এসেছে। এও ঠিক যে, সার্বভৌম লোকধর্মাশ্রিত হিন্দু-সংস্কৃতির মূলে এই সমীকরণের সুফলবশতঃই জাতি-হিসাবে হিন্দু বাঙ্গালী এখনও টিকে আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব থেকে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রতিভাধর ব্যক্তিগণও এই ধারায় গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করে, গ্রাম থেকে দূরে, আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র শহরে এসে সমবেত হয়েছিলেন। এবং আশ্চর্যের কথা এই একই অঞ্চল থেকে জীবন-উষায় এই ধারা-সিঞ্চনে প্রথম পুষ্টিলাভ করে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঠাসাগর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বাঙ্গালী প্রতিভা বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূত্রপাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গণিতের আর্যা এবং পাঠশালার আটানব্বই প্রস্থ পাঠ্য-তালিকা ছাড়া আরও মূল্যবান্ দলিলপত্র আমাদের হাতে এসেছে। 'শিশুজ্ঞান-চরিত্র' নামে একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে, এতে পাওয়া যাচ্ছে পাঠশালার পাঠ্য-তালিকায় শিশুদের উপযোগী জ্ঞান-বৃদ্ধির শিক্ষা-পদ্ধতি। এই পুঁথিতে প্রথমেই রয়েছে চৌত্রিশ অক্ষরে শিক্ষাদানের কথা। বর্তমানে 'ক্ষ' এবং 'ৎ' বাদ দিয়ে, বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে মোট ছেচল্লিশটি। বাঙ্গালা অক্ষর-সংস্কারে গত শতাব্দে বিষ্ঠাসাগর মহাশয়ের দান ছিল অনেকখানি। কিন্তু, পূর্বে বিষ্ঠা আরম্ভ হ'তো চৌত্রিশ অক্ষরের বর্ণমালা দিয়ে। এই চৌত্রিশ অক্ষরের ধারা ধরা আছে—আমরা দেখতে পাই, বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে 'চৌত্রিশা' স্তবের মধ্যে। অক্ষর-পরিচয়ের পরে, সরল এবং যুক্ত বর্ণাদির বানান শেখানো হ'তো।

বানান শেখার সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন গুরুগোবিন্দ—

অক্ষর পরিচয় কহিয়া দি　　বানান জানিলে কঠিন কি।

যুক্ত অক্ষর লাগে ধান্দি পর্বঅক্ষর উপরে ছান্দি।
অপর অক্ষর তাহার তলে ছাওালে গুরুগোবিন্দ বলে॥

তারপরে হ'তো, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে শব্দ-প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা। সেকালে বানান বিশেষভাবে শিখতে হ'তো যাঁরা পুঁথি-লেখার পেশা গ্রহণ করবে তাঁদের। সাহিত্য হিসাবে বই পড়ানো হ'তো গুরুদক্ষিণা, গঙ্গাস্তব, আশ্রয়নির্ণয়, রায়বার, বারমাস্যা—এই সমস্ত। তারপরে শেখানো হ'তো খত-পাটা। তারপরে অঙ্কের পাঠ। পাঠশালায় কতকগুলি সহাধ্যায়ী বালকের নাম উল্লেখের ছলে, ছাত্রদের যুক্তবর্ণ শেখাবার কৌশলটি ছিল চমৎকার।

যাই হোক, পাঠশালায় কেবল পাঠ পড়ানোই হ'তো না, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকেও গুরুমহাশয়গণ প্রখর দৃষ্টি রাখতেন; আর শেখাতেন শীল-আচরণ। প্রথমতঃ, আপন গৃহে গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁদের সেবা করাই যে ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্য, সেটি বুঝিয়ে দেওয়া হ'তো বিশেষভাবে। তা ছাড়া, তখনকার দিনের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবাদি উচ্চবর্ণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল। 'না বলিয়া পরের ধন' নেবার প্রবৃত্তি—ইত্যাদি রিপুগুলির নিরোধ-কল্পেও গুরুমহাশয়গণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। সেকালের পাঠশালায় আরও একটি বিশেষ শিক্ষাদান করা হ'তো, যা এখনও আমাদের বিশেষভাবে শিক্ষণীয়।

'শিশুজ্ঞান চরিত্র' পুঁথির লেখক দ্বিজদুর্গারাম ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছেন, সতীর্থদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সর্বথা ও সর্বদা পালনীয়। এমন কি, প্রত্যেক সতীর্থ যেন মনে করে, তারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় নয়, একটি গৃহনীড়ে এসে সমবেত হয়েছে।—

'পড়ুআ পড়ুআ দন্দ না করিহ কেহ।
মনে কর সকলে হইবে একগ্রহ॥'

—এবং যেন প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের বাক্যে ও আচরণে 'যত্ন'

অর্থাৎ শিষ্টভাব প্রকাশ পায়। অবশেষে, শিক্ষক বা শিক্ষাদাতা গুরু-মহাশয়কে যেন সযত্নে, এমনকি, কায়ক্লেশেও সেবা করা হয়। কঠোর জাতিভেদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে কালের সার্বলৌকিক বাঙ্গালা পাঠশালায় শিশুদের সরস মানস-ক্ষেত্রে এইভাবে শান্ত ও ভদ্র জীবন এবং মানবিকতা-বোধের বীজটি গ্রাম্য গুরুমহাশয়ই বুনে দিতেন। বলা বাহুল্য, মানব-জমিনে বিশ্বপ্রেমের এই বীজটি হিন্দু-সভ্যতার উন্মেষ-কালেই উপ্ত হয়েছিল।

গুরুমহাশয় দুর্গারাম পাঠশালার ছাত্রদের আরও উপদেশ দিচ্ছেন: একমন হয়ে লেখাপড়া করলে সকল বিদ্যা সহজে অধিগত হবে; এবং অনিবার্য কারণে—"লিখিবার কালে কত কিল লাথি খাবে।" প্রভাতে উঠে মুখ হাত ধুয়ে "দুয়াতি পাত পুঁথি লয়্যা বসিবে সারি সারি।" তারপরে দেব-দ্বিজ-গুরুর পায়ে প্রণাম করে "জাহার যেমন পাঠ পড়িবে বশ্য হয়ে।" এরপরে খাড়া বসে অক্ষর লিখন-পদ্ধতির নির্দেশ এই—"ঘাড় বাকা হইলে অক্ষর হয় বাকা, ইহা জানি লেখাপড়া সভে কর শিক্ষা।"

পাঠশালায় উচ্চশ্রেণীতে শিশুবোধক, জ্ঞানকৌমুদী গ্রন্থ পড়ানো হ'তো। 'জ্ঞানকৌমুদী' থেকে হিন্দুছাত্রদের লিখনের পাটাপাট শিক্ষা দেওয়া হ'তো। হেঁয়ালিতে চিঠি লেখবার একটি খুব প্রাচীন রীতি ছিল। পাঠশালায় উচ্চশ্রেণীতে আরও যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়ানো হ'তো তার মধ্যে—শংকরাচার্য-কৃত গঙ্গাস্তব, আশ্রয়নির্ণয়, রাধারস-কারিকা, কুম্ভকর্ণের রায়বার, বাঙ্গালা অঙ্গদের রায়বার, ফুল্লরার বারমাসী—এই সকল গ্রন্থের নাম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অন্য-বৈষ্ণব নিবন্ধ এবং বিভিন্ন সূত্রাদিও পড়ানো এবং আবৃত্তি শেখানো হ'তো।

বাঙ্গালা পাঠশালায় মুসলমান ছাত্রদেরও অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এই অধিকার সম্ভবতঃ উভয় তরফেই ছিল অবারিত। হিন্দু ছাত্রদের যে সব বিষয় পাঠশালায় পড়ানো হ'তো, মুসলমান পড়ুয়াগণও

তাই শিখত। তবে মনে হয়, আত্মীয়-স্বজন ও স্ব-সমাজে চিঠি-পত্রাদি লেখবার জন্যে বিশেষ ধরনের 'ধারা' তাদের শিক্ষা দেওয়া হ'তো। 'মোছলমানের প্রকরণ' নামে পুঁথি পাওয়া গেছে, তাতে রয়েছে খত-লেখবার স্বতন্ত্র 'সেরেস্তা'।

১১৯৮ বঙ্গাব্দে লেখা একটি পাঠশালার পড়ুয়াদের নাম-তালিকা, তাদের প্রদত্ত বেতনের হার, ও তার জমা-খরচ এবং গুরুমহাশয়ের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া গিয়েছে। পড়ুয়াদের তালিকায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয় শ্রেণীর ছাত্রই একত্রে শিক্ষা-লাভ করছেন। কিন্তু তুলনায় ব্রাহ্মণ ছাত্রের সংখ্যা কম। ছাত্রদের বেতনও এমন কিছু বেশী ছিল না—এক আনা, দু' আনা ছিল সাধারণ মান। সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল বোধ হয় চার আনা। পাঠশালা পরিচালনা করে গুরুমহাশয়ের যে আয় হ'তো, তাতে মনে হয়, স্বচ্ছল না হলেও কোনো প্রকারে সংসারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ হয়ে যেত। তখনকার দিনের পাঠশালার একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখা যায় একটি পুঁথির এই ক'টি ছত্রে,—

অষ্টাদশ ছাওাল পড়িছে নিরন্তর অষ্টশব্দী আদিকরি পড়িল অমর।
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে অষ্ট কোঠা অষ্টপর সিক্ষা করে ইবে।
সরকার বেড়িয়া সভে বস্যে ডানি বাঁ অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ।
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস কঠিক কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাস।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয় অঙ্ক হল্যে অস্থির সুস্থির কর্য়া লয়॥

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে আর একখানি পুঁথি সেকালের গ্রাম্য পাঠশালার একখানি দুর্লভ কড়চা হিসাবে সবিশেষ মূল্যবান্। এই পুঁথিতে পত্র লেখবার নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি হেঁয়ালির আকারে রচিত। সেই জন্যে স্থল-বিশেষে সমস্যা-পূরণ করা রীতি-মতো দুরূহ ব্যাপার। এই ছড়াগুলিতে সেকালের সমাজের প্রত্যক্ষ চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাহিত্যরসও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। একটি কবিতা উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল—

সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ দিব্য করি গেলা ছুটি শিরে দিয়া হাথ।
বিরহে ব্যাকুলচিত না শুনে বারন   নিঠুর হইয়া নাগ্নি আল্য প্রাণধন।
তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত   দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্চ্ছাগত।
রাগ রস বাণ বসু একত্র করিয়া   গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি   জে কহিলে তাই দিব্যানিশি বুঝ্যা দেখি॥

এই কবিতাটির অন্তরালে আসলে একটি অঙ্কের 'সমস্যা' নিহিত রয়েছে। এই পদটি একদিকে যেমন উঁচুদরের একটি সাহিত্য-কৃতি, তেমনি পাঠশালের ছাত্রদের অঙ্ক-শেখাবারও একটি শর্করা-মিশ্রিত পদ্ধতি-বিশেষ। ফলে, এতে বয়স্ক ছাত্রদের আহার ও ঔষধ দুই-এরই যোগান দেওয়া হয়েছে। পদটি সহজভাবে পাঠ করলে সহসা একজন বিশিষ্ট পদকর্তার বৈষ্ণব পদ বলে মনে হবে। পক্ষান্তরে এর অন্তর্নিহিত অঙ্কটি পাতন করলে এই রকম দাঁড়াবে,—রাগ=৬, রস=৬, বাণ=৫, বসু=৮; সর্ব একুনে হয় ২৫।—এ থেকে 'বাণ' ঘুচিয়ে, অর্থাৎ ৫ বাদ দিলে, বাকি থাকে 'বিশ' বা 'বিষ' এই গরল গ্রাস করে, নায়িকা প্রাণত্যাগ করতে সংকল্প করছেন, তাঁর প্রাণনাথ শপথ মেনে, যথাসময়ে তাঁর নিকট প্রবাস থেকে ফিরে না এলে।

শুভঙ্করীর 'আর্যা' বাঙ্গালাদেশকে অঙ্ক শেখাবার গ্রন্থরূপে প্রাচীন কাল অর্থাৎ প্রায় দু' হাজার বৎসর আগে থেকে প্রচলিত আছে। উড়িষ্যায় 'লীলাবতীসূত্র' মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ছন্দ 'আর্যা'। পড়তে হয় বা গীত হয় 'বঙ্গলা শ্রী' রাগে। আসামে গণিতের ছড়ার বিশিষ্ট নাম—'কায়থলি আর্যা'। দক্ষিণ রাঢ়ে ও আসামে পুরাতন ছড়াগুলির মধ্যে খুব মিল আছে। উড়িষ্যার 'লীলাবতীসূত্রের' সঙ্গে এইগুলির মিলও দুর্লক্ষ্য নয়। এদের প্রত্যেকটির মূল অপভ্রংশ বলে, এই মিল সম্ভবপর হয়েছে।

প্রাকৃত কবিতার বিশিষ্ট ছন্দের নাম হ'লো 'আর্যা'। প্রাকৃতে এই

রকম গণিত-সূত্র গ্রথিত হ'তো 'আর্যা ছন্দে। সংস্কৃত গণিত-নিবন্ধেও আর্যা-ছন্দের ব্যবহার আছে। সেই সূত্রে বাঙ্গালা গণিত-সূত্রের ছড়ার নাম বিদ্যাসাগরী ধারায় ছিল 'আর্যা'; আজও আছে 'আর্যা'।'

পাঠশালার পাঠ্যক্রম শুভঙ্করের মতে এই রকম,—আগে অক্ষর-পরিচয়, তারপর বানান-শিক্ষা, তারপরে আর্যা। যুক্ত অক্ষর দেখে ধাঁধা লাগলে, প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর উপরে নিচে সাজিয়ে পড়লে তা সহজে বোধগম্য হবে। ছড়াটি আগেই উদ্ধার করেছি।

অঙ্কের গণনা ছাড়া, ধান্যের সম্পর্কে যে সমস্ত হিসাবাদি পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হ'তো, তাতে সেকালের সম্পন্ন পল্লী-গৃহস্থের জীবন-যাত্রা সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোকপাত হয়। ধান্যের মাপ এবং মজুত চালের হিসেব শিখিয়ে, ধান্য ভাচা দেবার পদ্ধতি শেখানো হ'তো। ধান্য খরিদ-বিক্রীর জন্যে টাকার দরে, আনার দরে, ধানের হিসাব কষানো হ'তো। ধান, চাল, গুড়, সরষে এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের লেন-দেনের জন্যে রীতিমতো উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হ'তো। শস্য ব্যতীত, সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, রাং, খপিরা-নির্মিত তৈজস-পত্র খরিদ করবার পদ্ধতিও শেখানো হ'তো। পানের বরজ-কালি করতে হ'তো। দেউল-কালি, নৌকা-কালিও শিখতে হ'তো। পানের বরজ মাপের একটি পুঁথিতে হেমন্ত দাসী নামে একজন মহিলার ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ এই মহিলাটিও পাঠশালা পরিচালনা করতেন। এ-ছাড়া, কাগজ কিনবার আর্যা, মাস-মাহিনার আর্যা, বৎসর-মাহিনার আর্যা শেখানো হ'তো। অঙ্কের সংখ্যা ও বিভিন্ন নামে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পাঠশালে এই ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা-গ্রহণের পরে, সেকালের ভদ্রসন্তানেরা উচ্চতর মানে যে-আদর্শে শিক্ষা গ্রহণ করতো. একখানি পুঁথি থেকে তার আদর্শ উদ্ধার করা গেল—

অক্ষর চিনিঞা [হরি] পড়ে অভিধান
সর্বশাস্ত্র পড়ি হরি হইলা বুদ্ধিমান।

রামায়ণ পড়ি হরি পাইল বড় দুখ
রতিশাস্ত্র পড়িয়া হরি পাইলা বড় সুখ।
চৌসষ্টি দিবসে বিদ্যা চৌসষ্টি শিখিল
বিদ্যা শিখিয়া হরি গুরুর ভাগ পাল।
কাব্য অলঙ্কার পড়ে নাটক নাটিকা
পুরাণ ভারথ পড়ে আখড়াই মল্ল টীকা।
নানা রস কলা হরি শিখিল নৃত্যগীত
বহুবিদ্যা সিখিল হরি স্ত্রী চরিত।
শ্রগাল চরিত্র পড়িয়া কাক চরিত্র পড়ি
অঙ্গি ভারত নাগরি বিদ্যা সিখিল ভারতী।
ক্ষেত্রিবিদ্যা সিখিল হরি ছত্তিস বিধান
গজবিদ্যা সিখিআ হরি হইলেন সিয়ান।

কায়স্থ-সন্তানদের লেখাপড়া শেখা সেকালে আবশ্যিক ছিল। প্রাচীন হিন্দু-যুগের 'করণ-কায়স্থ' মুসলমান-আমলে সম্ভবতঃ জাতির নামে পরিণত হয়েছে; কিন্তু জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাজ তখনও তাঁদের একচেটিয়া ছিল। একখানি পুঁথিতে গৌড়-দরবারের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, 'কায়স্থ কারকুন জত করে লেখা-পড়া'। সেই জন্যেই বোধ হয়, গণিতের আর্যায় অধিকাংশ স্থলে পড়ুয়া কায়স্থ-সন্তানকে উদ্দেশ করা হয়েছে। পেশাগত পদবীবাচক 'কায়স্থ'-শব্দের একটি নিদর্শন সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে।

একালের 'সেমিনার'-পদ্ধতির মতো সে কালেও 'সেমিনার'-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; প্রশ্নোত্তরে মৌলিক পাঠ অগ্রসর হ'তো। তবে উপরন্তু ছিল, পুঁথি বাজি-রাখার ব্যাপার। তখন পুঁথি 'ধরিয়া' অর্থাৎ পুঁথি বাজি রেখে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হ'তো। পুঁথি ছাড়িয়ে নিতে হ'তো, প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে। অন্যথায় ফেল হয়ে গেলে, নিজেরই গুরুর কাছে অথবা প্রশ্নকর্তার 'ওস্তাদের' নিকট কিছুকাল

থেকে পুনরায় পাঠ নিতে হ'তো। সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে চাইলে 'নাগরি বিদ্যা' বা হিন্দী-পাঠ সেকালে ছিল অবশ্য-শিক্ষণীয়।

এ-ছাড়া ব্যবহারিক ও কারিগরি-শিক্ষাও প্রচলিত ছিল। 'পথবন্ধ', 'নৌকাবন্ধ', 'সর্পবন্ধ' ইত্যাদি চিত্র-কবিতা রচনা করা বা করানো দস্তুর ছিল। উচ্চশ্রেণীর বনেদী পরিবারে এই রকম কবিতা বিশিষ্ট অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে দিয়ে রচনা করিয়ে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হ'তো। এছাড়া, শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি-সংস্কারের সময় কর্মক্ষেত্রে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে 'বাদ' বা তর্কযুদ্ধ করানো তখনকার দিনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেমিনারের নাম ছিল 'দিগ্বিজয় বিচার'। স্বকীয়া ও পরকীয়া ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবার জন্যে এইরকম তর্কযুদ্ধ একবার একটি চলেছিল ছয় মাস ধরে। চলেছিল ১১৩৭ বাঙ্গালা সনে—বীরভূমের মালিয়াটি গ্রামে, মহারাজ নন্দকুমারের গুরু, 'পদামৃত-সমুদ্র'-গ্রন্থের সংকলয়িতা রাধামোহন ঠাকুরের বাড়িতে। কারিগরি কাজে হোমের কুণ্ডনির্মাণ, শিবঠাকুর-নির্মাণ, কোটার সাজ তৈরি—এসব বংশপরম্পরায় প্রস্তুত করত গ্রামের কুম্ভকার, সূত্রধর, মালাকারগণ।

তখন কীর্তন-গান, পুরাণ-পাঠ, কথকতা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় প্রচলিত ছিল। এতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতির পৌরাণিক চরিত্র, শিবঠাকুরের ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অতি-লৌকিক আদর্শ-কাহিনী শুনে শুনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সকলে নিজেদের চরিত্র গঠন করত, আর শিখত ভক্তি-নম্রতা। রামায়ণের 'কীর্তন' পাঠ হ'তো। 'মহাভারতের গান' আর নানা মঙ্গল-গান প্রচলিত তো ছিলই। 'বিরাটপর্ব' পাঠ করা হ'তো শ্রাদ্ধ-বাসরে। গোবিন্দদাসের কীর্তন খুবই জনপ্রিয় ছিল।

উত্তম দিবস নির্বাচন করে ভাগবতাদির 'কথা' আরম্ভ করা হ'তো। ভাগবত-পুরাণের কথকতা অনেক স্থলে মাসাধিককাল পর্যন্ত চলত। এই সম্পর্কে নিমন্ত্রণ-পত্রের পাঠও যৎপরোনাস্তি বিনয়-ব্যঞ্জক।—'দয়া নিধান

ঘনেশ্যামপুরের বাটী শুভাগমনপূর্বক উক্ত পুরাণ আদি শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।' এই বৃত্তিতে কথকঠাকুরের আয়ও হ'তো প্রচুর, প্যালা ইত্যাদি প্রাপ্তিতে। কথকঠাকুর কড়ার মত না এলে, বা জানাতে না-পারলে, চুক্তি বাতিল করে জবাব হ'তো; এবং তাঁর স্থলে দ্বিতীয় কথক আনা হ'তো। একখানি পুরাতন পত্রে এই বিষয়ে 'দেহকৃৎ ঠাকুর'কে অর্থাৎ পিতাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন জনৈক ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা।

বার্ষিক বরাদ্দ কীর্তন-গানের জন্যে জমিদারির মহল পাট্টা দেওয়া হ'তো কীর্তনীয়াকে। কথকদলের হিসাব এবং পালাপ্রতি দফাওয়ারি জমাখরচের ফর্দ পাওয়া গেছে।—"পুরাণ আরব্ধ বাবুদিগ্যের বাটিতে হইয়াছে জানিবেন লাভাদির কিছু হয় নাই। কথকথা উত্তম হইতেছে সকলের মনহিৎ হইআছে। আর উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে"—এই সংবাদ রাইপুর থেকে জৈনিক কথক নীলকণ্ঠ দেবশর্মা নামুরে জানিয়েছিলেন তাঁর মেসো জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারকে। সে প্রায় দেড়শত বৎসর আগেকার কথা।

এই সময় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়বিধ পুঁথিরই প্রতিলিপি করা হ'তো সমানভাবে। আদর্শ জীর্ণ পুঁথি থেকে নতুন প্রতিলিপি তৈরি করা হ'তো। ভাগবত, বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব-পুঁথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হ'তো তুলনায় বেশী। এই নিয়ে ঝগড়াও চলত। পুঁথি ফেরৎ দেবার কড়ার খেলাপ করলে একবার পত্র লিখতে হ'তো। মৃতজনের পুঁথি 'উত্তম সস্তা' হ'লেও লোকে কিনতে চাইত না। কেউ কিনলে ক্রেতাকে 'তজ্জন্যই তোমার ব্যারাম হইয়াছে'—এইরকম গঞ্জনা ভোগ করতে হ'তো।

পুঁথির বানান-সম্পর্কে দ্বিজ দুর্গারাম তাঁর 'শিশুজ্ঞান চরিত্রের' পুঁথিতে লিখেছেন,—'বানান সিখিলে কিছু নাই য়গোচর, অবোহেলে চালাইবে পুঁথির অক্ষর।' পাঠশালার গুরুমহাশয়ের লিপিকৃত এই ছত্রটির দিকে লক্ষ্য করলেই, পাঠশালে ছাত্রদের বানান শিক্ষা

কেমন বিশুদ্ধ হ'তো, তা সহজেই অনুমান করা যাবে; এবং এই ধারায় রপ্ত হয়ে পুঁথির লিপিকর পুঁথিতে ব্যবহৃত শব্দের বানান লিখতে কিরূপ 'অবহেলায়' লেখনী চালিয়ে অক্ষর বসিয়ে যেতেন, তা বাঙ্গালা পুঁথির পাঠকমাত্রেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে অপভ্রংশ ভাষার জন্ম-কথা বিচার করতে চাইলে, বাঙ্গালা বানানের এই নৈরাজ্য যুগের বৈজ্ঞানিক মূল্য স্বীকার না করে উপায় নাই।

পুঁথি লেখায় সেকালে যে কালি ব্যবহার হ'তো সেই কালি তৈরীর দু'টি 'ফরমূলা' সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে মৌলিক গ্রন্থাদির টীকা-টিপ্পনী প্রচুর পরিমাণে লেখা হয়েছিল; এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে কিছু মৌলিক গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। এই ধারার সমাপ্তি ঘটেছিল মনে হয়,—সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি, পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার ও জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতের রচনায় ও পাণ্ডিত্য কৃতিতে।

শহর কলকাতায় তখন ইংরেজি ও বাঙ্গালা লেখাপড়া প্রচলিত ছিল। নিভৃত গ্রামাঞ্চলেও এই সময়ে ইংরেজি-শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল, তারও অনেক প্রমাণ আছে। বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়াতে নতুন স্কুল ঘর তৈরী হয়েছিল কমপক্ষে দেড়শত বৎসর আগে। এই সময়ে এক সুদূর পল্লীগ্রামের কোনো কায়স্থ-বাড়ির 'প্রাণাধিকদের' লেখাপড়ার তদ্বিরে, সংবাদ নেওয়া হয়েছিল; এবং লেখা-পড়ায় অন্যথা হলে, বাড়ির অভিভাবক মহাশয় 'বড় বেজার' হবেন বলে পত্র লিখেছিলেন।

'আমার ভাগিনা শ্রীযুত সিতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজিকে পাঠাইবার কারন বর্দ্ধমান মোকামে অনুমতি করিয়াছিলেন এ কারন পাঠাইতেছি কিছু দিন নিকটে রাখিয়া জ্ঞানি করিয়া দিবেন'— এই রকম ভরসাও রাখা হয়েছে দেখতে পাওয়া যাবে,—তবে, অবশ্য সে বিত্তবান্ উপযুক্ত লোকের উপর।

নবদ্বীপ বিদ্যা-সমাজের ভারত-বিখ্যাত বিভিন্ন সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অনুপ্রেরণায় রাঢ়দেশে বর্ধিষ্ণু প্রায় সমস্ত গ্রামে ছোট-বড়ো বিদ্যায়তন বা টোলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এক-একটি টোল পরিচালনা করতেন এক-এক-জন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পরবর্তিকালে দক্ষিণ রাঢ়ে ডোমজাতীয় ধর্মপণ্ডিতের পরিচালিত সংস্কৃত টোলে ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠ গ্রহণ করছে—এরূপ দৃশ্যও বিরল ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দে বর্ধমান জেলার জউ-গ্রামে সুবিখ্যাত কলানিধি ভট্টাচার্যের বিদ্যাপীঠ ছিল। তখন নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর পূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল। শান্তিপুরে ছিলেন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। 'ভারতী'র পাঠ নেবার জন্য তাঁর কাছে দিগ্-দিগন্তর থেকে ছাত্র আসতেন। কিন্তু জউ-গ্রামের কলানিধির খ্যাতি ছিল শান্তিপুরের বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের খ্যাতি অপেক্ষা অধিক। এই সময় বর্ধমান জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে আদি-ধর্মমঙ্গলকার রূপরাম চক্রবর্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি মস্তো বড়ো টোল ছিল। এই টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল একশত কুড়ি। শ্রীরামপুরের সন্নিকটে পাষণ্ডা গ্রামে এবং আড়ুই গ্রামেও টোল-চৌপাড়ি ছিল। সেখানেও ছাত্রসংখ্যা একশো কুড়ি বা ততোধিক। রামবাটী গ্রামেও টোল ছিল। ঘনরাম সেখানে পড়তেন। পরবর্তিকালে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের অলংকার-শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিবাস ছিল রামবাটীর নিকট শাকনাড়া গ্রামে।

অষ্টাদশ শতাব্দের তৃতীয় পাদের দিকে রচিত একখানি 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-জায়' আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই তালিকা থেকে আমরা সেকালের রাঢ়-অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারের একটি মূল্যবান্ চিত্র অঙ্কিত করতে পারি। এতে নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ ও শিবনাথ ন্যায়বাচস্পতির নাম রয়েছে। শঙ্কর তর্কবাগীশ ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রমাতামহ বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের সমকালীন এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ বর্তমান ছিল।

এ ছাড়া, কুমারহট্টের পাই বলরাম তর্কভূষণ ও শিশুরাম তর্ক-পঞ্চাননকে ; ত্রিবেণীর রামচাঁদ তর্কভূষণ, কানাই ন্যায়বাচস্পতি ; বাঁশবেড়িয়ার বজ্রবিদ্যাবাগীশ, রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, ভৈরব তর্ক-বাচস্পতি, রাঘব তর্কভূষণ ; শান্তিপুরের মোহন বিদ্যাবাচস্পতি ; কলিকাতার চতুর্ভুজন্যায়রত্ন, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ ; শালিকার জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত ; জনাই-এর অভয়াচরণ তর্কালংকার ; চাতরার রামহরি তর্কবাগীশ ; গরলগাছার রামমোহন বিদ্যালংকার প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলীকে।

এই তালিকাটি পাওয়া গিয়েছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অধস্তন বংশধরের বাড়িতে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নিবাস ছিল দামোদরের পশ্চিম তীরে বর্তমান বর্ধমান-হুগলী-সীমান্তে দামিন্যা গ্রামে।—এ-গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বপুরুষের নিবাস বনমালীপুরের সন্নিকটে। মুকুন্দ-রামের সুপণ্ডিত বংশধরদের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষায়, সামাজিক আদান-প্রদানে বিভিন্ন স্থানের যে সকল খ্যাতনামা ভট্টাচার্যের যোগাযোগ ছিল তাঁদের নাম এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। এতে আমরা মোট আটষট্টিটি গ্রামের নাম পেয়েছি। তার মধ্যে নদীয়া জেলার তিনটি, চব্বিশ পরগণার একটি, হাওড়ার দুটি, বর্ধমানের সতেরোটি এবং হুগলীর পঁয়তাল্লিশটি। এই আটষট্টিটি গ্রামের সর্বসমেত একশো চৌত্রিশ জন ভট্টাচার্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতির পণ্ডিত ; এবং এঁরাই ছিলেন সেকালের রাঢ়ী-হিন্দুসমাজ-জীবনের নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক। এই তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেক ভট্টাচার্য মহাশয় টোল পরিচালনা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র রাঢ়ের 'ভট্টাচার্য'-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্ম-সম্পর্কে কোষ্ঠীগণনা করেন জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ। প্রমাতামহ বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত। তখন কলকাতায় টোল পরিচালনা করে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন

তাঁদের আত্মীয় জগন্মোহন ন্যায়ালংকার। ঠাকুরদাসের শ্বশুর আরামবাগের গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশ। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ, জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। সেকালের দক্ষিণ রাঢ়ের এই রকম পণ্ডিতবংশের সমবায়ে বিদ্যাসাগর-প্রতিভার উদ্ভব।

প্রায় হাজার বছর আগে দক্ষিণ দামোদর-উপত্যকায় নদী মুণ্ডেশ্বরী অর্ধচন্দ্রাকারে রামপালের উচ্ছাল ও নিদ্রাবলী সামন্তরাজ্য দুটিকে বেষ্টন করে প্রবাহিত হচ্ছিল। বর্তমানে মৃত মুণ্ডেশ্বরী খালে মাত্র পর্যবসতি। মুণ্ডেশ্বরী-খালের বাম-বাহুতে প্রবাহপথের পশ্চিম তীরে অবস্থিত বনমালীপুর গ্রাম এখনকার হুগলী জেলার আরামবাগ শহরের ছয় মাইল ঈশান কোণে। এই গ্রামের আশেপাশে খ্রীষ্টপূর্ব কুশান-যুগ থেকে তুর্কী-আমল পর্যন্ত ঐতিহ্য-পরম্পরা ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবী বা প্রত্নবস্তুর আকারে। নদীবহুল এই অঞ্চলের জনজীবনও আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। বনমালীপুরের সন্নিকটে রত্নাকর নদের তীরে দামিন্যা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ। বনমালীপুরের অদূর-দক্ষিণে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দে রাজা রামমোহন। দামোদর-তীরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামারপুকুরও এখান থেকে বেশী দূরে নয়। এই বনমালীপুর গ্রামে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃ-পিতামহের নিবাস।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম-তারিখ শকাব্দা ১৭৪২, খ্রীষ্টাব্দ ১৮২০, ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। কিন্তু এই গ্রামে তাঁর জন্মকাহিনীর প্রেক্ষাপট বিশেষ চিত্তাকর্ষক। তাঁর জন্মকালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে, এই অঞ্চলের জনজীবন, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল বাঙ্গালী-সমাজ-ব্যবস্থার ধ্রুপদী ধারায় ঐতিহ্যমণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট সমাজে পণ্ডিত পরিবারে জন্মেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

পরিবারটি ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু অভাব ছিল না নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণজনোচিত সদনুষ্ঠান-সমূহের। যে-সকল আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপের আদর্শ দেখে বাড়ির সন্তানগণ উচিত শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃগৃহে সেই আদর্শ ছিল অক্ষুণ্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র যখন জননীগর্ভে, জননী তখন উন্মাদিনী। সন্নিহিত উদয়গঞ্জ গ্রামের জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য আসন্নপ্রসবা বধূর ঠিকুজি গণনা ক'রে বলেছিলেন—বধূমাতা-নীরোগ। দেবানুগৃহীত কোনো মহাপুরুষ এঁর গর্ভে আবির্ভূত হওয়ার ফলে এই অধীরতা। শিরোমণি-মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই জননী আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ সিদ্ধযোগী এবং তীর্থপর্যটনকারী প্রবাসী। প্রবাসে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর বংশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে। তিনি স্বস্থানে ফিরে এলেন। পুত্র ঠাকুরদাসের শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তিনি পৌত্রের রসনায় অলক্তকের রক্তিম অক্ষরে তান্ত্রিক বীজমন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। লোকে ভাবে, সেই মন্ত্রেরই পূর্ণ প্রকাশ বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র। পিতামহ মহাশয়ই ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষাগুরু এবং এই নামকরণ তাঁরই।

বনমালীপুর থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী দুর্গাদেবীর দুই পুত্র ঠাকুরদাস ও কালিদাস এবং চারি কন্যা-সমেত বীরসিংহে আবাস-স্থাপনের কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর অবর্তমানে তাঁর পঞ্চপুত্র একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করছিলেন। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার ব্যবহার ভালো ছিল না। সংসারে অতিষ্ঠ ও নিরুপায় হয়ে তৃতীয় সহোদর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন।

সেই সময়ে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন উমাপতি তর্ক-সিদ্ধান্ত। অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। রামজয়ের

পত্নী দুর্গাদেবী তাঁর তৃতীয়া কন্যা। রামজয় তর্কভূষণের দেশত্যাগের পরে, দুর্গাদেবী আশ্রয় নিয়েছিলেন বীরসিংহের পিত্রালয়ে। দুর্গাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস। দুর্গাদেবী পিতৃগৃহে আশ্রয় নেবার পরে, পিতা তাঁদের পরম যত্নে লালন-পালন করছিলেন। কিন্তু দুর্গা-দেবীর ভাইদের এ-ভার সহ্য হ'লো না। ফলে দুর্গাদেবী পিতার আদেশে পিতৃগৃহের অনতিদূরে বসবাস করতে লাগলেন।

কিন্তু গরীবের সংসার চলা ভার। সেকালের দস্তুর মতো দুর্গাদেবী টেকুয়া-চরখায় সুতো কেটে লোকমারফৎ সেই সুতো বাজারে বিক্রি করে কোনোরকমে সংসার চালাতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস মায়ের কষ্ট দেখে অর্থাগমের সন্ধানে বালককালে মাত্র পনরো বৎসর বয়সে বাড়ি ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করলেন।

ঠাকুরদাসের আত্মীয় জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার কলকাতায় তখন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনি আশ্রয় দিলেন ঠাকুরদাসকে। ঠাকুরদাস বাল্যকালেই বনমালীপুরে আর বীরসিংহে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়েছিলেন। স্থির হ'লো ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করবেন। কিন্তু তখন কালবদল হচ্ছে। সংস্কৃত শিখে পেট ভরবে না। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। মোটামুটি ইংরেজি জানলে, সদাগর সাহেবদের অফিসে সেকালে সহজেই চাকরি মিলত। সুতরাং স্থির হ'লো ঠাকুরদাস ইংরেজি শিখবেন।

ঠাকুরদাসের তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছিল গোঘাট গ্রাম-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে। এই গোঘাট গ্রামটি হচ্ছে আমোদর-নদের তীরে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কামারপুকুরের কাছে। তর্কবাগীশ মহাশয় ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। ধর্ম-চিন্তা, ধর্ম-আলোচনা ও সাধনভজনে তিনি নিযুক্ত থাকতে ভালবাসতেন। সংসার-সুখ-সম্ভোগ তাঁর নিকট ছিল অকিঞ্চিৎকর। বহুকাল তান্ত্রিক মতে শবসাধনা করে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফলে, তাঁর পত্নী গঙ্গাদেবী সন্তান-সন্ততিদের

এবং পাগল স্বামীকে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সন্নিহিত দারকেশ্বরতীরে পাতুল গ্রামে। ভগবতী দেবীর আশৈশব কেটেছিল পাতুলের মাতুলালয়ে। তাঁর এই মাতুলালয় ছিল আদর্শ হিন্দু-বাড়ির ক্রিয়াকলাপ এবং রীতিনীতি ও ভাব-ভক্তির নিলয়। ভগবতী দেবীর চরিত্রগঠনে এই আদর্শ প্রধান উপাদান যুগিয়েছিল। তাঁর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ। পিতার অবর্ত্ত-মানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ছিলেন আদর্শ গৃহী। ভাই-ভগ্নীদের প্রতিপালনের ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে, তিনি পিতার সুনাম বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। সুখী হিন্দু একান্নবর্তী পরি-বারের আদর্শস্থল ছিল এই পরিবার। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল এই পরিবারের আচার-আচরণ।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী এবং অমিত শক্তির অধিকারী। একদা মেদিনীপুর যাবার পথে একটি ভালুকের আক্রমণে নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও ভালুকটিকে বধ করে রুধিরাক্ত কলেবরে বহু পথ হেঁটে তিনি মেদিনীপুরে পৌঁছেছিলেন।

সেকালে পল্লীপথে দস্যুভয় ছিল যত্রতত্র। কিন্তু রামজয় একটি লৌহদণ্ড হাতে নিয়ে নির্ভয়ে সর্বত্র গমনাগমন করতেন। তাঁর শরীরের মতো মনেও শক্তি ছিল প্রচুর। অথচ একাহারী নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান ও ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন নিরীহ লোক ছিলেন তিনি। সকলেই তাঁকে ঋষি বা যোগীর মতো শ্রদ্ধা করত। বনমালীপুরের বাড়ি ছেড়ে তিনি আট বছর ধরে দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম ও অন্য নানা তীর্থ পর্যটন করে, স্বপ্ন-দর্শনের পরে, বাড়ি ফিরে এসে বাকি সময় সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কাটিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতৃ-পিতামহের দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা, নির্ভীকতাদি সদ্‌গুণ লাভ করেছিলেন। আর

তাঁর জননীর নিকট পেয়েছিলেন, জননীর মাতুলালয়ের দয়া-দাক্ষিণ্য, পরদুঃখকাতরতা ও পরসেবার ভাব। মাতৃ-মাতুলালয়ের আচার-সিদ্ধ হয়ে তিনি দয়ার সাগরে পরিণত হয়েছিলেন। পিতৃ-মাতৃকুলের উভয়বিধ ভাব মিলে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিচিত্রভাবে গঠন করেছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, —আমরা যতই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র-বর্ণনে অগ্রসর হব, ততই পিছন থেকে তাঁর পিতৃ-পিতামহ, মাতা ও মাতৃ-মাতুল-বংশের অভিনয় দেখতে পাব।

পাঁচ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার পাঠ শুরু হয়। সে-সময়ে বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। কালীকান্ত ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন স্নেহের সঙ্গে, এবং তিনি অধিক শিক্ষা দিতে পারতেন অল্প সময়ের মধ্যে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,—'বস্তুতঃ পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শ ছিলেন।' ছাত্রদের আপন সন্তানের মতো স্নেহের চক্ষে দেখে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শিক্ষা দিতে পারাই প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ।

আট বছর বয়স পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্তের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। তিনি ছিলেন গুরুমহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র। তিন বৎসরে তিনি পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। এই গুরুমহাশয়ই ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজি-শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় আনলেন। ঠাকুরদাস যেখানে থাকতেন, তাঁর বাসার কাছেই ছিল শিবচরণ মল্লিক নামে এক ধনী সুবর্ণবণিকের বাস। তাঁর সদর-বাড়িতে একটি পাঠশালা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই পাঠশালায় দেওয়া হ'লো। তিন মাস সেই পাঠশালায় তিনি পড়াশুনা করলেন। বীরসিংহে তিন বছর এবং কলকাতায় তিন মাস পাঠশালায় পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করেন। এই

পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন স্বরূপচন্দ্র দাস। শিক্ষাদান বিষয়ে তিনিও ছিলেন নিপুণ। স্বরূপচন্দ্রের পাঠশালাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হ'লো।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভরতি হলেন। পড়তে লাগলেন ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে। এর আগে তাঁর সংস্কৃত পাঠ নেওয়া হয়নি। এখানে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসর ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পড়েছিলেন। এই ব্যাকরণ-পাঠের সময় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজের ইংরেজি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ব্যাকরণ-শ্রেণীর পাঠ শেষ করে, তিনি সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর বয়স এগারো। এই সময় তাঁর উপনয়ন হয়। সাহিত্য-শ্রেণীর শিক্ষক তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। সাহিত্য-শ্রেণীর প্রথম বর্ষে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘবপাণ্ডবীয়; দ্বিতীয় বর্ষে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত ইত্যাদি কাব্য-গ্রন্থ পড়ানো হ'তো।

সেকালে এখনকার মতো রবিবারে সংস্কৃত কলেজ বন্ধ থাকত না। প্রতিপদ ও অষ্টমীতে বন্ধ থাকত। এছাড়া দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নতুন পাঠ পড়ানো বন্ধ রাখা হ'তো।

পিতা ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের শিক্ষা শেষ করে, বীরসিংহে গিয়ে টোল খুলবেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বৃত্তির টাকা থেকে বীরসিংহে কিছু জমি কেনা হয়েছিল, এবং অনেকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথিও খরিদ করা হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয় ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ীর সঙ্গে। কন্যার বয়স তখন আট, পাত্রের বয়স চৌদ্দ।

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীর পাঠ শেষ করে পনরো বৎসর বয়সে অলঙ্কার-শ্রেণীতে ভরতি হলেন। অলঙ্কারের অধ্যাপক তখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র এক বছরের মধ্যেই

সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর ইত্যাদি অলঙ্কার-গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেন।

সেই সময়ে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন জজপণ্ডিত। তিনি সাহিত্য-দর্পণের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্রকে অদ্ভুতভাবে উত্তীর্ণ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। অলঙ্কার, ন্যায়, বেদান্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তখন ছাত্রেরা জজপণ্ডিত হতে পারতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সের বালক ঈশ্বরচন্দ্র জজপণ্ডিত হবার নিয়োগপত্রও পেয়েছিলেন।

উনিশ বৎসর বয়সে তিনি বেদান্তের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন। এখানকার অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপনায় মুগ্ধ হন। তখন স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত-শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনা করতে হ'তো। সর্বোৎকৃষ্ট পদ্য ও গদ্য রচনার জন্যে প্রত্যেক বিষয়ে একশত টাকার পুরস্কার ছিল। অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নির্বন্ধে 'সত্যং হি নমোঃ' অর্থাৎ 'সত্য কথনের মহিমা'-বিষয়ে গদ্য রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

বেদান্তের পরীক্ষা দেবার পরে তিনি ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন। সেকালের সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক—গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সকলেই এক বাক্যে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। একুশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করলেন। এই উপাধি তাঁকে প্রদান করেছিলেন তাঁর অধ্যাপকবৃন্দ। বীরসিংহের পাঠশালার গুরুমহাশয় কালীকান্ত থেকে মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পর্যন্ত সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষাগুরু বলে নিজেদের গৌরবিত ও কৃতার্থবোধ করেছেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন ইংরাজি-শিক্ষার সুপ্রচার হয়নি। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ জানুয়ারি

গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হেয়ার, হ্যারিংটন প্রমুখ ইংরেজগণ দেশীয় বহু ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আগ্রহে হিন্দু কলেজের সূত্রপাত করলেন। কিন্তু, তার স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সরকার কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তখন ইংরেজ-সরকার কেবল সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেই শিক্ষা-বিষয়ে কর্তব্যের সমাপ্তি মনে করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের আবেদনক্রমে উইল্‌সন্ সাহেবের চেষ্টায় গভর্নমেণ্ট শিক্ষা-বিষয়ে নতুনভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। এর পরের ইতিবৃত্ত সুবিদিত।

ডিরোজিও নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিকৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দ বসাক-প্রমুখ সেকালের যুবকমণ্ডলী চিন্তা ও ভাবধারায় বর্তমান বঙ্গের পিতৃস্থানীয়।

সর্বপ্রথমে যাঁরা এই নতুন ইংরেজি-শিক্ষার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন। তিনি ও তাঁরা তখন বিদ্যালয়ে—ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে এবং তাঁরা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখছিলেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ অনেকের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদ্যালয় ত্যাগ করলেন।

বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার সময়ে, উৎকৃষ্ট ইংরেজি ভাষা তাঁর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হলেও তিনি বহুল পরিমাণে ইংরেজি ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, এবং স্বয়ং ইংরেজি-শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করে, বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষার আয়োজন করলেন। এ ছাড়া, তিনি ওড়িয়া, হিন্দী ও উর্দু ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

তখন একদিকে লোকে অন্ধবিশ্বাসের অধীন হয়ে আপন ভাগ্যের নিন্দা করতে করতে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছিল; অপর দিকে, নতুন ভাব ও নতুন উদ্যমের খরস্রোত শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের আদর্শহীন অজ্ঞাত পথে নিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে, কর্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে নব্য বিদ্যাসাগর দেখলেন, একপাশে আবর্জনাপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমি, বহুরত্নের আকর হয়েও অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দৃঢ়-নিগড়ে পরিবেষ্টিত। অপরদিকে, বিচিত্র দৃশ্য সমুদ্রবক্ষ সুপ্রসারিত হয়ে তার হৃদয় মন আকৃষ্ট করেছে; কিন্তু, সে-সমুদ্রে তিমি ও মকরেরও গুপ্ত অবস্থান। ঈশ্বরচন্দ্র এই উভয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে দিব্যনেত্রে তাঁর ভাবী-সংকল্পের পথ দেখতে পেলেন। তাঁর মনের চোখ তাঁকে এই উভয় প্রকার বাধা-বিঘ্নের মধ্যে সর্বদা সুপথ দেখিয়ে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংমিশ্রণে তাঁর নতুন পথ তৈরি করে নিলেন। প্রাচ্য কুসংস্কার ও প্রাশ্চাত্ত্য আড়ম্বর পরিহার করে, নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ বীরপুরুষের উপযুক্ত পথে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষার সংযোগে যে মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি উভয় শিক্ষার মন্দভাগ ত্যাগ করে রত্ন আহরণ করেছিলেন। আপন জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আমাদের সামনে তিনি বর্তমান কালের জীবন-সমস্যার মীমাংসা করে গেছেন।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী এক প্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর তৈরি করান। এই অক্ষরের সাহায্যে হ্যাল্‌হেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হ'লো। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশের কোড্-গ্রন্থ ফর্স্টার সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। এ-থেকেই বাঙ্গালায় ছাপা গদ্যগ্রন্থের প্রথম আভাস পাওয়া গেল। ফর্স্টার সাহেবই বাঙ্গালাভাষায় সর্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। কর্ণওয়ালিশের কোড্ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়।

খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার শ্রীরামপুরের পাদরিগণের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, তার প্রচার-কর্মের সৌকর্যের জন্যে তাঁরাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুতে উৎসাহ দিয়ে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার করে, এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ-রচনার পথ প্রদর্শন করে, তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন। তাঁদেরই কৃপায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের কাজ আরম্ভ হবার কিছু পরে, এবং রাম-মোহন রায় বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিচর্যায় নিযুক্ত হবার পূর্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজে সাহেব-ছাত্রদের বাঙ্গালা ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি গদ্য-গ্রন্থ রচনা করা হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রতাপাদিত্য চরিত', ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজাবলী', ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবোধচন্দ্রিকা, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তোতাইতিহাস' রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

অনেকের ধারণা, রামমোহন বাঙ্গালা গদ্য রচনার জনক। কিন্তু, হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একথা স্বীকার করেন না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যোলো বৎসর বয়সে রামমোহন যে-গদ্য রচনা করলেন, তার আদর্শ তিনি কোথায় পেলেন? বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালের আগে থেকেই কলকাতায় ইংরেজি ও বাঙ্গালায় লেখাপড়া প্রচলিত ছিল। পুঁথিলেখার কাজও এখানে চলত। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের তখন চংক্রমণ-যুগ। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা তখন বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। এই সমকালীন পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর প্রতিভার ধারাপাতে বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য উর্বর হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'বাসুদেবচরিত'। অপ্রকাশিত 'বাসুদেবচরিতে' তাঁর প্রথম গ্রন্থরচনার সূচনা। এর পরে, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী 'বৈতাল পৈঁচিশি' গ্রন্থ থেকে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এ হ'লো তাঁর প্রকাশিত পুস্তক-সমূহের আদি গ্রন্থ। এবং এই আদি গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্শম্যান সাহেবের 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' অবলম্বন করে 'বাঙ্গলার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ' রচনা করলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'চেম্বার্স বাইয়গ্র্যাফি' অনুবাদ করে 'জীবন-চরিত' রচনা করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'চেম্বার্স রুডিমেণ্টস্ অব নলেজ' গ্রন্থের ছায়া অবলম্বন করে 'শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ' বা বোধোদয়' রচনা করেছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের উপন্যাস-ভাগ থেকে রচনা করেন 'শকুন্তলা'। এই বৎসরেই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক পুস্তক' রচনা ও প্রচার করলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন।

অতঃপর, তিনি শিশুদের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় ব্রতী হন। দুই ভাগ বর্ণ-পরিচয়, 'কথামালা' ও 'চরিতাবলী' এই বৎসরই রচনা করেছিলেন। তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থ 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য-শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' একখানি সুখ্যাত গ্রন্থ। এতে রয়েছে সহজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রদানের নির্দেশ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। মহাভারতের উপক্রমণিকা তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতেই ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সীতার বনবাস' রচনা করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আখ্যানমঞ্জরী' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্যাকরণ কৌমুদীর অপরাংশ', ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'সটীক মেঘদূত' এবং পীড়িত অবস্থায় বর্ধমানে অবস্থান করার সময় সেক্সপীয়রের 'কমিডি অব এররস' অবলম্বনে রচনা করেন 'ভ্রান্তি-বিলাস'। তাঁর বিধবা-বিবাহ ও বহু-বিবাহ

বিষয়ক-গ্রন্থ ও পুস্তিকা সুপরিচিত। এছাড়া, শিক্ষার্থী ছাত্রগণের শিক্ষালাভের সুবিধার জন্যে তিনি বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'সোমপ্রকাশের' মতো উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র প্রচারেও তাঁর দান ছিল অসামান্য। তাঁর রচনায় যেমন বিচিত্রতা, তেমনি বুদ্ধিমত্তা, সরলতা ও গাম্ভীর্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বসমেত বাহান্নখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে সতেরোখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ও উপক্রমণিকা এবং তৎপরবর্তী ব্যাকরণগুলি তাঁর প্রতিভার ফসল। সংস্কৃত নানা গ্রন্থ থেকে সার-সংকলন করে তিন তিন ভাগে 'ঋজুপাঠ' ইত্যাদি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, মেঘদূত ইত্যাদি গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁথি থেকে পাঠ মিলিয়ে সম্ভাবিত মূল গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা করেন। 'সটীক অভিজ্ঞান শকুন্তল' প্রকাশের সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের হস্ত-লিখিত গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেন, পরস্পর পাঠ মিলিয়ে মূলপাঠ নির্ণয় করে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' প্রকাশ করে-ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন পাঁচখানি। তার মধ্যে ইংরেজীতে 'বিধবা-বিবাহ' তাঁর নিজের রচনা; অপরগুলি সংকলন। বাকি ত্রিশখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। চৌদ্দখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। এর মধ্যে বর্ণ-পরিচয় ইত্যাদি কয়েকখানি তাঁর নিজের রচনা; বাকিগুলি ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনূদিত অথবা ভাবাবলম্বনে রচিত।

অবশিষ্ট ষোলোখানি গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ। বহু পরিশ্রম ও চেষ্টা করে কৃষ্ণনগর-রাজবাড়ি থেকে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করে তিনি এই তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন; বাকি তেরোখানি গ্রন্থ সাধারণ পাঠ্যপুস্তক। এর মধ্যে শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি কয়েকখানি অন্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ভাবাবলম্বনে লিখিত। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি

তাঁর মৌলিক কৃতি। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। 'বিদ্যাসাগর-চরিত' নাম দিয়ে তিনি আত্মজীবনী লিখতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে তাঁর বাল্য-কাহিনী প্রাণস্পর্শী অপরূপ ভাষায় গ্রথিত হয়েছে।

সত্যসন্ধ কোনও মানুষ আচারে-ব্যবহারে স্বদেশের ঐতিহ্য বর্জন করে চলতে পারেন না; বরং নিশ্চয়ই তা মেনে চলবেন। বিদ্যাসাগরের জীবিতকাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর মতো খাঁটি-স্বদেশী প্রতিভা তাঁর দেশের সমকালের ঐহ্যকে খোলাচোখে প্রয়োজনমাফিক মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অনুশীলন করলে, একথা অকাট্য বলেই প্রতিভাত হবে। বর্তমান প্রবন্ধে বিশদ আলোচনার অবকাশ নাই।

সমকালীন শিক্ষাপরম্পরায় আমরা সে-কালের পাঠশালার শিক্ষা-পদ্ধতির ধারাসমূহের যে আলোচনা করেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ, বোধোদয় ইত্যাদি গ্রন্থে তারই যুগোপযোগী ধারার পুনঃ প্রবর্তন করেছিলেন। শুভঙ্করীর আর্যা সংকলন করে তিনি একালের ছাত্রদের গণিত-পাঠের জন্যে সুপ্রাচীন প্রাকৃতধারার 'আর্যা' সংকলন করে 'ধারাপাত' নামকরণ করেছিলেন। এ কেবলমাত্র টেবল্ বা ছক নয়; এই হচ্ছে 'ডাণ্ডা' বা 'ডাঁড়া' অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ—কন্‌ভেন্‌শনাল্ ধারা বা রীতি।

বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগে তিনি বারোটি স্বরবর্ণ এবং চল্লিশটি ব্যঞ্জন-বর্ণ, শব্দের সঙ্গে অ-কার, আ-কারাদি স্বরবর্ণ যোগ এবং তার সঙ্গে সরল ও মিশ্র উদাহরণ দিয়েছেন। বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে—সংযুক্ত বর্ণ-পরিচয় শিক্ষাদান। সংযুক্তবর্ণের নিদর্শন হিসাবে যে সকল শব্দ তিনি সংকলন করেছেন, সে সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ আছে,—শিক্ষক মহাশয়রা ছেলেদের শিক্ষা দেবার সময় শব্দগুলি 'বর্ণবিভাগমাত্র' শেখাবেন, তাদের মানে শেখাতে হবে না। আধুনিককালে, কি ভাবে জানি না, প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে এর

উল্টো পথ ধরা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভেবেছিলেন, বর্ণ-বিভাগের সঙ্গে তার অর্থ শেখাতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই 'বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক' আর শিক্ষা-বিষয়েও 'আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।' তিনি শিশুমনস্তত্ত্ব বুঝেছিলেন ভালোমতেই। তাদের মন বুঝে, আরও নির্দেশ দিয়েছেন,—ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ, আর বর্ণ-বিভাগ শিক্ষা করতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক'—এই জন্যে মধ্যে মধ্যে এক-একটি পাঠ দেওয়া হয়েছে। কম বয়সের ছেলেদের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এমন বিষয় নিয়ে এই সব পাঠ 'অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে।' শিক্ষক মহাশয়গণ ওগুলির অর্থ ও তাৎপর্য 'স্ব-স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন।'

বিদ্যাসাগর-সংকলিত এই সমস্ত পাঠ পড়লে স্পষ্টতঃই দেখা যাবে, এতে সদাচার এবং নীতি-বোধের সরস শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ফলে, আহার এবং ঔষধ একসঙ্গে পেয়ে বাঙ্গালী শিশুগণ দীর্ঘকাল ধরে জীবন-প্রভাতেই পাকা বুনিয়াদের শিক্ষালাভ করে আসছিল। কেবল তাই নয়, এর রসও সিঞ্চিত হয়েছিল বাঙ্গালী-প্রতিভার মর্মমূলে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জল পড়িতেছে পাতা নড়িতেছে-- পদবন্ধের ছন্দ এবং রূপ শিশু রবীন্দ্রনাথের মতো ছাত্রদের সমগ্র জীবন-চেতনায় জল পড়া আর পাতা নড়ার দীক্ষা দিয়েছিল। তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল নব্য-ভারত-শিল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

পরিশেষে বলি, 'শিশুজ্ঞান চরিত্রের' পুঁথি থেকে আমরা সেকালের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা আগেই করেছি। বাঙ্গালী মায়ের হৃদয় নিয়ে, ভালোমন্দ বিচার করে, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রচলিত স্বদেশী ধারার এই সুস্থির শিক্ষণ-পদ্ধতির ভিত্তিতেই তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থের উদ্ভাবন ও ক্রমবিভাগ করেছিলেন। শুভঙ্করের আর্যায়, তথা 'ধারাপাতে' যে পাঠক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-ও দেশজ

প্রাকৃত অপভ্রংশ ধারারই অনুবৃত্তি, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমোদিত।

এখন স্বচ্ছন্দে বলা যায়, স্বদেশীশিক্ষার সংস্কারকল্পে, গ্রহণ-বর্জনের বিভাজন করে মহামনীষী বিদ্যাসাগর একটি যুগকে গঠন ও ধারণ করেছিলেন। প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর-প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। বঙ্কিম-বাবুর ভাষায় এক কথায় বলা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁরই উপার্জিত সম্পত্তি নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করছি।

আমাদের মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োজন এদেশে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তাঁর মতো যুগন্ধর মহা-জীবনের পুনরাগমনের প্রত্যাশা রেখে প্রস্তুত প্রবন্ধ সমাপ্ত করা গেল।

বর্ণপরিচয় অরুণ বসু

(তৃতীয় ভাগ)

বাঙলা মুদ্রণের ইতিহাস অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুদ্রণের অবস্থা খুব একটা সুষ্ঠু ও সুবিধাজনক হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় তখন অনেকগুলি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাদিও কম নয়। তবু ভাষা ও মুদ্রণের ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না। বানানের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ছিল চূড়ান্ত। যে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা দশও নয়, সে দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সর্বজন-ব্যবহার্য ভাষা শিক্ষা দেবেন কে? মোটামুটিভাবে একটি ব্যবহার্য আদর্শ ও রচনাপ্রণালী ও ভাষাব্যবহারের মানদণ্ড তৈরি করার কথা রামমোহনই প্রথম ভেবেছিলেন। তারপর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈজ্ঞানিক ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লিখে বাঙালীর সামনে পরিচ্ছন্ন বাঙলা লিখনের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু করলেন বলা যায়।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের প্রথম কৃতিত্ব হ'লো বর্ণমালার সংস্কার সাধন। তাঁর নিজের ছাপাখানা ছিল। ছাপানোর সমস্যাদি ও হরফ-ঘটিত সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে তথ্যাভিজ্ঞ ছিলেন। তবু তিনি মুদ্রণসমস্যাকে বড় করে দেখলেন না। তাঁর সামনে ছিল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্ন। বর্ণপরিচয়ের প্রথমে তিনি জানালেন, বাঙলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কারের এবং দীর্ঘ ৯-কারের প্রয়োগ নেই। সুতরাং ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হ'লো। তিনি অনুস্বার বিসর্গকে স্বরবর্ণ থেকে স্থানান্তরিত করে স্থান দিলেন ব্যঞ্জনবর্ণে। 'চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে।' তিনি ড় ঢ়-কে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দিলেন। ক ও ষ মিলে ক্ষ হয়, অতএব

এটি হ'লো সংযুক্ত বর্ণ। তাই অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে সেটি পরিত্যক্ত হ'লো।

বর্ণপরিচয় শুদ্ধির এই পদ্ধতির সময় বিদ্যাসাগরের স্মরণে ছিল অবশ্যই রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ। কারণ সেখানে রামমোহন ক্ষ-কে হল বর্ণে (ব্যঞ্জন বর্ণে) এবং অং অঃ অর্থাৎ অনুস্বার বিসর্গকে স্বরবর্ণে রেখেছিলেন। অবশ্য রামমোহন তাঁর ব্যাকরণের দ্বিতীয় প্রকরণে 'উচ্চারণ-শুদ্ধি এবং লিপি-শুদ্ধি প্রকরণে' জানিয়েছিলেন—

'গোড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।'

রামমোহন ব্যঞ্জন বর্ণে ড় ঢ়-এর উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্যত্র লিখেছেন—

'ড অতি গুরুতর রেফের ন্যায় ও ঢ অত্যন্ত গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন বড় খাড়া দৃঢ় গাঢ় ; কিন্তু কেবল শব্দের প্রথমে আর অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বীয় ২ উচ্চারণ ত্যাগ করে না, যেমন ডাল ঢাল গড্ডলিকা উড্ড।'

ক্ষ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

'ক্ষ বস্তুত ক ষ এই দুই অক্ষরের সংযোগাধীন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে খ ষ এই দুয়ের সংযোগের ন্যায় উচ্চারণ হয়।'

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগর দশটি পর্যায়ে য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, ণ-ফলা, ন-ফলা, ম-ফলা, রেফ, দুই অক্ষরে মিশ্র সংযোগ ও তিন অক্ষরে মিশ্র সংযোগের উদাহরণ দেখিয়েছেন। এই বর্ণপরিচয় ছাপাতে তিনি নিজের মুদ্রাযন্ত্রের জন্য হরফ তৈরি করিয়ে নেন। তার ফলে বর্ণপরিচয়ের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের নির্দেশানুযায়ী পুরনো হরফের সংখ্যা কিছু বেড়ে যায়। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত

বাঙলা মুদ্রণে বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বর্ণমালাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ই প্রায় শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে বাঙালীর বর্ণশিক্ষার আকর-গ্রন্থ। কিন্তু চিরকাল থাকবে কি? এই প্রশ্নটাই আজ সবচেয়ে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। জিজ্ঞাসাটিকে স্পষ্ট করার জন্য আমাদের এখন একটু নেপথ্যলোকে যেতে হবে।

॥ দুই ॥ বিদ্যাসাগর যে বর্ণমালাসংস্কার, বানান-প্রণালী ও ভাষাশিক্ষার পথ সুগম করলেন, তার সূচনা হয়েছিল বিদেশী মিশনারিদের হাতেই। ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরি করার চেষ্টা ১৭শ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতে আগন্তুক বিদেশী যাজকদের ভূমিকাই ছিল সক্রিয়তম। সম্ভবত পর্তুগীজরা পনরো শতকের শেষেই এদেশে মুদ্রাযন্ত্র এনেছিলেন। তামিল-মালাবার ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রণের সন্ধান ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত স্পেনীয় পাদরিরাই তামিল হরফ তৈরি করে খ্রীষ্টধর্ম-গ্রন্থ ছাপতে শুরু করেছিলেন। এই সব হরফ খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। মারাঠী-কোঙ্কনী ভাষাতেও তাদের অক্ষরনির্মাণ ও গ্রন্থমুদ্রণ প্রয়োজনের তাগিদে শুরু হয়, শিল্পগত প্রেরণায় নয়। মাদ্রাজের তাঞ্জোর-এলাকার ত্রাংকবার শহরে ১৭শ শতকে দিনেমারদের চেষ্টায় একাধিক ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাতে বাঙলা ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়াতে মুদ্রিত হ্যালহেডের বাঙলা ব্যাকরণের বইতেই প্রথম বাঙলা হরফ ব্যবহৃত হয়। হরফ তৈরি হয়ে এসেছিল বিলেত থেকে, আদর্শ পাঠানো হয়েছিল এখানকার সেরা হস্তলিপি দেখে। বোধ করি সেরা হরফ নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনের চেষ্টাতেই প্রথম বাঙলা অক্ষর নির্মিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু এই হরফ তৈরি করার জন্য একটা আদর্শ হস্তলিপি বেছে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়ে তা থেকে ছাঁচ তৈরি করে অক্ষর বানানো হ'লো, আর ছাপা শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি বিজ্ঞানসম্মত হয়েছিল? নেটিভ

ভাষার হরফ বানানোর জন্য বিজ্ঞানবুদ্ধির দরকার, অবশ্য সেদিন কেউ অনুভব করেননি। সুতরাং কোনো একজনের ব্যক্তিগত বা মস্তিষ্কগত রৈখিক আদর্শই বাঙলা হরফের মুদ্রণব্যবস্থাকে পাকাপাকি বহাল রাখল। আর সেই জন্যই বর্ণমালা ও হরফের মধ্যে গড়ে উঠল ফারাক, বানানপদ্ধতি হয়ে উঠল জটিল এবং এ মুদ্রণের সুবিধার দিকে তাকিয়ে হরফ বানানো হ'লো। বাঙালীর হাতে লেখা বাঙলা হরফ আর বিদেশী মিস্ত্রির হাতে তার ছাঁচ তৈরি আর ঢালাই—দুটোর মধ্যে কিছু ফাঁকির ব্যবধান গড়ে উঠল। স্বভাবতই সাগরপারের বিশ্বকর্মা নিজের কারিগরি কিছু চালিয়ে দিলেন আমাদের হরফ তৈরির ক্ষেত্রে। কথাটা বিশ্বাসজনক হবে হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকাংশ পাঠ করলে—

That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will be readily allowed to every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters and the variety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similiar and proportionate body throughout, with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount.

১৮শ শতকের শেষভাগে কলকাতায় ইংরাজী সাময়িক পত্রাদি প্রকাশের জন্য বেঙ্গল গেজেট প্রেস, ক্যালকাটা গেজেট প্রেস, অনারেবল কোম্পানির প্রেস, ক্রনিকল প্রেস, পোস্ট প্রেস, ফেরিস এ্যাণ্ড কোম্পানির প্রেস, রোজারিও এ্যাণ্ড কোম্পানির প্রেস প্রভৃতি ছাপাখানা ছিল। প্রধানত বিদেশী ভাষা মুদ্রণের যন্ত্র হলেও ব্যবসায়-পত্রাদির কাগজপত্র ছাপানোর জন্য এদের কাছে বাঙলা হরফ থাকত। বিলেত থেকেই সে সব দেশীয় ভাষার হরফ আমদানি হ'তো। কিন্তু অনুকরণীয় হস্তাক্ষরের অনুকৃতি না হওয়ায় সে সব হরফ সুদৃশ্য হয়নি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন বাঙলা মুদ্রণের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ

উইলিয়াম কেরি। সুতরাং তিনি এগিয়ে এলেন বাঙলা হরফ-সংস্কারের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে।

॥ তিন ॥ তথ্যানুসন্ধানে কেরি জানলেন সেকালে বিলেত থেকে হরফ-কাটা বিদ্যায় পারদর্শী এক উইলকিন্স সাহেব বাঙলাদেশেই কর্মরত। সুতরাং তাঁর সাহায্য ছাড়া বাঙলা বই ছাপানো কোনোমতেই সম্ভব নয়। শ্রীরামপুরে তখন কেরির কর্মজীবন শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় ভাষাগুলির উপর তিনি রীতিমত দক্ষ হয়ে উঠেছেন। স্বহস্তলিখিত নোটে খাতাপত্র ভরে উঠছে। লোকের মুখের ভাষা শুনে শুনে গদ্যের সংকলন তৈরি করছেন। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের কথাবার্তা চলছে ; কেরির নিয়োগও প্রায় পাকা। কিন্তু এখন দরকার মুদ্রিত গ্রন্থের। ছাপাখানা কোথায়? ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরি কলকাতায় নিলামে একটি মুদ্রাযন্ত্র কিনে নিলেন। পরে এটিকে নৌকায় করে নিয়ে এলেন শ্রীরামপুরে। হরফ কোথায় মেলে? বাজারে যে সব বাঙলা হরফ মিলল তা যথেষ্ট নয়, দেখতেও ভালো নয়। মোটামুটি বাঙলা ভাষাটা তখন কেরির রপ্ত হয়ে গেছে। সেই বিদ্যা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন বিলিতী হাতে বাঙলা হরফ কাটাটা পণ্ডশ্রম। অবশ্য প্রথমে তাতেও রাজী ছিলেন। কারণ কলেজের সেরেস্তাদার কালীকুমার রায়ের হাতের লেখা দেখে কেরি ঠিক করেছিলেন তাঁর হাতের লেখার মডেলেই হরফ কাটাতে হবে। মার্শম্যান জানাচ্ছেন যে, কেরি এক বিলিতী কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন লণ্ডনে। কিন্তু সেই উইলিয়াম ক্যাসলস কোম্পানি যে রেট পাঠালো তাতে তাঁদের চক্ষুস্থির! অত টাকা কোথায়? কালা আদমির খোঁজ করো।

খোঁজ পাওয়া গেল। উইলকিন্স নিজেই ছেনি-ধরা আর হরফ-কাটার কাজ শেখাচ্ছিলেন পঞ্চানন কর্মকারকে, কাজও জুটিয়ে দিয়েছিলেন সরকারী হরফ-ঢালাই কারখানায়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাননকে আনা হ'লো কেরির ছাপাখানায়। শুরু হ'লো পঞ্চাননের ছেনি-কাটা আর হরফ

তৈরি করা। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আরও কয়েকটি বিলিতী মেশিন কেনা হ'লো। তাই হরফ-ঢালাইয়ের পরিমাণও বেড়ে গেল। কিন্তু এই বছরই মার্চের এক অগ্নিকাণ্ডে যাবতীয় হরফ গলিত লৌহপিণ্ডে পরিণত হয়ে বাঙলা গ্রন্থ-মুদ্রণের ক্ষেত্রে এক দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলল। কেরি দমলেন না, পঞ্চাননকেও তখন নেশায় পেয়েছে। কর্মকার-শিল্পীর জামাই মনোহরেরও একটু-আধটু কাজ শেখার ইচ্ছার জন্য কেরি তাকেও নিয়ে আসতে সম্মতি দিলেন। এক বছরের মধ্যেই কর্মকার-পরিবার আবার বাঙলা হরফ বানিয়ে ফেললেন। এবার হরফ-ছাঁচ একটু বদলালো। আগে ই ঈ উ ঊ-এর মাথার দিকের টিকিগুলো ছিল হ্রস্ব, এবার বেশ বড় হ'লো। র ছিল আগে পেটকাটা ব, এখন বিন্দু যুক্ত হ'লো। অনুস্বার ছিল আধা-বিসর্গ, এখন হ'লো যথারীতি অনুস্বর। ছাপা-বাঙলা কাগজে ঝকঝক করে উঠল।

নতুন বাঙলা হরফ অনেককেই মুগ্ধ করল। প্রেসের কাজ চলছে পুরোদমে, অর্ডারও আসছে বহুতর। কলকাতার অন্যান্য প্রেসের বাঙলা হরফ এখন পাঠকদের কাছে বেমানান লাগল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারিক রামকমল সেন অনেকদিনের পরিশ্রমে একটা অভিধান সংকলন করেছিলেন। কলকাতার কোনো প্রেস থেকে তার বেশ কিছু অংশ মুদ্রিতও হয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বই ছাপানোর আনন্দে তিনি পূর্বের মুদ্রিত অংশ, খরচ হওয়া সত্ত্বেও, বরবাদ করে দিলেন।

মোটের উপর পঞ্চানন কর্মকার এবং তার জামাতা মনোহর কর্মকারের ছেনির ঘায়ে বাঙলা হরফের যে রূপ নির্মিত হয়েছিল, বাঙলা মুদ্রণে সেই রূপই আজ পর্যন্ত চালু আছে। তাঁরা হরফ কেটেছিলেন সেদিনের পুঁথির লেখার মার্জিত রূপের আদর্শে। আর বাঙালী হাতের-লেখা শিখল সেই ছাপা-হরফ দেখে। মুদ্রিত হরফ এসে আমাদের আবহমান কালের হাতের লেখার পুঁথিগত আদর্শকে হটিয়ে দিল। বাঙালীর হাতের লেখার ছাঁদ গেল বদলে। বাঙালীর

হস্তাক্ষর কর্মকার-পরিবারের নির্দেশে গড়ে উঠল। কিন্তু সেটা কি ঠিক হয়েছিল?

ঠিক কি বেঠিক, আজ এই প্রশ্নের মূল্য নেই, উত্তরও অবান্তর। তাঁরা ছিলেন কর্মী, সাহিত্যিক নন, ব্যবসা করতে বসে মনিবের অর্ডার মাফিক কাজ করেছেন। মুদ্রণের সুবিধাই ছিল তার মধ্যে প্রধান। জর্জ স্মিথের লেখা, কেরির জীবনী ও অন্যান্য নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরবর্ণ ব্যবহারের যে দূরত্ব ছিল পঞ্চানন অনায়াসে তা দূর করেন। শুধু বাঙলা নয়, তাঁরা আরও বহু ভাষার হস্তলিপি দেখে এইভাবেই হরফ তৈরি করেছিলেন।

॥ চার ॥ বিদ্যাসাগর বাঙলা অক্ষর সংস্কার করতে বসে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে অক্ষরগুলিকে সাজালেন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যোগে বিভিন্ন রূপের উদাহরণ দেখালেন, নানা যুক্তবর্ণের দৃষ্টান্ত দিলেন। কিন্তু হরফের পুরো চেহারাটা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে ভাষায় জটিলতা বেড়েছে, বানানে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, নতুন হরফ নির্মাণের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নতুন কালের হরফ-কর্মকাররা তাই কালের প্রয়োজনে নতুন হরফ কেটে ছাপা-খানার খোপের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। এইভাবে বাঙলা ব্যবহার্য হরফের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ-শোর মতো। বিদেশী শব্দ বাঙলায় প্রবেশ করার ফলেও নতুন অক্ষর সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্ণ-পরিচয়ে এখনো প্রবেশ করেনি। সুতরাং অক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করে মুদ্রণের সরলীকরণের কথা অনেকেই ভাবতে লাগলেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় নাকি নতুন পরিকল্পনায় হরফ তৈরি করে স্বয়ং মুদ্রণের সুবিধার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলো লাইনো-টাইপ। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় লেখার ২৯ বছর পরে বিদেশে লাইনো-টাইপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িক পত্রে লাইনো-টাইপ ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষেও উনিশ শতকের শেষ দিকেই লাইনো মেশিন এসে গেছে। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় সেই ব্যবস্থার ব্যবহার করা তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল। তবু বছর চল্লিশ বাদে কলকাতার সংবাদ-পত্রগুলি বাঙলায় লাইনো হরফ মুদ্রণের চেষ্টায় যখন সার্থক হ'লো তখন বাঙলা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আর এক যুগান্তর এল। সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকায় এই লাইনো হরফ এনে ফেললেন। সংবাদপত্র লাইনো মেশিনে ছাপানোর ফলে তার মুদ্রণের উন্নতি হ'লো, কাটতি বাড়ল, পরিবেশনে বৈচিত্র্য এল, পাঠক বাড়ল। তারপর থেকে পাঠ্যগ্রন্থও লাইনো মেশিনে ব্যাপকভাবে মুদ্রিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তক সেদিন আশা করেছিলেন—

'এদেশে যে বাঙলা টাইপ প্রস্তুত হয়, তাহাও শীঘ্র নূতন পদ্ধতিতে গঠিত হইবে। এবং তাহার ফলে ছাপাখানার খরচ কমিবে, সময় সংক্ষেপ হইবে, পুস্তকাদির মূল্য কমিবে এবং দেশে শিক্ষার প্রসার হইবে। নূতন যুক্তাক্ষর-গুলি শিক্ষা করা সহজ, সেজন্য শিশুদেরও সুবিধা হইবে।

বলা যেতে পারে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের যুগ সংবাদপত্রের যুগের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কারণ এই নতুন মুদ্রণব্যবস্থা আমাদের কাছে নতুন বর্ণপরিচয় ঘোষণা করল প্রথম ও দ্বিতীয় দুই ভাগেই। বাঙলার চিরকাল-প্রচলিত অক্ষর সংস্কার করতে বলে সংস্কর্তা জানালেন—

'অক্ষর সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের মূল নীতি এই—(১) ছাপার টাইপের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া আবশ্যক। (২) প্রচলিত বহু অক্ষরের বিশেষত যুক্তাক্ষরের রূপান্তর আবশ্যক, যাহাতে অক্ষর পূর্বাপেক্ষা সুবোধ্য হয়, অক্ষরের প্রত্যেক অংশ বুঝিতে পারা যায় এবং টাইপ যোজনা সহজ হয়। (৩) প্রথম উদ্যমেই সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়, জনসাধারণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে বদলাইতে হইবে। (৪) টাইপ এমন হইবে যে, পাশাপাশি সাজাইলেই চলিবে। এক

টাইপের শাখা অন্য টাইপের মাথায় বা নীচে বসিবে না। (৫) সংস্কারের ফলে নতুন অক্ষরের রূপ কিছু অদ্ভুত মনে হইবে। কিন্তু শীঘ্রই অভ্যাস হইয়া যাইবে। কতকগুলি অক্ষর দেখিতে ভালো লাগিবে না। কিন্তু মুদ্রণসৌকর্যের জন্য ত্রুটি আপাতত সহ্য করিতে হইবে। (৬) নবকল্পিত অক্ষরের দোষগুণ ব্যবহারকালে ধরা পড়িবে এবং তদনুযায়ী ক্রমশঃ সংশোধনের ফলে অক্ষরের উপযোগিতা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইবে।'

সমস্ত ব্যাপারটা মুদ্রাকরের দিক থেকে দেখা এবং তাই চাপিয়ে দেওয়া হ'লো বাঙালী পাঠক ও শিক্ষার্থী শিশুর উপর। অবশ্যই ব্যবস্থাটি সুবিধাজনক এবং সে সুবিধা মেনে নিলে ভাষাশিক্ষার প্রগতি অবধারিত। কিন্তু মূলনীতিগুলির মধ্যেই হেত্বাভাস রয়েছে। ছাপার টাইপের 'সংখ্যা যথাসম্ভব কম' হওয়াটা ব্যবসায়িক প্রয়োজন, 'অক্ষর সুবোধ্য করা' শিল্পের প্রয়োজন। দুয়ের মধ্যে ভেদ আছে। তাঁরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনকে শৈল্পিক প্রয়োজন বলে চালাতে চেয়েছেন। যুক্তাক্ষরের সুবোধ্যতা বোঝানোই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কর্তা ঠিকই বলেছেন, যেন 'টাইপ যোজনা সহজ হয়।' অক্ষরের প্রত্যেক অংশ বুঝিতে পারা যায় এই সূত্র মেনে নিলে লাইনো-টাইপ কেন জ্ঞ ঞ্জ ক্ষ প্রভৃতি হরফকে পরিবর্তিত করল না, তার উত্তর কোথায়? ৪নং মূলনীতিতে বলা হয়েছে যে, টাইপ পাশাপাশি সাজানো চাই, 'মাথায় বা নীচে বসিবে না'—কিন্তু লাইনো-টাইপ কতকগুলি অক্ষরের ক্ষেত্রে সে নীতি লঙ্ঘন করেছে কেন? ৫নং নীতি 'নূতন অক্ষরের রূপ কিছু অদ্ভুত মনে হইবে', কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, সেই অদ্ভুত রূপ না ঘটানোর জন্যই জ্ঞ ঞ্জ ক্ষ অক্ষরগুলি বদলানো হয়নি।

লাইনো হরফ-ব্যবস্থা আনন্দবাজারে প্রবর্তনের দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—

'ইহার ফলে বাঙলার গৌরব বাঙলা-ভাষা বিদেশীদের পক্ষে শিক্ষা করা

সম্ভব হইবে। বাঙলা অক্ষরের অসুবিধার জন্য বিদেশীয়েরা উহা সহজে শিক্ষা করিতে পারিত না। সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে।'

যেন বিদেশীদের ভাষা শিক্ষাই বাঙলা ভাষার চূড়ান্ত সমস্যা ছিল। বাঙালী সন্তানের পক্ষে তার মাতৃভাষা শিক্ষা সহজতর হ'লো কি না, সে বিষয়ে কেউ ভাবলেন না। শেষ ভাবা বিদ্যাসাগরই ভেবেছিলেন। অথচ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই নতুন হরফ কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি করল। সিগনেট প্রেস অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা ছাপিয়েছেন লাইনোতে। তাতে কণ্ব বানানে মূর্ধন্য ণ নেই, আছে কন্ব কারণ লাইনোতে ণ+ব কোনো চিহ্ন ছাপানোর ব্যবস্থা নেই। ট ঠ ড ঢ এর সঙ্গে ণ হয়, ন হয় না। সুতরাং ণ+ট ঠ ড ঢ এগুলির ক্ষেত্রে ণকে ভুল করার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কণ্ব শব্দের জন্য একটি নূতন হরফ বাড়ানো ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক নয়, ব্যাকরণ যাই বলুক, বিদ্যাসাগর যাই লিখুন। প্রশ্ন এই, শিশুর পক্ষে তা কি শিক্ষণীয়?

আজ যদি বর্ণপরিচয় পুরোনো হরফে ছাপানো হয়, আর তার পরের স্তর থেকেই শিশুশিক্ষার গ্রন্থগুলি লাইনো হরফে ছাপানো হয়, তাহলে লেখার হরফ ও পড়ার হরফের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়েই যাবে। শিশু শিখবে ক্ত ন্ধ, কিন্তু সেই বানান সে কোথাও খুঁজে পাবে না। তাহলে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় লাইনো হরফে ছাপানো শুরু করা হোক। এবং শিশুদের সেই বানানই লিখতে শেখানো হোক।

সে ক্ষেত্রেও সমস্যা। এখনো দুই বাজার অর্থাৎ দুই রীতির হরফ তথা দুই মুদ্রণ পাশাপাশি রয়েছে এবং থাকবেও দীর্ঘদিন। এমন কি সংবাদপত্রে বড় হরফে (যে মাপের অক্ষর প্রত্যহ ব্যবহৃত হয় না) আজও কোনো খবর থাকলে পুরাতন বানানই চোখে পড়ে। এমন কি লাইনো হরফেও বানানের সামঞ্জস্য নেই, ঐক্য নেই, একাক্ষরবর্তিতা নেই, সুতরাং এ নৈরাজ্যের শেষ কোথায়? শিশুকে আমি কোন বানান শেখাবো? অন্যগুলি কেন শেখাবো না? বিদ্যাসাগর মহাশয় এ প্রশ্নের কী জবাব দিতেন? বাঙলা বানানের ক্ষেত্রে এই সব সমস্যা সমাধানের উপায় কী? বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই নিয়ে ভেবে দেখবেন কি?

'তুমি ঈশ্বর দেখতে চাও? আমি তোমাকে এখনি দেখিয়ে দিতে পারি।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'গুণদর্শনই ঈশ্বরদর্শন।'

শুধু গুণ দেখো। যে পরিমাণে গুণ বিকশিত, সেই পরিমাণে ঈশ্বর প্রকাশিত। জল কোথাও ধানের শিষে শিশির বিন্দু, কোথাও গেড়ে-ডোবা, কোথাও সরোবর-দীঘি, কোথাও হ্রদ, কোথাও নদী, কোথাও সমুদ্র। জল দেখো। কোনোখানে প্রদীপ, কোনোখানে মশাল, কোনোখানে বা আবার দাবানল। আগুন দেখো।

যেখানেই গুণ দেখেন, সেখানেই মাথা নোয়ান ঠাকুর। সে বীণকার মহেশ সরকারই হোক বা বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরই হোক।

কাশীতে এসেছেন। মথুরবাবুকে বললেন, 'মহেশের বীণা শুনবো।'

কোনো একটা এঁদো বিশ্রী গলিতে মহেশের বাসা। সেখানে মথুরবাবুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ গেলে মথুরবাবুর মান থাকে না। তাই মথুরবাবু বললেন, 'বেশ তো, খবর পাঠাই মহেশকে, আমার বৈঠকখানায়ই সে আসর জমাক।'

মথুরবাবুর নিমন্ত্রণ পেলে মহেশ কৃতার্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠাকুর থ বনে গেলেন। বললেন, 'সে কী কথা? মহেশ কেন আসতে যাবে? আমি যাবো তার বাড়ি। তার বাড়ি তো এখন তীর্থ, সেখানে স্বয়ং সরস্বতীর আবির্ভাব। আমি সেখানে গিয়ে আমার প্রণাম রেখে আসবো। সেখানে তার বাজনাই তো শুনবো না, দেখবো বীণা-পাণিকে। সে আসবে না। আমি যাবো। আমিই পিপাসু। আমিই তীর্থঙ্কর।'

তাই সেদিন বললেন মাষ্টারমশাইকে, আমার বিদ্যাসাগরকে দেখতে বড়ো সাধ হয়। একদিন নিয়ে যাবে তার কাছে?'

কতো গুণ! কতো দয়া!

একটা ঝাঁকামুটে কলেরা হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, তাকে কোলে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখে বন্ধ করেছে দুধ খাওয়া। ঘোড়ার কষ্ট দেখে চড়ে না আর ঘোড়ার গাড়ি। মায়ের ইচ্ছা-পূরণ করতে সাঁতরে পার হ'লো দামোদর। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অনৈক্য হতেই এক কথায় ছেড়ে দিলো চাকরি, কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ। আর কতো বড়ো পণ্ডিত, বিদ্যায় কী অগাধ অনুরাগ!

বিদ্যাই তো সব! বিদ্যা থেকেই ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম। বিদ্যা থেকেই বিনয়, অনহঙ্কার, শরণাগতি। বিদ্যাই ঈশ্বর মন্দিরে শেষ তোরণ।

বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন মাষ্টারমশাই। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চান।'

'পরমহংস?' বিদ্যাসাগর অবাক মানলেন। 'কেমনতরো পরমহংস? গেরুয়া-টেরুয়া পরে নাকি?'

মাষ্টারমশাই বললেন, 'আজ্ঞে না। সে এক আশ্চর্য পুরুষ। সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী, আবার সংসারী হয়েও সন্ন্যাসীর শিরোমণি। লালপেড়ে কাপড় পরেন, গায়ে জামা রাখেন, পায়ে বার্নিস করা চটি জুতো। গাছতলায় ধুলোমাটিতে পড়ে থাকেন না, রাসমণির কালী-বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে বাস করেন, তক্তাপোশে বিছানা পেতে দিব্যি মশারি খাটিয়ে শোন—'

'তাহলে বৈশিষ্ট্য কি?'

'একেবারে বালকের মতো। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না, সর্বক্ষণ মা নামে মাতোয়ারা।'

'নিয়ে এসো একদিন।'

খালের পোল পেরিয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে পড়েছে

ঘোড়ার গাড়ি। এবার পড়বে বাদুড়বাগান। এর পরেই বিদ্যার সমুদ্র।
ভাবাবেশ হ'লো ঠাকুরের। এখন আর অন্যকথা ব'লো না, শুধু বিদ্যার কথা বলো। যে জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অক্ষয় পুরুষকে জানতে শেখায়, সেই বিদ্যা।
ফটক পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কোনো দোষ হবে না?'
'না, দোষ হবে না।' বললেন মাষ্টারমশাই, 'আপনার কিছুতে দোষ নেই। আপনার দরকার নেই বোতামে।'
'নেই!' নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর।
এই বিদ্যাসাগর! পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতো, গায়ে হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। প্রসন্ন প্রশস্ত মুখ, উন্নত ললাট, শুভ্র দাঁত। খর্বদেহ সংহত তেজঃপুঞ্জ।
বিদ্যাসাগরকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।'
'আমি সিদ্ধ?' থমকে গেলেন বিদ্যাসাগর। 'কৈ, আমি তো সাধন-ভজন করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, ঘুরি না তীর্থে-ঘাটে, আমি—আমি সিদ্ধ হলাম কি করে?'
ঠাকুর বললেন, 'সিদ্ধ হতে হলে সাধন-ভজন করতে হয় না, যেতে হয় না মঠে-মন্দিরে।'
'তবে?'
'সিদ্ধ হলে কি হয়? আলু-পটল যখন সিদ্ধ হয় তখন কি হয়?' সহাস্য বয়ানে জিগ্যেস করলেন ঠাকুর, 'বলো কি হয়? নরম হয়। তোমার হৃদয়ও পর-দুঃখে দ্রবীভূত হয়েছে। তুমি নরম হয়েছো। সুতরাং তুমি সিদ্ধ।'
পরও যা পরমও তাই। তুমি পরের দুঃখে কাঁদছো, তার মানে তুমি ঈশ্বরের দুঃখে কাঁদছো। নইলে যে সত্যি পর তার মধ্যে তুমি তোমার

আপনজনকে দেখছো কি করে? যে আর্ত সেই তোমার পরমাত্মীয়, তোমার ঈশ্বর। পরোপকারই ঈশ্বর সাধনা।

'কিন্তু জানেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'কলাই বাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তুমি কি বাটা ডাল? তুমি আস্ত ডাল। তুমি একটা গোটা মানুষ। যারা শুধু পণ্ডিত তারাই দরকচাপড়া। যেমন খুব উঁচুতে উঠেও শকুনের ভাগাড়ের দিকে নজর তেমনি শুধু-পণ্ডিতগুলো উঁচুতে উঠেও বিষয়েই আবদ্ধ। কিন্তু তুমি তো শুকনো ডাঙা নও, তুমি সাগর। শুষ্ক পণ্ডিত নও, তুমি বিদ্যার অম্বুনিধি। বিদ্যা থেকেই দয়া, বিদ্যা থেকেই ভক্তি, বিদ্যা থেকেই বৈরাগ্য।'

একঘর লোক শুনছে মুগ্ধ হয়ে।

'তাই', বললেন ঠাকুর, 'আজ বড়ো আনন্দের দিন। আজ সাগরে এসে মিললাম। এতোদিন শুধু খাল-বিল, নদ-নদীই দেখেছি, আজ আমার সমুদ্র দর্শন।'

'সাগরে যখন এসে মিললেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'তখন কিছু লোনা জল নিয়ে যান।'

'লোনা জল কেন? তুমি ক্ষীর-সমুদ্র।'

'আর তুমি? তুমি অমৃতের পারাবার। গুণী না হলে কি গুণ দেখে? ভালো না হলে কি ভালো বলে?'

'তোমার মধ্যে দেখছি আমি ঈশ্বরের শ্রী, সমস্ত রূপিণী বিদ্যামূর্তি।'

আসলে মানুষের শুধু দুটো দুঃখ। এক দুঃখের নাম অহঙ্কার, আরেক দুঃখের নাম পরশ্রীকাতরতা।

ঠাকুর বললেন, 'অহঙ্কার যখনই মনে এই জিজ্ঞাসা আনবে তখনই জাগবে দীনতা। অহঙ্কারের উৎখাত হবে।'

যদু মল্লিক বললো, 'তুমি হরি-হরি করতে পারো, আমি কেন টাকা-টাকা করতে পারবো না? টাকার মধ্যে কি ঈশ্বর নেই?'

ঠাকুর বললেন, 'বল্, ঈশ্বরের টাকা তোর টাকা নয়। তোকে অবলম্বন করে ঈশ্বর বিত্তরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই এ তোর কৃতিত্ব নয়, এ ঈশ্বরের কৃপা। যখন নিজের সাফল্যে ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কৃপা দেখবি, তখন আর কিসের অহঙ্কার?'

তেমনি পরশ্রী মানে পরমের শ্রী। পরমের শ্রীকে দেখে কি কেউ কাতর হয়? এক আকাশ তারা বা এক মাঠ ফুল কি মানুষকে দুঃখিত করে? কখনো না—উল্লসিত করে। গহন পার্বত্য অরণ্যে একটি কলস্বরা নির্ঝরিণী, আবিষ্কার করলে মানুষ করতালি দিয়ে ওঠে। ভোরে-জাগা এক গাছ পাখির কাকলি শুনে কূল-ভাঙা গান জাগে হৃদয়ে। কোথাও তিনি বিত্তের শ্রী, বিদ্যার শ্রী, শক্তির শ্রী, দীপ্তির শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন। তাই পরশ্রীতে কাতর না হয়ে আনন্দিত হও। পরশ্রী-কাতর নয়, পরশ্রী-আনন্দিত।

'তাই যদু মল্লিকের মধ্যে আমি টাকা দেখি না, বৈভবরূপী বিভুকে দেখি। শ্রীদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।'

'কী ব্রহ্ম?' জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

'ঐটিই মজা।' বললেন ঠাকুর, 'আর সব বস্তু মুখে আনা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

'আর সব বস্তু মুখে বর্ণনা করা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অবর্ণনীয়। কোনো রসনার সাধ্য নেই তার স্বাদের ব্যাখ্যা করে। তার সংজ্ঞা দেয় বা তার রূপরীতি জানায়-বোঝায়। সব তন্ত্র-মন্ত্র, শাস্ত্র-দর্শন এঁটে হয়ে গিয়েছে, তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, বলা হয়েছে, নির্ণয়-নিরূপণ হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্চারিত, অকথিত, অনিরূপিত। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

যে বোঝবার নয় তাকে বোঝানো। যাকে রসনায় আনবার নয় তাকে বসানো হ'লো হৃদয়ে।

'কিছু খাবার দিলে কি ইনি খাবেন?' অনুচ্চ স্বরে মাষ্টারমশাইকে জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

শুনতে পেয়েছেন ঠাকুর। সরল খুশীতে বলে উঠলেন: 'দাও না।'

ব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগর অন্তঃপুরে ঢুকলেন। নিয়ে এলেন একথালা মিষ্টি। বললেন, 'এ খাবার বর্ধমান থেকে এসেছে।'

'যেখান থেকেই আসুক, মধুর সব সময়েই মধুর।' ঠাকুর হাত বাড়িয়ে নিলেন সেই থালা।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন ঈশ্বর কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই।' খেতে খেতে বলছেন ঠাকুর: 'তাঁর যেখানে যেমন খুশি। পিঁপড়েতেও শক্তি আবার হাতিতেও শক্তি। একজন পালিয়ে যায়, আরেকজন হারিয়ে দেয়। নইলে তোমার কাছে আসি কেন? অন্যের তুলনায় তোমার দয়া বেশী, বিদ্যা বেশী, হৃদয় বেশী—তাই। নইলে তোমার তো আর শিং বেরোয়নি বা লেজ গজায়নি। আকাশের দিকে তাকাই কেন? না, সেই তো বৃহতের শেষ সীমা।'

ঠাকুর থামলেন। একটু হেসে বললেন, 'এ-সব যা বলছি, কিছুই অজানা নয়। তবে কি জানো? তোমার খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কতো কি রত্ন আছে তা বরুণ রাজাই জানে না।

'অনেক বাবু আছেন যাঁরা বাড়ির চাকর-বাকরেরই নাম জানেন না, বলতে পারেন না বাড়িতে কোথায় কি জিনিস আছে। আজেবাজে জিনিস নয়, এমন কি দামী দামী জিনিস। যার জিনিস নেই সে গরীব নয়, যার জিনিস থেকেও জিনিসের জ্ঞান নেই সে-ই যথার্থ গরীব।'

ঠাকুরের খাওয়া হ'লো।

ঠাকুর বললেন, 'একবার যাবে রাসমণির বাগান দেখতে?'

'যাবো বৈকি।' বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এলেন আর আমি যাবো না?'

ঠাকুর ছি ছি করে উঠলেন। বললেন, 'আমার কাছে নয়, আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। যাবে গঙ্গাতীরে রাসমণির বাগান দেখতে।'

'সেকি কথা?'

'ওহে, আমি হচ্ছি জেলে ডিঙি। খালে-বিলেও যেতে পারি, বড়ো

নদীতেও যেতে পারি।' বললেন ঠাকুর, 'আর তুমি হচ্ছো জাহাজ। কি জানি, যদি যেতে গিয়ে চড়ায় ঠেকে যাও।'

'না, ঠেকবো কেন? এখন তো ভরা বর্ষা।'

'হ্যাঁ, যদি নবানুরাগের বর্ষা নামে তাহলে আর ভয় নেই। তখন সর্বত্র উত্তাল-জলের উচ্ছলতা। তখন সব চড়া সব অহং-ঢিপি জলে ডোবা। তখন নেই আর মান-অপমান, নেই আর আমি-তুমি। তখন সব একাকার।'

ঠাকুর উঠলেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন, 'যদি জানলে ভালবাসা এসেছে তখনই জানবে ঈশ্বর এসেছেন।'

করুণাসাগর

মন্মথ রায়

(একাঙ্কিকা)

[১২৯৮ সালের ১লা শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানস্থিত কলিকাতার বাসভবন—সন্ধ্যা। রোগশয্যায় শয়ান বিদ্যাসাগর। দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রবেশ। তাঁর হাতে কিছু কাগজপত্র।]

সুরেশ ॥ দাদু!

বিদ্যাসাগর ॥ কি দাদু?

সুরেশ ॥ এখন কেমন বুঝছ?

বিদ্যাসাগর ॥ জ্বর বেড়েছে, কিন্তু অন্যসব যন্ত্রণা কমেছে।

সুরেশ ॥ তাহলে বলতে হবে, ডাক্তার সালজারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই ফল হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর ॥ ডাক্তার সালজারের ঔষধ আর খাচ্ছি না। নিজের চিকিৎসা নিজেই করছি। ফল যা হবে তাও জানি। আজ কত তারিখ সুরেশ?

সুরেশ ॥ ১লা শ্রাবণ।

বিদ্যাসাগর ॥ তারিখ বলতে সালটাও বলবে।

সুরেশ ॥ ১২৯৮ সাল।

বিদ্যাসাগর ॥ আমার জন্ম ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন। বয়সটা আমার কত হ'লো আজ?

সুরেশ ॥ (গণনা করিয়া) ৭০ বৎসর, ৯ মাস, ১৯ দিন।

বিদ্যাসাগর ॥ গীতায় একটা শ্লোক আছে, পড়ে দেখ। 'বাসাংসি জীর্ণানি'—বস্ত্রটি জীর্ণ হয়ে গেছে। আর টিকবে না। ওরে, সেই কানা-খোঁড়া গায়কটা এসে গেছে। গায়কটার গলা শুনছি—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে, 'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন।' ওকে ডেকে আন তো।

সুরেশ ॥ ওর গান শুনতে চেয়েছ বলে মা তো ওকে ডেকেই এনেছে।

মা ওকে জলপান দিয়েছে, খেয়েই এখানে আসবে। ততক্ষণ আমার এই রচনাটা তোমাকে একটু শুনতে হবে।

বিদ্যাসাগর॥ কি রচনা ?

সুরেশ॥ তোমার বই-এর ভাণ্ডার খুঁজে খুঁজে, এখনকার বড় বড় সাহিত্যিকরা তাঁদের যে সব বই তোমাকে উৎসর্গ করেছেন সেগুলি সংগ্রহ করেছি। আর তা থেকে তোমার সম্বন্ধে তাঁদের মতামতটা সংকলন করে আমি তোমার একটা মূল্যায়ন করছি।

বিদ্যাসাগর॥ কি হবে তাতে ?

সুরেশ॥ তুমি যে কত বড় সেটা আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই। আমি তোমার বিরাট জীবনের কতটুকু দেখেছি! যেমন, কবি মধুসূদন তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের মঙ্গলাচরণে লিখেছেন, 'বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।' বঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন 'স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরমারাধ্যবরেষু। আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া।' 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যপ্রণেতা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন দয়ার সাগর—পূজ্যতম—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'সীতার বনবাস' নামক কাব্যনাট্য গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন, আচার্য আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি। বিপন্ন রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত ও অনাহারক্লিষ্ট দুঃখী নরনারীমণ্ডলী আপনাকে দয়ার সাগর উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর॥ থাক্ থাক্। আমার জ্বরটা বাড়ছে, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

সুরেশ॥ বেশ, থাক। তুমি শুধু বল ইংরাজী প্রশংসাপত্রটির আমি যে বঙ্গানুবাদ করেছি সেটা ঠিক হয়েছে কি না—

—'ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে

রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা-বিবাহ পক্ষীয় দলের অগ্রণী এবং সমাজ-সংস্কারপ্রিয় হিন্দুগণের পরিচালক বলিয়া এই প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতেছে। (স্বাক্ষর) রিচার্ড টেম্পল। ১লা জানুয়ারি, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।'

বিদ্যাসাগর॥ অনুবাদ ঠিকই হয়েছে সুরেশ। কিন্তু এসব শুনে দেখছি আমার জ্বর বাড়ছে। তোমাকে কয়েকটি চিঠি খুঁজে বের করতে বলেছিলাম, তা না করে—

সুরেশ॥ তাও কিছু পেয়েছি দাদু, এই নাও।

বিদ্যাসাগর॥ মার চিঠি পেয়েছ?

সুরেশ॥ হ্যাঁ দাদু, এই তো—শুভাকাঙ্ক্ষিনী কাঙালিনী তোমার বীরসিংহা জননী। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল।

বিদ্যাসাগর॥ চিঠির শেষ ক'টা লাইন একবার পড়তো।

সুরেশ॥ 'যে মেয়ে দিগ্‌বিজয়ী বেটা পেটে ধরেছে, সেই অভাগীই বেটার জন্য কেঁদেছে, আমাকেও তোমার জন্য কাঁদতে হচ্ছে। সুনীতি ধ্রুবের জন্য কেঁদেছে, কৌশল্যা রামের জন্য কেঁদেছে, আমাকেও তোমার জন্য কাঁদতে হচ্ছে। তাদের ছেলেরা তাদের মাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে কাঁদায়নি। তাদের ছেলেরা মা-বাপের কথা ঠেলতে পারে নাই। তুমি বাবা, আমার এই কথাটি রাখ, এক-একবার আমাকে দেখা দিয়ে যাও। আমি গয়নাপাতির জন্য তোমাকে বিরক্ত করব না। কেবল কোলে করে প্রাণ শীতল করব।'

বিদ্যাসাগর॥ হায়—হায়, এমন ডাকেও আমি সাড়া দিইনি।

সুরেশ॥ কেন দাদু?

বিদ্যাসাগর॥ কারণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু এমন আমার অহংকার যে, বলতে সেটা বাধে। কিন্তু তার শাস্তিও আমি পেয়েছি সুরেশ। কাশীতে পিতৃদেবের অসুখের সংবাদ পেয়ে ১২৭৭ সালে আমরা সবাই কাশীতে ছুটে যাই। মার আর আমাদের সেবা-শুশ্রূষায় বাবা সেরে

উঠলেন। আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু ঠিক দুটি মাস কাশীবাস করে ভগবতী মা আমার বিষম বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি আমি। কত মান-অভিমানই না ছেলে আর মায়ের মনে জমেছিল। যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

সুরেশ॥ চিঠি পড়ে বুঝছি গয়নাপাতির লোভ ছিল খুব বড়মার। তাও আর তবে তাঁকে দেওয়া হয়নি, না?

বিদ্যাসাগর॥ গয়নাপাতির জন্য তোমার বড়মার যে লোভ ছিল তেমন লোভ পৃথিবীর আর কোন মহিলার ছিল বা আছে বলে জানি না। গয়না বলতে তিনি বুঝতেন আমার স্থাপিত গ্রামের বিদ্যালয় আর পাতি বলতে তিনি বুঝতেন আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়। শীতের সময় আমার কাছে কলকাতায় চিঠি লিখে গাদাগাদা লেপ চেয়ে নিয়ে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে বলতেন, এবার আমার ছেলে আমাকে এই গয়না পাঠিয়েছে। তা এত কি হবে! আমি তোমাদের বিলিয়ে দিচ্ছি। বুঝলে দাদু, এই ছিলেন আমার মা।

সুরেশ॥ তা এমন মায়ের ডাকেও তো সাড়া দিলে না তুমি। যাই বল, তোমার মান-অভিমানটা বড্ড বেশী। নইলে, তোমার একমাত্র ছেলে আমার ঐ নারায়ণ মামাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করতে পারলে?

বিদ্যাসাগর॥ উচ্ছৃঙ্খল হলে তোমাকে ত্যাগ করতেও আমার বাধবে না দাদু।

সুরেশ॥ ওরে বাবা, না না, উচ্ছৃঙ্খল আমি কেন হব? মামার অবস্থা যা দেখছি তাতেই বুঝছি। কত কান্নাকাটি করে মামা তোমার কাছে নাকি চিঠি দিয়েছে। তাও তুমি তাঁকে ক্ষমা করতে পারলে না দাদু?

বিদ্যাসাগর॥ এ বাড়িতে আসছে যাচ্ছে, আমি আপত্তি করিনি। কিন্তু কথা কইতে প্রবৃত্তি হয় না আমার। অথচ এই নারায়ণ যেদিন

আমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিধবা-বিবাহ করে, সেদিন আমার মুখ উজ্জ্বল করেছিল, আমি চরিতার্থ হয়েছিলাম।

সুরেশ ॥ কিন্তু দাদু, অভয় যদি দাও, একটা কথা বলি।

বিদ্যাসাগর ॥ বল।

সুরেশ ॥ যাদের তুমি ভালবাসতে, যারা তোমাকে ভালবাসতো, একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। ভগবতী মা চলে গেছেন, পিতা ঠাকুরদাস চলে গেছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ জামাতা আমার পিতা তোমার সেই প্রিয় গোপালচন্দ্র চলে গেছেন। আমার দিদিমা দিনময়ী দেবী চলে গেছেন। ক্রমে ক্রমে তোমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা তোমাকে যারা ভালবাসি তাদের তুমি কাছেই রেখ, আমার ঐ মামাটি-কেও।

বিদ্যাসাগর ॥ সবাইকে তো আমি কাছে রাখতেই চেয়েছিলাম, থাকছে কই! থাকলো কই! আমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণা কি জান, জীবনে যা খুঁজলাম তা পেলাম না।—(নেপথ্যে গান শুনিয়া) ঐ যে সেই গান—'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন।' যাও তো এখানে এক্ষুণি নিয়ে এস। কি করে এল! ও তো কানা, ও তো খোঁড়া?

সুরেশ ॥ মা কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

[অখিলউদ্দিনের প্রবেশ]

বিদ্যাসাগর ॥ এস বাবা, এস। গাও তোমার ঐ গানটি—'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন।' সুরেশ, তুমি দাদু বাইরে গিয়ে বসো—এখন যেন এখানে কেউ না আসে।

[গায়ক অখিলউদ্দিনকে বসাইয়া দিয়া সুরেশের প্রস্থান। অখিলউদ্দিন গাহিল—]

গান

(১) কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্ণয় করে রে কে তুমি

কোন্‌খানে যাও কোথায় থাক রে, মন অটল হয়ে কোথায় ভুলে রয়েছ—।

(২) তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড় আপনি মাঝি, আপনি হও যে চড়নদাররজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি আপনি হও যে হাইল বৈঠা।

(৩) তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাঞিচাঁদ বাউল বলে সে নাম ভুলব না রে প্রাণ গেলে।

(৪) তুমি আপনি হও অসার আপনি হও সার
আপনি হও রে নদী দুধার, আপনি নদীর কিনারা,
আমি অগাধ জল ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলব না রে প্রাণ গেলে।

(৫) আপনি তারা আপনি সারা আপনি জড় আপনি মরা।
আপনি হও সে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে শ্মশান কর্ত্তা গো আপনি হও সে জলের মীন ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো সাকিম আমি ভেবেচিন্তে হলেম ক্ষীণ।

[গান শুনিতে শুনিতে বিদ্যাসাগর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে সুরেশ ও তার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণচন্দ্র নিঃশব্দে কক্ষে আসিলেন। নারায়ণচন্দ্র দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুরেশ সোজা দাদুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল—এবং তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া নারায়ণের কাছে আসিল]

সুরেশ ॥ দাদু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকছে, আমরা সরে পড়ি। (অখিলউদ্দিনকে) চলুন, মার কাছে চলুন।

নারায়ণ ॥ দেখ সুরেশ, কখনও সুযোগ পাইনি, এখন যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন এই সুযোগে ওঁর পায়ে আমি একটু হাত বুলিয়ে দি।

সুরেশ ॥ না মামা, ডাক্তার সালজার বলে গেছেন, ঘুমই এখন ওঁর একমাত্র ঔষধ। আপনি বরং ঘরের দোরটা বন্ধ করে বাইরে বসে থাকুন যাতে এখানে কেউ না আসতে পারে।

[অখিলউদ্দিনকে লইয়া সুরেশ বাহির হইয়া গেল। নারায়ণ পা টিপিয়া টিপিয়া বিদ্যাসাগরের পদপ্রান্তে আসিয়া, শয্যাতে তাঁহার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং এক মুঠো শিউলি ফুল রাখিলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে প্রাণ ভরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন। তৎপর অশ্রুসজল চক্ষে ঘরের বাতিটি কমাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহিরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এক স্বপ্ন-দৃশ্যের অবতারণা হইল। দেখা গেল, বিদ্যা-সাগরের শয্যাপার্শ্বে টুলটিতে বসিয়া আছেন তাঁর পরলোকগতা জননী ভগবতী দেবী, বিদ্যাসাগর হঠাৎ যেন চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ একি ! মা, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

ভগবতী ॥ হ্যাঁ বাবা ঈশ্বর, তুমি স্বপ্নই দেখছ।

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ মা, আমি স্বপ্নই দেখছিলাম। তোমার খোঁজে. আমি যেন ক্রমাগত উর্ধ্বে উঠছি দারুণ একটা কুয়াশা ভেদ করে তবে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। এই কি তোমার স্বর্গ ?

ভগবতী ॥ হ্যাঁ বাবা। আমার এ স্বর্গ তুমিই রচনা করে দিয়েছ বাবা। তোমার পুণ্যেই আজ আমি এখানে আছি।

বিদ্যাসাগর ॥ একবার তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারবো না মা ?

ভগবতী ॥ না বাবা ঈশ্বর। এখানে আমার কোন সত্তা নেই। তোমার কল্পনা তোমার কামনা আমাকে তোমার কাছে মূর্তিমতী করেছে বাবা। কিন্তু বাবা, আমার অনুভূতি রয়েছে। কামনা-বাসনা আমার এখনও রয়েছে। সে তো সহজে যাবার নয় বাবা। আমার চিঠিটা তোমার বালিশের তলায় রেখেছো, কিন্তু আমার কথাটি তো রাখনি বাবা। লিখেছিলাম, একবার আমাকে দেখা দিয়ে যাও। আমি গয়নাপাতির জন্য তোমাকে বিরক্ত করব না, কেবল কোলে করে প্রাণ শীতল করব। কই এলে না তো তুমি ? চিঠি লিখে জানালে তুমি আসবে। সে-কথা শুনে আমি ঘরবাড়ি মেরামত করালুম। পথ চেয়ে বসে রইলুম কতদিন। কিন্তু এলে না তো ?

বিদ্যাসাগর॥ হ্যাঁ মা, যাব বলেছিলাম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে বলে দেহ-মনের যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল, যাওয়ার সাধ্যই আর আমার রইল না মা।

ভগবতী॥ আমি জানি, মিথ্যা বলবার ছেলে তুমি আমার নও। কিন্তু আজও বুঝতে পারলাম না অমন একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞাই বা তুমি হঠাৎ কেন করে বসেছিলে।

বিদ্যাসাগর॥ রাগ। রাগ না চণ্ডাল। রাগে আমি চণ্ডাল হয়ে গিয়েছিলাম মা। আমারই গাঁয়ের আত্মীয়-স্বজন, গুরুজনদের অবাঞ্ছিত একটা বিধবা-বিবাহ আমার নিষেধ সত্ত্বেও ঘটিয়ে দিল আমারই বাড়ির সামনে গোপনে। এটা আমাকে অপমান করারই ছিল একটা স্পষ্ট ষড়যন্ত্র। আমারই কোন কোন ভাইও ছিল এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সহ্য করতে পারলাম না মা এটা। প্রচণ্ড ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রিয় জন্মভূমি সাধের বাড়িঘর এমন কি আমার অমন ভগবতী মা তোমাকে ত্যাগ করে কলকাতা চলে এলাম এই প্রতিজ্ঞা করে যে, আর বীরসিংহে ফিরব না। তোমার কাছে আমার একটা মাত্র জিজ্ঞাসা ছিল। আজ যখন সুযোগ পেয়েছি সেই জিজ্ঞাসা করছি। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, প্রতিজ্ঞা রক্ষা আমি করেছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তোমার কোলে গিয়ে বসলে তুমি কি বেশী সুখী হতে, গাঁয়ের লোকের কাছে তোমার মাথা কি হেঁট হ'তো না মা?

ভগবতী॥ আর আমার কোন ক্ষোভ নেই বাবা ঈশ্বর। তুমি বীর-সিংহের সিংহ, তুমি সিংহের কাজই করেছ। কিন্তু বাবা, ক্ষমাও একটা ধর্ম। তোমার একমাত্র বংশধর পুত্র নারায়ণ। পাপ সে করেছে, প্রতিফলও তার পেয়েছে। কায়মনোবাক্যে সে তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছে। তোমাকে চিঠিতেও লিখেছে, 'আপনার পদসেবার জন্য সর্বত্যাগী হব, সকল সুখে জলাঞ্জলি দেব, পূর্বকৃত

সমস্ত পাপের প্রায়চিত্ত করতে দেহ ও প্রাণ আপনার চরণে উৎসর্গ করে রাখব।' লেখেনি ?

বিদ্যাসাগর ॥ ঊর্ধ্ব থেকে সবই তুমি দেখছ, সবই তুমি জানছ। হ্যাঁ মা, পত্রে ঐ কথাই সে লিখেছে, ক্ষমা আমি তাকে করিনি একথা বলা চলে না। সে এ বাড়িতে আসছে, যাচ্ছে, মাঝে মাঝে থাকছেও। কিন্তু মা, জান তো, একবার মন ভেঙে গেলে আর সহজে তা জোড়া লাগতে চায় না। দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে এ আমার বাল্য বয়সেরই শিক্ষা। বাল্যকালে কলকাতার বাসায় সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে পড়তে বসে কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়তাম—

ভগবতী ॥ জানি বাবা, কর্তা বাড়িতে ফিরে এসে তা দেখলে তোমার আর রক্ষে থাকতো না।

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ মা, সেই অমানুষিক প্রহারের ভয়ে আমি চক্ষে সরষের তেল দিয়ে ঐ যন্ত্রণায় জেগে থেকে পড়াশুনা করতাম।

ভগবতী। আর তাই না বাবা অমনি পড়াশোনার ফলে অত অল্পবয়সে সব বিষয়ে প্রথম হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি পেলে, বাংলাদেশে অদ্বিতীয় লোক হলে।

বিদ্যাসাগর। মা কিনা, যা খুশি বলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলো অন্যের দেওয়া শাস্তি যতটা শাস্তি, পিতার দেওয়া শাস্তি তা নয়। ও হ'লো গিয়ে প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ। সেটা আমি বুঝেছিলাম বলেই পিতা-ঠাকুরকে মনে করেছি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমার জীবনের সবচেয়ে একটা আনন্দের দিনের কথা তোমায় বলছি মা। সারাজীবন অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করে পিতা আমাকে মানুষ করেছিলেন। নিয়ত শ্রমে তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার রোজগার যখন কিছুটা বাড়ল, তখন পিতৃদেবকে তাঁর সেই দশ টাকা বেতনের কঠোর চাকরি থেকে অবসর নিতে যেদিন অনেক সাধ্য-সাধনায় রাজী করতে পেরেছিলাম সেই আনন্দের দিনটির কথা বলছি মা।

ভগবতী ॥ আমি বাবা, মাসিক দশ টাকা বেতনের পরিবর্তে তোমার দেওয়া মাসিক কুড়ি টাকা প্রণামী তিনি যখন পেতেন, আনন্দে শুধু তিনি কাঁদতেন না বাবা, কাঁদতাম আমিও।

বিদ্যাসাগর। তুমি তো হাউ হাউ করে কাঁদতে, আমি শুনেছি মা।

ভগবতী ॥ (আবেগে) আমার ঈশ্বর—আমার ঈশ্বর—আমার ঈশ্বর।

বিদ্যাসাগর ॥ শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর বলে ডাকলে চলবে না মা, তোমার ঈশ্বরকে একবার কোলে নিতে চাইছ না কেন?

ভগবতী ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) ষাট্ ষাট্! ওকথা আজ আর বলতে নেই। তুমি শতায়ু হও—শতায়ু হও। আমি চললুম।

বিদ্যাসাগর ॥ দাঁড়াও। বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয় মা?

ভগবতী ॥ হয়।

বিদ্যাসাগর ॥ আমার স্নেহের ধন, জামাতা গোপালের সঙ্গে? যে তার সব বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে?

ভগবতী ॥ হ্যাঁ, হয়। সে নিশ্চিন্তে আছে। তার বড় ছেলে সুরেশকে দেখলাম। ছেলেকে পারনি—এবার ঐ দৌহিত্রটিকে মনের মতো করে গড়ে তোল।

বিদ্যাসাগর ॥ আমার অভাগিনী দিনময়ীর সঙ্গে দেখা হয় তোমার?

ভগবতী ॥ ও নিজে সুখী হয়নি, তোমাকেও সুখী করতে পারেনি, সে আমি জানি। যারা চলে গেছে তাদের কথা আর তোমাকে ভাবতে হবে না। যারা আছে তাদের কথা ভাব। কাকে তুমি সুখী করতে চাও বল—আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বিদ্যাসাগর ॥ মা, একটা কানা খোঁড়া গায়ক, নাম অখিলউদ্দিন, এই বাড়িতেই এখন রয়েছে। চোখে দেখে না, পথ চলতে পারে না। তার বড় কষ্ট মা।

ভগবতী ॥ সাধে কি আর লোকে বলে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

বেশ, তাই হবে বাবা। সে যদি চায়, আমার আশীর্বাদে তার এ কষ্ট অবশ্যই দূর হবে। পরের কথা ভেবে ভেবে তুই গেলি। নিজের জন্য তো তোর ভগবতী মার কাছে কিছু চাইলি না বাবা?

বিদ্যাসাগর॥ তোমার কাছে চাইতে হবে কেন মা? আমার যখন যা দরকার তুমি তা দেবে, এ আমি জানি মা। আমার এই যে জ্বর, এই যে অসুখ, এই যে যন্ত্রণা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। কেন বাড়ছে তা কি আমি জানি না? ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত আমি, অবসন্ন আমি—আর দেরি না করে আমাকে কোলে নেবে বলেই না এত সব আয়োজন। এ আমার দুঃখ নয়, এ আমার জীবনের শেষ আনন্দ—শ্রেষ্ঠ আনন্দ। মা, আমি প্রস্তুত। এ কি, তুমি চলে যাচ্ছ যে? মুখে হাসি চোখে জল, এ কী অপরূপ মূর্তিতে তুমি চলে যাচ্ছ মা!

[ভগবতী দেবী অন্তর্ধান করিলেন। বিদ্যাসাগর স্তব্ধ হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্বপ্ন-দৃশ্যের অবসান হইল]

বিদ্যাসাগর॥ (চিৎকার করিয়া উঠিলেন) না না, এ স্বপ্ন—স্বপ্ন—মানুষের মনের অলীক চিন্তা-ভাবনাই হচ্ছে স্বপ্ন। আচ্ছা দাঁড়াও। (চিৎকার করিয়া ডাকিলেন) সুরেশ, সুরেশ, অখিলউদ্দিনকে এখানে নিয়ে এস, শিগগীর শিগগীর—

[দরজায় পুত্র নারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন]

নারায়ণ॥ সুরেশ বাড়ি নেই। অখিলউদ্দিনকে আমি নিয়ে আসব?

বিদ্যাসাগর॥ এদিকে এস।

[নারায়ণ ধীর পদক্ষেপে নতমুখে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

বিদ্যাসাগর॥ আমার বিছানায় পায়ের কাছে ঐ শিউলি ফুলগুলি কে রেখেছে?

[নারায়ণ দোষীর মতো নতমুখে নীরবে রহিলেন]

বিদ্যাসাগর॥ ভোরে আমি জানালা দিয়ে দেখেছিলাম তুমিই শিউলি ফুল তুলছ।

[নারায়ণ নতমুখে নীরব রহিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ (বিদ্যাসাগর তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়া) নারায়ণ। বাবা! পরপার থেকে আমার ডাক এসেছে। এই মাসটি আমার শেষ মাস। তুমি আজ নির্মল তুলসীপত্র। বংশের মর্যাদারক্ষার ভার তোমার উপরেই আমি দিয়ে যাচ্ছি।

নারায়ণ ॥ বাবা! (বলিয়াই পিতার পায়ে কাঁদিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর চোখ মুছিয়া পুত্রকে টানিয়া তুলিলেন)

বিদ্যাসাগর ॥ কেঁদো না বাবা, পুরুষের কান্না শোভা পায় না। আমার এখন এক মহাপরীক্ষা। স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা। তুমি অখিলউদ্দিনকে এখনি এখানে নিয়ে এস।

নারায়ণ ॥ দোর গোড়াতেই সে বসে আসে, আমি আনছি।

[নারায়ণ বাহিরে গিয়া অখিলউদ্দিনকে তখনই আনিলেন। অখিল-উদ্দিন গান ধরিয়াছে—'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্লয় করে রে কে ?]

বিদ্যাসাগর ॥ (অখিলউদ্দিনকে) থাম।

অখিল ॥ কেন কত্তা ?

বিদ্যাসাগর ॥ তুমি কি চাও বল তো? তুমি কানা, তুমি খোঁড়া, তোমার এ কষ্ট দূর হোক, এই তো তুমি চাও? আর তা যদি চাও, আমি বলছি, তুমি এখনি ভাল হয়ে যাবে। চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে, পায়ের শক্তি ফিরে পাবে।

অখিল ॥ তুমি, আপনি বলছ কি কত্তা?

বিদ্যাসাগর ॥ আমি মিথ্যা বলছি কি না সেটা পরখ করে দেখ তুমি। তোমার এত কষ্ট নিমেষে দূর হয়ে যাবে। চাইলেই দূর হবে। চাইতে দেরি করছ কেন?

অখিল ॥ এ্যাঁ, তবে তুমি স্বয়ং আল্লা? আমার কষ্ট দূর করতে এসেছ তুমি। কষ্টই যদি দূর করবে আল্লা —তবে তুমি আমার সবচেয়ে বড় কষ্টটা দূর কর।

বিদ্যাসাগর॥ বল বল, কি সে কষ্ট ?

অখিল॥ মনের কষ্ট। 'কোথায় ভুলে রয়েছ ও আমার নিরঞ্জন। তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা, আপনার নামটি রাখব কোথা ? আমায় তুমি কোল দাও নিরঞ্জন।'

[কাঁদিতে লাগিল]

বিদ্যাসাগর॥ ওরে, আমার বুকে আয়, আমার বুকে আয়।

[অখিলউদ্দিনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন বিদ্যাসাগর। নারায়ণ নতমস্তকে এই যুগ্ম মূর্তিকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিলেন]

যবনিকা

বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর যে একজন স্থিতধী রসজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচকও ছিলেন, এ খবর আজকের অনেক সাহিত্য-পাঠকই হয়তো রাখেন না। অথচ সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অপিচ, রসগ্রাহী সমালোচনার অবতারণা করে তিনি যে সেকালের সুধীসমাজের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। সত্য বটে, মাত্র একবারের জন্যই তিনি সমালোচক হিসাবে লেখনী ধারণ করেছিলেন; তারপর ঐ বিষয়ে আর কোনো উদ্যম প্রকাশ করেননি। কিন্তু ঐ প্রথম ও একতম উদ্যমেই তিনি সাহিত্য-সমালোচনা-কর্মে যে বিরল মনীষা ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে-ছিলেন, তা তাঁর সমালোচনী-প্রতিভার ঋদ্ধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী কালে নানা সংস্কারমূলক কর্মের প্রতীপস্রোতে তিনি এ ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছিলেন বলেই যে তাঁর এই প্রাথমিক সাহিত্যসমালোচনা-প্রয়াস মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, এমন কথা চিন্তা করা মোটেই বিজ্ঞোচিত হবে না। বরং ভবিষ্যৎ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অন্যতম দিক-নির্দেশক হিসেবে এ প্রয়াস যে বিশেষ মূল্যবান ছিল তা সকল ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত-বোধসম্পন্ন পাঠকই স্বীকার করবেন। বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত পূর্বে ইংরেজীতে হরচন্দ্র ঘোষ এবং বাংলায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ে বিতর্কমূলক সমালোচনার সূচনা করলেও, বিদ্যাসাগরই যে বাংলায় প্রথম নিরক্ষেপ বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক ও উন্নত রসরুচির সমর্থনপুষ্ট সাহিত্য-সমালোচনা-কর্মের প্রবর্তন করেন, একথা আজ অসংশয়েই বলা চলে। তাঁর 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত

সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা-কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সামনেই উপস্থিত রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করলেই এ বিষয়ে নিজের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেতে পারেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। স্বভাবতই সমালোচনা-কর্মের জন্যে ক্ষেত্র হিসেবে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকেই নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় সমালোচনাকালে তিনি 'অলঙ্কারশাস্ত্রীদের পুচ্ছাগ্রভাগ ধারণ করে পূর্বস্রূরীদের খনিত পথে যাত্রা করার প্রয়োজন বোধ করেননি।' সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তিনি এদেশের 'রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক পুরাতন পাণ্ডিত্যের' চেয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশের অপেক্ষাকৃত উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভঙ্গীর প্রতিই অনুরক্তি দেখিয়েছেন বেশী। সাহিত্য-বিচারকালে, তাই দেখি, তিনি মাঝে-মাঝেই এদেশী সাহিত্য-শাস্ত্রীদের পুরাতনের প্রতি অন্ধ মোহ ও বিচারজ্ঞানবিমূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই আপন স্বাধীন বিচারশক্তি প্রয়োগ করেছেন। তবে একথা প্রথমাবধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের লেখক ও তাঁদের সাহিত্যকৃতির পরিচয়-সম্বলিত রচনার প্রেরণা বিদ্যাসাগর লাভ করেছিলেন উইলিয়ম জোন্‌স্‌, ম্যাক্‌স্‌মূলর, উইলসন প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার দৃষ্টান্ত থেকে। আর ঐ জন্যেই বোধ হয় বিদ্যাসাগরের সমালোচনা-কর্ম পণ্ডিতী টীকার নীরসতায় পর্যবসিত হয়নি। অবশ্য আমাদের এই বক্তব্য থেকে কারও যদি এই ধারণা হয় যে, বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নতুন এক সমালোচনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই যথার্থ হবে না। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য সব সময় রক্ষা করার গরজ বোধ করেননি বটে; তাই বলে তা সর্বথা ত্যাজ্য এমন কথা বলার মতো মূঢ়তাও তিনি প্রদর্শন করেননি।

অলঙ্কারশাস্ত্রীদের প্রণীত অনেক সূত্রই তিনি সাহিত্য-বিচারে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ঐ সকলের প্রযুক্তি-ব্যাপারে 'প্রায়শ স্বাধীনতা নিয়েছেন। পুরাতন সংস্কৃত পণ্ডিতদের বহু বিচার-বিভ্রান্তির তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের উন্নততর রসবোধের প্রশংসা করেছেন। মোট কথা, বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার তীক্ষ্ণধার যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে অলঙ্কারিক সমালোচনা-পদ্ধতির সংস্কারের দাবি নিয়েই যেন উপস্থিত হয়েছেন তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক ক্ষুদ্র কলেবর আলোচনাগ্রন্থে। 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তৎকালীন কলকাতার বিদ্বজ্জনসভা 'বীটন সোসাইটি'তে বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতারই পরিবর্ধিত রূপ। সভায় আলোচনার জন্যে নিরূপিত স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুষ্ঠু পরিক্রমা সম্ভব ছিল না বলেই, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান কাব্য, নাটক ও উপাখ্যানগুলোর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এতে তাই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের যেমন স্বীকৃতি নেই, তেমনি নেই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-সমালোচনার উদ্যম। তবু গ্রন্থটি পাঠ করলে রসিক পাঠক মাত্রই স্বীকার করেন যে, সুপণ্ডিত সমালোচক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্যের একটি ঐতিহাসিক তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক রেখা-চিত্র এতে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। 'বীটন সোসাইটি'তে প্রবন্ধাকারে পঠিত এ গ্রন্থের বক্তব্যের মান যে সবিশেষ উন্নত ছিল এবং তা যে উপস্থিত বিদগ্ধ শ্রোতাদের রসচেতনাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে ঐ সালেরই ১২ই মার্চের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি ছোট খবর থেকে। 'প্রভাকর' লিখেছিলেন—

"বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

বস্তুত 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'-রূপে চিহ্নিত বিদ্যাসাগরের এই সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনাটি নানা কারণে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। প্রথমত, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে এলেও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কনের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহ সম্পর্কে বাঙালী সংস্কৃত-সেবী পণ্ডিতের প্রথম স্বাধীন অভিমত ও সিদ্ধান্ত-সম্বলিত রচনাও এটি। তৃতীয়ত, অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ হলেও এটিই বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থের মর্যাদার অধিকারী। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসেবেও এটি একটি আদর্শস্থানীয় রচনা বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' বিদ্যাসাগরের সমালোচনী-প্রতিভার কতটা সার্থক পরিচয় বহন করে, তা সম্যক্-রূপে জানতে ও বুঝতে হলে গ্রন্থটির আভ্যন্তর পরিচয় উদ্ঘাটন করার কাজ অত্যাবশ্যক বলেই বিবেচিত হবে। এই কথা স্মরণ রেখেই আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি। গ্রন্থের নামের সাথে সঙ্গতি রেখেই বিদ্যাসাগর প্রথমে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আপন বক্তব্য প্রকাশ ক'রে, পরে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র নিয়ে কিছুটা বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত-আলোচনাংশে তিনি সংস্কৃত

ভাষার প্রকাশক্ষমতা, এর আন্তর-ঐশ্বর্য, এত ব্যবহৃত শব্দঘটিত কৌশল এবং এর বিকাশে বৈয়াকরণদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে শব্দ-ঘটিত কৌশলের দৃষ্টান্ত যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সরল মধুর রচনার অংশ-বিশেষও উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর সংস্কৃত যে কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত ভাষা নয়, এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি এর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে দেশীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, তিনি মোটামুটি ম্যাক্‌স্‌মূলর-প্রচারিত 'সংস্কৃত সকল ভাষার জননী তুল্য' এই মতবাদকেই সমর্থন জানিয়েছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর অংশে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কৃত রচনার শ্রেণী বিচার করেছেন ও পরে সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহযোগে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ রচনা ও রচয়িতা সম্পর্কে আপনার বিচারনির্ভর মতামত প্রকাশ করেছেন। পরিশিষ্টে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন এবং আমাদের দেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখে আক্ষেপ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, বিদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্র-কলেবর গ্রন্থে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেননি, বা করা উচিত বলেও বিবেচনা করেননি। তিনি পৌরাণিক বা ক্লাসিক যুগ থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের রচনাকাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান সম্পদের কথাই আলোচনা করেছেন; কিন্তু বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। পৌরাণিক বা ক্লাসিক যুগের কাব্য-নাট্য-উপাখ্যানাদির সংক্ষিপ্ত পরিক্রমার মধ্যেই তিনি তাঁর আলোচনাকে সীমায়িত রেখেছেন।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্যে গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশই

প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে। এই অংশে বিদ্যাসাগর সমালোচক ও কতকটা, ঐতিহাসিকের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সাহিত্যের রূপ ও বিষয় বিশ্লেষণে তাঁর ভূমিকা অনেকটাই সমালোচকের; লেখকদের যথাযথ পরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিরূপণ-প্রয়াসে তাঁর ভূমিকা অনেকটাই ঐতিহাসিকের। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকের ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্য-বিচারে তিনি অগ্রসর হয়েছেন অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত পথ ধরেই যদিচ পরে প্রয়োজনমতো যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী সাহিত্যকে 'কাব্য' পদবাচ্য রূপে গ্রহণ করে তাকে তিনি 'শ্রব্য' ও 'দৃশ্য' এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। শ্রব্যকাব্যের পদ্য, গদ্য ও গদ্য-পদ্যময় রূপের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। গদ্যময় কাব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি 'মহাকাব্য', 'খণ্ডকাব্য' ও 'কোষকাব্য'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। গদ্যময় কাব্য হিসেবে কথা ও আখ্যায়িকা-জাতীয় রচনার কথা এবং গদ্য-পদ্যময় কাব্যরূপে চম্পূ-জাতীয় রচনার কথা বলেছেন। পরে ভিন্নতর প্রসঙ্গে নীতি-উপদেশ-সম্বলিত উপাখ্যান-জাতীয় রচনাকে কাব্যরূপে চিহ্নিত করার অযৌক্তিকতা নির্দেশ করে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রের ত্রুটি ও অপূর্ণতার দিকটি অবশ্য তুলে ধরেছেন। 'দৃশ্যকাব্য' পর্যায়ের সাহিত্য বলতে তিনি, আমাদের মতোই, সর্বত্র নাটককেই বুঝেছেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের শ্রেণী নির্দেশ করার পর বিদ্যাসাগর মহাকাব্যাদি-ক্রমে প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার সংজ্ঞা নির্দেশ করে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাঁদের রচনার মূল্যমান নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিটি শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নির্দেশ করে, তাদের সাহিত্যিক গুণ নির্দেশ করা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে তুলনামূলক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে আলোচনাকে সরস ও সারগর্ভ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। নিরপেক্ষ মন নিয়ে প্রতিটি গ্রন্থের

গুণ যেমন নির্দেশ করেছেন, তেমনি নির্মমভাবে উল্লেখ করেছেন তার ত্রুটির কথা। মতামত প্রকাশে তিনি প্রায়শই অনন্যনির্ভর, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বসূরীর মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেও তিনি অকুণ্ঠিত। তাঁর আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পর্কিত দেশী-বিদেশী যাবতীয় সমালোচনার সাথে তিনি কম-বেশী পরিচিত ছিলেন; তবে কারও প্রতিই তিনি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি।

এবার দেখা যাক বিদ্যাসাগর কিভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যকর্মের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই তিনি মহা-কাব্য-জাতীয় রচনাগুলোর কথা বলেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত মহা-কাব্যের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করে তিনি যথাক্রমে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', মাঘের 'শিশু-পালবধ', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', ভট্টনামক কবির 'ভট্টি কাব্য', কবিরাজ পণ্ডিতের 'রাঘবপাণ্ডবীয়' এব জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের কথা আলোচনা করেছেন। প্রতিটি আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু লক্ষ্যভেদী। 'রঘুবংশ' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।' বিদ্যাসাগরের মতে, কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের 'সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক-রচয়িতা। যে গুণে কালিদাসের এইরূপ উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্য তা হচ্ছে তাঁর 'অলৌকিক কবিত্বশক্তি, বর্ণনা নৈপুণ্য, অত্যুক্তিবিহীনতা, আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্য রচনার ক্ষমতা'। বিদ্যাসাগর একথাও উল্লেখ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় রঘুবংশে প্রদত্ত বর্ণনার ন্যায় 'এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়-গ্রাহিণী বর্ণনা' আর দেখতে পাওয়া যায় না। উপমা ব্যবহারের যাদু সৃষ্টির অপরূপ ক্ষমতাও যে কালিদাসের কাব্যের অন্যতম আকর্ষণের কারণ, তাও উল্লেখ করতে তিনি বিস্মৃত হননি।

অতঃপর 'রঘুবংশ' কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিষয় বিশ্লেষণান্তে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে, সংস্কৃত ভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য 'রঘুবংশ'কে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।' বিচারজ্ঞানবিমূঢ় পণ্ডিতদের প্রতি প্রযুক্ত যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ উক্তিটিতে নিহিত আছে তা বিদ্যাসাগরের স্বাধীন মতপ্রকাশের সাহসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। 'কুমারসম্ভব' অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য বলে বিবেচিত হলেও এর কাহিনীর অসম্পূর্ণতার কথা এবং এতে পার্বতী ও হরের প্রেমলীলা বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে অশ্লীলতা দোষ দেখা দিয়েছে তা উল্লেখ করতেও সমালোচক বিদ্যাসাগর পশ্চাৎপদ হন নি। প্রসঙ্গত তিনি 'কুমারসম্ভব' ও 'শিবপুরাণের' কাহিনীর সাদৃশ্যের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি 'যোগবাশিষ্ঠ' ও 'কুমারসম্ভবের' শ্লোকের ঐক্য দেখে দুইয়ের সম্ভাব্য সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'-এর পরেই বিদ্যাসাগরের মতে, ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের স্থান—'উৎকর্ষ ও প্রাথম্য' অনুসারেই বটে। ভারবির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি উভয়ের ভাষা ও রচনাপ্রণালীর তুলনা করে বলেছেন, 'ভারবির রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধহয় 'কিরাতার্জুনীয়'-কর্তা ভারবি কালিদাসের উত্তরকালে এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।' কবির কালনির্ণয়ের এ-পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। অতঃপর বিদ্যাসাগর 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লেখ করে ভারবির কবি-প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'কবিত্বশক্তিতে ভারবি কালিদাস অপেক্ষা নূতন···কিন্তু তিনি একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।' ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের পরে-পরেই সন্নিবেশিত হয়েছে মাঘের 'শিশুপালবধ' কাব্যের সমালোচনা। বাংলা

সমালোচনা-সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার আদি দৃষ্টান্ত হিসেবে এই আলোচনাটির উল্লেখ করা চলে। বিদ্যাসাগর ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' গ্রন্থের সঙ্গে শিশুপালবধ' কাব্যের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'শিশুপালবধ' 'কিরাতার্জুনীয়'র প্রতিরূপ কাব্য, তাকে আদর্শ করেই রচিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থের কাহিনী-পরিকল্পনা, ঘটনাবিন্যাস এবং ভাষা-অলঙ্কার-ব্যবহারে সৌসাদৃশ্য এতই স্পষ্ট যে, সমালোচকের সিদ্ধান্তকে মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না। বিদ্যাসাগর মাঘের কবিত্বশক্তিকে তাই বলে খুব ন্যূন হিসেবে নির্দেশ করেননি। তিনি তাঁর কবিত্বশক্তি ও অদ্ভুত বর্ণনাশক্তির প্রশংসা করেও বলেছেন যে, তা যথেষ্ট 'পরিপক্ক' নয়। বিশেষত কালিদাস ও ভারবির তুলনায় তাঁর রচনাকে নিকৃষ্ট বলতেই হয়। মাঘের সবচাইতে বড় ত্রুটি বহুবিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবেশের লোভ। এই জন্যে তাঁর কাব্যের কলেবর অনাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিদ্যাসাগর মনে করেন। তাঁর বিবেচনায় মাঘের কাব্যের বিংশতি সর্গের মধ্যে নয়টি সর্গই অপ্রাসঙ্গিক। এত ত্রুটিতে পূর্ণ হলেও অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতের বিবেচনায় মাঘের 'শিশুপালবধ'ই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে গণ্য হয়েছে। বিদ্যাসাগর ঐ সকল বিচারবিমূঢ় পণ্ডিতদের প্রতি বিরক্তি গোপন রাখতে পারেননি। কিছুটা তীব্র ভাষায়ই তাঁদের মূঢ়তার নিন্দা করেছেন।

'শিশুপালবধ' কাব্যের পরেই শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' কাব্যের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। 'অত্যুক্তিতে পূর্ণ', 'মাধুর্যবর্জিত', 'লালিত্যহীন', 'সারল্যশূন্য' ও 'অপরিপক্ক' এ-কাব্য সম্পর্কে তিনি প্রারম্ভেই অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন। উৎকট উপমা-ব্যবহার ও অনুপ্রাস-বাহুল্যে পীড়িত এ-কাব্য সম্পার্কে নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের বিচারভ্রান্তি ঘটলেও বিদ্যাসাগর প্রায় অভ্রান্ত বিচারশক্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে 'নৈষধচরিত' একেবারে গুণবিবর্জিত এমন কথা বিদ্যাসাগর বলেননি। তাঁর মতে, 'নৈষধচরিতে' এমন উৎকৃষ্ট অংশ আছে যাহাতে খুশী হওয়া যায়, আবার

অন্য অংশ দেখিলে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়।' নলরাজার চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বনে রচিত বৃহদাকার এই কাব্য রচনাগুণে যে বিশেষ উচ্চমানের নয়, একথা বিদ্যাসাগর অকপটেই বলেছেন। পণ্ডিতী বিচার-জ্ঞান-বিমূঢ়তার উপর এখানেও তিনি অনেকটাই যেন খড়্গহস্ত। সমালোচনা-কর্মে তাঁর ন্যায়দর্শিতা ও সূক্ষ্মদশিতার পরিচয় পরবর্তী ভট্টিকাব্য-সম্পর্কিত আলোচনায়ও পরিস্ফুট দেখতে পাচ্ছি। ভট্টিকাব্য-রচয়িতার পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি টীকাকার জয়মঙ্গল ও ভারত মল্লিকের বিরোধী মতবাদের উল্লেখ করে গ্রন্থশেষের কবির আত্ম-পরিচয়-মূলক বক্তব্যের আলোকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন যে, ভট্টিকাব্য-প্রণেতা টীকাকার জয়মঙ্গল-কথিত ভট্টনামক কবিই বটেন, ভরত মল্লিক-প্রোক্ত ভর্তৃহরি নন। 'ভট্টিকাব্য' সম্পর্কে তাঁর সুস্থির সিদ্ধান্ত এই যে, 'ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ'; কারণ, ব্যাকরণের উদাহরণ-প্রদর্শন গ্রন্থকর্তার উদ্দেশ্য ছিল, কাব্যশক্তি প্রদর্শন নয়। তবে ভট্টির কাব্যশক্তির প্রতি তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণনা কবিত্বগুণে যে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, একথা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি।

মহাকাব্য-পর্যায়ে সর্বশেষ আলোচিত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে কবিরাজ পণ্ডিত-বিরচিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' এবং জয়দেব-বিরচিত 'গীতগোবিন্দ'। প্রথমোক্ত গ্রন্থ-সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন, এটি এক নতুন প্রণালীর মহাকাব্য। দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকসমৃদ্ধ এই কাব্য-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এইরূপ এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্তবর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।' বিরল-প্রচারিত এই কাব্যে শব্দের অর্থগত কলাকৌশল প্রয়োগে কবির যত দক্ষতাই প্রকাশ পাক না কেন, কবিত্ব-শক্তি কিন্তু আশানুরূপ প্রকাশ হয়নি। কাব্যের লেখক 'কবিরাজ পণ্ডিত' যে কোনো লেখকের নাম নয়, উপাধি মাত্র, তা বিদ্যাসাগর স্পষ্ট করেই বলেছেন। জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের উৎসাহে লিখিত

সংবাদের ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন তুলেছেন মধ্যদেশ থেকে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত এই কামদেব ও আদিশূর কি একই ব্যক্তি? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের মীমাংসা' তখনও হয়নি, আজও হয়নি। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর আলোচনার মধ্য দিয়েই মহাকাব্য-জাতীয় রচনার পরিচয়-উদ্ঘাটন কাজের সমাপ্তি টেনেছেন বিদ্যাসাগর। রাধাকৃষ্ণ-লীলাশ্রয়ী ভক্তিরসসম্পৃক্ত এই কাব্য-সৃষ্টি সম্পর্কে কিংবদন্তীর উল্লেখ করে তিনি আলোচনাটিকে অনেকটা সরসতা দান করেছেন। গ্রন্থটির যাবতীয় গুণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত-পদবিন্যাস; শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।' তিনি আরও বলেছেন, গীতগোবিন্দের 'রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী'। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতাকে তিনি বাংলাদেশের তাবৎ সংস্কৃত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। তবে সত্যের অনুরোধেই তিনি একথাটিও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জয়দেব কবি হিসেবে কালিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি অপেক্ষা ন্যূন বটে। লক্ষ্য করার বিষয়, আধুনিক সমালোচকের মতো তিনি জয়দেবের কাব্যে অশ্লীলতার কথা একবারও উল্লেখ করেননি। অথচ তিনিই না 'কুমারসম্ভবে'র আলোচনা প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র অশ্লীলতা সম্পর্কে বার বার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন? আসলে জয়দেবকে তিনি একজন ভক্ত বৈষ্ণবকবিরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, 'জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে পরম দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।' জয়দেবের ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের প্রকাশ 'গীতগোবিন্দ' ভক্তিরসনিষেকে পূত হয়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল, তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় দেহরাগের আত্যন্তিক প্রকাশও তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ সঞ্চার করেনি। বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিবাদী সমালোচকের পক্ষেও এটা কি করে সম্ভব

হ'লো, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। তা হলে কি বাংলার জলমাটি থেকে নিঃসৃত ভক্তিরস তাঁকেও কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল? হয়তো তাই, হয়তো না।

মহাকাব্য প্রসঙ্গের পরেই খণ্ডকাব্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে খণ্ডকাব্যের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' ও 'নলোদয়' কাব্যত্রয় এবং ময়ূরভট্টের 'সূর্যশতক' কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। মেঘদূত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্বাংশে সর্বোৎকৃষ্ট' আজও বিনা প্রতিবাদেই গৃহীত হচ্ছে। মেঘদূতের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই যেন তিনি বলেছেন, 'মেঘদূত ক্ষুদ্র কাব্য বটে। কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।' মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষার বিরহ-গাথার সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে বিদ্যাসাগর যে মন্তব্য করেছেন তাতে এই বক্তব্যই আরও পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং মেঘদূত কাব্যের চমৎকারিত্ব কোথায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। মন্তব্যটি এইরূপ—'কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি কলিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত।' এতৎসত্ত্বেও 'মেঘদূত' পাঠকমহলে আশানুরূপ সমাদর পায়নি, তার কারণ, বিদ্যাসাগরের মতে, এর 'রচনা অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কিঞ্চিৎ দুরূহ।' অনুবাদের কল্যাণে একালে কাব্যরসিকমহলে মেঘদূতের বিপুল সমাদর থেকে বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

কালিদাসের অন্যতম খণ্ডকাব্য 'ঋতুসংহার' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেন, 'কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কিছুটা ন্যূন হইলেও যে সমস্ত গুণ থাকাতে রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কার-বিবর্জিত ও সহৃদয় পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশ-পূর্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।' অথচ অনেকে ঋতুসংহারকে নিকৃষ্ট কাব্য বলে চিহ্নিত করে থাকেন। বিদ্যাসাগরের মতে, 'ঋতুসংহার' কাব্যের মাধুর্য আস্বাদনে অপারগ পণ্ডিতশ্রেণীর গতানুগতিক সাহিত্য-রুচিই এর জন্যে দায়ী। তিনি আরও বলেছেন যে, 'রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়', তাই আগাগোড়া স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে মণ্ডিত এই কাব্যের চমৎকারিত্ব তাদের 'তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম' হয়নি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির ও বসন্ত এই ছয় ঋতুর বর্ণনাসমৃদ্ধ 'ঋতুসংহার' কাব্য তাই অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। অথচ এ কাব্যে কবিত্বের কোথাও বিশেষ অভাব ঘটেনি। ঋতুবর্ণনায় সর্বত্র সমান সাফল্যের পরিচয় দিতে না পারলেও গ্রীষ্মবর্ণনায় যে কবি যথেষ্ট মনোহারিত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন, বিদ্যাসাগর অকুণ্ঠ ভাষায় তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে তিনি আলঙ্কারিক-দের বিচার-বিভ্রান্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এবং নতুন করে ঋতুসংহারের মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব অরোপ করেছেন। কালিদাস-প্রণীত তৃতীয় খণ্ডকাব্য 'নলোদয়' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কিন্তু কোনো প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেননি। কিংবদন্তী এই যে, ঘটকর্পরের গর্ব খর্ব করার জন্য কালিদাস আগাগোড়া যমকালঙ্কারে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন ঘটকর্পর দ্বাবিংশতি যমকালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে কাব্য লিখে গর্বভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্য কারও পক্ষে ঐরূপ কাব্য রচনা করা সম্ভব নয়। ঘটকর্পরের দর্প চূর্ণ করার অভিপ্রায়ে রচিত এই কাব্যে

কবি কালিদাসের আন্তর প্রেরণার একান্ত অসদ্ভাব বলেই যে কাব্যসৃষ্টি হিসেবে এটি ব্যর্থ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এমনিতেই আগাগোড়া যমকালঙ্কার প্রাধান্যযুক্ত কাব্য তেমন শ্রুতিসুখকর ও মধুর হতে পারে না। 'নলোদয়'-ও যে হতে পারেনি তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? 'নলোদয়ে'র নির্মম সমালোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্যাসাগর কালিদাসের অন্ধ অনুরাগী মাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন রুচিশীল, বিদগ্ধ ও রসিক পাঠক।

খণ্ডকাব্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে ময়ূরভট্ট-প্রণীত 'সূর্যশতক'। একশত শ্লোকে রচিত এই কাব্যে বিদ্যাসাগর কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর রচনাপ্রণালী সম্পর্কে বলেছেন রচনা অতি প্রগাঢ় ও অতি সুন্দর। তবে সমালোচকের অভিযোগ এই যে, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে প্রযুক্ত বলে এই কাব্যে ময়ূরভট্টের সৃষ্টিক্ষমতা আশানুরূপ স্ফূর্তি লাভ করেনি। 'বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হলে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা' তাঁর পক্ষে 'সম্ভব ছিল'—সমালোচক বিদ্যাসাগরের এই মত দৃষ্টে সাহিত্যবিচারে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার কথা স্বভাবতই মনে আসে। রচনার পরিমাণ দিয়ে নয় গুণগত দিক দিয়েই যে প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়, এমন একটি মনোভাবই বিদ্যাসাগরের এ সব বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় সমালোচক হিসেবে বিদ্যাসাগরের এই মনোভঙ্গী নির্ভুল ও যথার্থ।

খণ্ডকাব্যের পরে কোষকাব্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগর কোষকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে যথাক্রমে অমরু-রচিত 'অমরুশতক', শিহ্লণ-প্রণীত 'শান্তিশতক', ভর্তৃহরি-প্রণীত 'নীতিশতক', 'শৃঙ্গারশতক' ও 'বৈরাগ্য-শতক' এবং কবি গোবর্ধন-বিরচিত 'আর্যাসপ্তশতী' প্রভৃতি ছয়খানা কোষকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কোষগ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত সে-বক্তব্য যেমন সারগর্ভ, তেমনি সরস। 'অমরুশতক'-রচয়িতার প্রশংসা করে বিদ্যাসাগর বলেছেন,

'অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে ; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।' আদিরসাশ্রিত এই কোষকাব্যকে কোনো কোনো সংযত টীকাকার শান্তিরসাশ্রিত রূপে বর্ণনা করার যে হাস্যকর প্রয়াস পেয়েছেন, তাকে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ না করে পারেননি। তাঁর মতে, অমরুশতকের রচনা অতি উত্তম, তাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। সংস্কৃত যাবতীয় কোষকাব্যের মধ্যে অমরুশতকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে।' অমরুর রচনা বিদ্যাসাগরের চিত্ত জয় করেছিল, নতুবা এমন উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্তি তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব হ'তো না। অমরুশতকের রচনাকাল আজও নির্ণীত হয়নি। এর রচনারীতি দৃষ্টে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে, এ কাব্য বিশেষ প্রাচীন। শিহ্লণ-প্রণীত 'শান্তিশতক' শান্তরসাশ্রিত কোষকাব্য। অমরুর ন্যায় খ্যাতিমান না হলেও শিহ্লণ উত্তম কবি। আর তাঁর শান্তিশতক'ও উৎকৃষ্ট কাব্য। এ গ্রন্থে অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা এবং বিষয়ের অনিত্যতা প্রতিপাদন ও যদৃচ্ছা লাভ, সন্তোষ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ভর্তৃহরি-বিরচিত 'নীতিশতক' সুনীতি-উপদেশমূলক রচনা, 'শৃঙ্গারশতক' আদিরসাশ্রিত এবং 'বৈরাগ্যশতক' 'শান্তিশতকে'র মতোই শান্তরসাশ্রিত কাব্য। বিদ্যাসাগর ভর্তৃহরির রচনাকে উত্তম বলে নির্দেশ করেছেন এবং তাঁর কাব্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন। তবে কবি ভর্তৃহরির পরিচয় রহস্যাবৃতই রয়ে গিয়েছে। কবি ভর্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের সহোদর ভর্তৃহরি কি না এমনি একটি প্রশ্নও বিদ্যাসাগরের মনে জেগেছে। তবে এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয় বিধায় শেষ পর্যন্ত তিনি মৌন অবলম্বন করেছেন। কবি গোবর্ধন-বিরচিত

'আর্যাসপ্তশতী' এ-পর্যায়ে আলোচিত সর্বশেষ কোষকাব্য। আর্যাছন্দে কাব্যটি রচিত বলেই ঐরূপ নামকরণ হয়েছে। গোবর্ধনের কাল নির্দিষ্টরূপে জানা না গেলেও তিনি যে জয়দেবের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন তা জয়দেবের কাব্যে তাঁর উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, গোবর্ধনের রচনা সরল ও মধুর। কোষ-কাব্য সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরের এ আলোচনা থেকে আমরা আর কিছু না পেলেও অন্তত অমরু ও শিহ্লণের মতো দুইজন শক্তি-মান কবির সন্ধান যে পেয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ছাড়া ভর্তৃহরি ও গোবর্ধন সম্পর্কেও আমাদের কৌতূহল কিছুটা উদ্রিক্ত হয়েছে।

পদ্যকাব্যের এই নাতিবিস্তৃত সমালোচনার পরে বিদ্যাসাগর গদ্য-কাব্যের আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' নামক তিনটি গ্রন্থের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটা বিস্তৃতভাবে সম্ভব আলোচনা করেছেন। 'কাদম্বরী' সম্পর্কে বিদ্যা-সাগর জানিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্বল্প কিছু গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'কাদম্বরী' সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা রূপে গণ্য হবার দাবি রাখে। তাঁর মতে 'কাদম্বরী' অশেষ গুণের আকর। 'কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনাসকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে-সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্তসহ নহে।' কাদম্বরীর বিষয় নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি এতে বর্ণিত মহাশ্বেতা উপাখ্যানের রমণীয়তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কাদম্বরীর গুণ যথেষ্ট হলেও এর ত্রুটির দিকটিও বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ সমালোচনী দৃষ্টিতে এড়াতে পারেনি। কাদম্বরীর কোনো কোনো

অংশের ভাষা শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাস-ঘটিত কারণে যেমন দুরূহ, তেমনি নীরস; কোথাও কোথাও এই দুরূহতার মূলে কাজ করেছে দীর্ঘসমাসঘটিত পদসমন্বিত দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার। কাদম্বরী সম্পর্কে আর একটি অভিযোগ, এ গ্রন্থের রচনার মান পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ থাকেনি। এর পূর্বভাগ উত্তরভাগের চেয়ে সাহিত্যগুণে শ্রেষ্ঠ। এরূপ হওয়ার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ বলেন কাদম্বরী বাণভট্টের সম্পূর্ণাঙ্গ রচনা নয়; তিনি এর পূর্বভাগ মাত্র রচনা করেছিলেন, উত্তরভাগ রচিত হয়েছিল তাঁরই পুত্র-কর্তৃক। প্রতিভার অসমতা হেতু তাই রচনার দুই অংশে গুণগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবে। 'কাদম্বরী'-সম্পর্কিত এ আলোচনা একদিকে যেমন অশেষ রসগ্রাহিতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি সমালোচক বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্মদর্শিতারও পরিচায়ক। আলোচনার সর্বত্র একটি আশ্চর্য ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হয়। গদ্যকাব্য হিসেবে 'কাদম্বরীর' পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' নামক গ্রন্থটি; বিদ্যাসাগর এটিকে 'অত্যুত্তম গদ্যগ্রন্থ' বলে নির্দেশ করেও বলেছেন যে, এটি কাব্যাংশে তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। 'কাদম্বরী'র সাথে তুলনায় এ-গ্রন্থ যে যথেষ্ট হীন এমন কথা তিনি একাধিক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। যেমন, 'কাদম্বরীর ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে'; নানা বিষয়ের বর্ণনা যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে 'পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও ভীত হওয়ার মতো গ্রন্থ নহে' ইত্যাদি। বস্তুত 'দশকুমারচরিতের' ত্রুটি বড় বেশী। এর নামের সঙ্গে গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পুরোপুরি সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। বইটি প্রারম্ভে যেমন অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট, সমাপ্তিতেও তাই। 'দশকুমারচরিত' নাম হলে কি হবে, এতে প্রকৃতপক্ষে আটজন কুমারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই অসঙ্গতি দূরীকরণমানসে গ্রন্থের পূর্বপীঠিকা নামে উপক্রমণিকা অংশে দুই কুমারের বৃত্ত সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু মূল গ্রন্থের রচনার সাথে

উপক্রমণিকাংশের রচনার বৈসাদৃশ্য এতই বেশী যে উভয় অংশ পৃথক পৃথক ব্যক্তির রচনা বলেই মনে হয়। 'দশকুমারের' পরিশিষ্ট চক্রপাণিদীক্ষিত নামক এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ-রচিত—হোরেস হেমেন উইলসনের জবানীতে বিদ্যাসাগর আমাদের এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে পরিশিষ্টের এই রচনাংশ দণ্ডীর তুলনায় নিকৃষ্ট। প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর দণ্ডীর সত্যিকার পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দণ্ডী কি নাম, না উপাধি? দণ্ডী সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করে তিনি প্রসঙ্গের উপসংহার টেনেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, এ সমালোচনায় একটি সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের সম্ভাব্য সকল জিজ্ঞাসারই তিনি সুষ্ঠু জবাব দানের চেষ্টা করেছেন। এমন বিষয়নিষ্ঠ সমালোচনা অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। সংযত গদ্যকাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে কালিদাসের সমসাময়িক কবি বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু-রচিত 'বাসবদত্তা' গ্রন্থটি। এটি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। 'কাদম্বরী'র সাথে সাদৃশ্য হেতু মনে হয় কবি বাণভট্টের পূর্বেই সুবন্ধু আবির্ভূত হয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুবন্ধুর রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য সত্ত্বেও কবিত্বশক্তির তাদৃশ প্রকাশ ঘটেনি বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে বাসবদত্তা খুব উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয়, 'কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা··· সর্বাংশেই মধ্যবিধ'। এতৎসত্ত্বেও এ গ্রন্থের প্রারম্ভের শ্লোক এবং গ্রন্থমধ্যস্থ কুপিত সিংহ বর্ণনার শ্লোকদ্বয় যে অত্যন্ত মনোহর, তা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। রসিক সমালোচক বিদ্যাসাগর যে সমালোচক হিসেবে কিরূপ সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তা এই দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চয়ই বোধগম্য হবে।

গদ্যকাব্য সম্পর্কিত আলোচনার পরে বিদ্যাসাগর অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্যের সম্পর্কে আপন বক্তব্য

প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে এমন চম্পূকাব্য সংস্কৃতে একটিও রচিত হয়নি। অনেক চম্পূকাব্যের মধ্যে তাঁর বিবেচনায় দেবরাজ-বিরচিত 'অনিরুদ্ধচরিত' সর্বোৎকৃষ্ট। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভোজদেব-রচিত 'চম্পূ রামায়ণ', ও চিরঞ্জীব-বিরচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী', অনন্তভট্ট-প্রণীত 'চম্পূ ভারত', ভানুদত্তের 'কুমারভার্গবীয়'। রামনাথের 'চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ' ও রূপগোস্বামি-বিরচিত 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু' ইত্যাদি চম্পূকাব্যের নাম উল্লেখ করেই তিনি এ প্রসঙ্গের ইতি টেনেছেন। বলা বাহুল্য, চম্পূকাব্যগুলো সৃষ্টি হিসেবে অকিঞ্চিৎকর, এই বিবেচনায়ই যে বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি এদের আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রব্যকাব্য পর্যায়ে গদ্য, পদ্য ও পদ্য-গদ্যময় নানা শ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা শেষে বিদ্যাসাগর দৃশ্যকাব্য পর্যায়ে সংস্কৃত নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সূচনাতে যথারীতি অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নাট্যলক্ষণসমূহের কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি আদি নাট্যকাররূপে কীর্তিত ভরতমুনির অস্তিত্বেই শুধু নয়, ব্যাকরণদর্শন ইত্যাদি গ্রন্থরচয়িতা বলে পরিকীর্তিত সকল মুনির অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শূদ্রক, বিশাখদেব, ভট্টনারায়ণ এই ছয়জনের বিশিষ্ট রচনা-সমূহকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। যদিচ তিনি জানেন সে প্রায় বিরাশিখানার মতো সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে তেত্রিশখানা বিদ্যমান। অনেক নাটকের আজকাল সন্ধান না পাওয়া গেলেও 'দশরূপক' ও 'সাহিত্যদর্পণে' প্রদত্ত উদাহরণ দৃষ্টে তাদের নাম জানতে পারা গিয়েছে, যেমন 'কুন্দমালা', উদাত্তরাঘব', 'বালরামায়ণ' প্রভৃতি। এ সব নাটক থেকে উদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে মনে হয় ঐগুলো উৎকৃষ্ট নাটক ছিল। সে যাই হোক, বিদ্যাসাগর

তাঁর নাট্যালোচনা প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ রেখেছেন পূর্বোল্লিখিত নাট্যকার-ষট্কের বিশিষ্ট কয়েকটি রচনার মধ্যে। প্রথমে তিনি কালিদাস-বিচরিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা,' 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাট্যত্রয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য পেশ করেছেন। 'শকুন্তলা' নাটকের উৎকর্ষ নির্দেশ করে প্রথমে তিনি সংক্ষেপে বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে 'শকুন্তলা'য় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে এবং 'মনুষ্য ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না।' শুধু তাই নয়, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' তাঁর বিবেচনায় 'এক অলৌকিক পদার্থ'। দেশী-বিদেশী সমালোচক-মহলে উচ্চপ্রশংসিত শকুন্তলা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর উইলিয়ম জোন্স-কৃত কালিদাস ও সেক্সপীয়রের তুলনায় কথাটি উল্লেখ করতে ভোলেননি। শুধু তাই নয়। জোন্স-কৃত শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদের ফর্স্টর-কৃত জার্মান অনুবাদ পাঠে উচ্ছ্বসিত গ্যেটের প্রশংসাবাণীটি উদ্ধৃত করে নাটক হিসেবে শকুন্তলার উচ্চ মহিমাটিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ফর্স্টর-কৃত ইংরেজী শকুন্তলার জার্মান অনুবাদ-প্রসঙ্গে গ্যেটের উক্তি—

> Wouldst thou the young year's
> Blossoms and the fruits of its decline,
> And all by which the soul is
> Charmed, enraptured, feasted, fed,
> Itself in one sole name combined ?
> I name thee, O Sakuntala ? and
> All at once is said.

বিদ্যাসাগরের অনুবাদে সে প্রশংসাবাণী দাঁড়িয়েছে এরূপ—

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি

কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তলা! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"

এই অনুবাদে মূলের বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে রসসৃষ্টির অপার ক্ষমতা দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগর। গ্যেটের এই উক্তি কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধাবোধকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মতে অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করেই যদি এত আনন্দ পাওয়া যায়, তাহলে মূল পাঠে নিশ্চয়ই সে আনন্দের মাত্রাধিক্য ঘটতে বাধ্য। মোট কথা, কালিদাস যে এক অসাধারণ শিল্পস্রষ্টা, গ্যেটের উক্তি থেকে তারই অকপট সহজ স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে। কালিদাস-প্রেমিক বিদ্যাসাগর তাতে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করেছেন।

'শকুন্তলা'র সমালোচনায় বিদ্যাসাগর একজন রসবাদী সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে কোনো সন্দেই নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তিনি যেভাবে ইউরোপীয় সমালোচকদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর মনীষা ও রসবোধ উভয়েরই পরিচয় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শকুন্তলা'র পরবর্তী 'বিক্রমোর্বশী' সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর আপন রসবিচারের ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। 'শকুন্তলা'র তুলনায় 'বিক্রমোর্বশী' ন্যূন হলেও এত কোথাও কোথাও এমন কাব্যগুণ রয়েছে যার দৃষ্টান্ত সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্যেও দুর্লভ। বিদ্যাসাগর 'বিক্রমোর্বশী' থেকে এই বিষয়ের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরে মন্তব্য করেছেন—'চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া পুরূরবা তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণনা আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিলে

নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।' বস্তুত পুরূরবার ও উর্বশীর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে পুরূরবার বিরহবর্ণনে কালিদাস আপন অলৌকিক কবিত্বশক্তিরই বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। 'বিক্রমোর্বশী'র পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সংক্ষিপ্ত দু-একটি মন্তব্য করেই কাজ সেরেছেন। 'শকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্বশী'র তুলনায় এটি অপরিপক্ক রচনা বলেই বিদ্যাসাগর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে মালবিকাগ্নিমিত্র হয়তো কালিদাসের অপরিণত শিল্প-প্রতিভার সৃষ্টি; তাই সৃষ্টি হিসেবে 'শকুন্তলা' ও 'বিক্রমোর্বশী'র পূর্বগামী। তবে এ বিষয়ে সুষ্ঠু প্রমাণাভাবে বিদ্যাসাগর বিস্তারিত আলোচনায় ক্ষান্তি দিয়েছেন।

কালিদাসের নাটকত্রয়ের আলোচনার পরই ভবভূতির 'বীরচরিত', 'উত্তরচরিত' ও মালতীমাধব'-এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মতে, ভবভূতি একজন অতি প্রধান কবি, তবে প্রতিভার বিচারে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পরেই কেবল তাঁকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। ভবভূতির নাটকসমূহ অতি উচ্চ প্রশংসার বস্তু এইজন্যে যে 'সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে ভবভূতি-প্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়।...ইঁহার নাটকে মধ্যে-মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।' ভবভূতির রচনা এমনিতে যথেষ্ট 'হৃদয়গ্রাহিনী ও অতি চমৎকারিণী'; মধুর ও কোমল ভাবব্যঞ্জক রচনাতে তাঁর বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তা ছাড়া, ভবভূতি উন্নত রসরুচির অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত কবিদের অনেকেই দেখতে পাই অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরসের অবতারণায় অতিমাত্রায় উৎসাহী; ভবভূতি কিন্তু এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, অনাবশ্যক স্থলে আদিরস আমদানি করে রচনাকে তিনি দূষিত করেননি, এমন কি, আবশ্যক স্থলে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে

তার অবতারণা করেছেন। তবে ভবভূতির রচনায় বিলক্ষণ ত্রুটি আছে, যে জন্যে ভবভূতি কাঙ্ক্ষিত শিল্পসার্থকতা .অর্জনে সমর্থ হননি। তাঁর রচনায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে দীর্ঘ সমাসঘটিত পদ ও বাক্যের অবতারণা থাকতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। তাঁরও সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে কথোপকথনের ভাষাতেও তিনি দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় আবেগকে নষ্ট করে দিয়েছেন। ভবভূতির প্রতিভার শক্তি ও সীমা এইভাবে নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর তাঁর নাট্যত্রয়ের দোষগুণ নির্দেশ করেছেন। প্রথম নাটক 'বীরচরিতে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে এর বিষয় নির্দেশ করেছেন। রামচরিত অবলম্বনে রচিত এই নাটকে, বিদ্যাসাগরের মতে, কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ ঘটলেও, নাটকীয় গুণের সম্যক বিকাশ ঘটেনি। তবে রামের বিবাহ থেকে রাবণবধের পর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত রামচরিত্রের এই অংশ অবলম্বনে এর চেয়ে উত্তম নাটক আর রচিত হয়নি বলেও বিদ্যাসাগর অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ আলোচনা আরও মূল্যবান বলে বিবেচিত হ'তো যদি বিদ্যাসাগর তথ্যভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্তকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেন। তার অভাবে আলোচনাটিকে অসম্পূর্ণ বলতেই হয়।

ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক হচ্ছে 'উত্তরচরিত'। এতে 'বীরচরিতাবশিষ্ট' রামচরিত বর্ণিত হয়েছে। ভবভূতি তাঁর 'মালতীমাধব' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেও বিচারকের রায় কিন্তু 'উত্তরচরিতে'র পক্ষেই গিয়েছে। করুণরসাশ্রিত এই নাটকের বর্ণনাসকল কারণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পূর্ণ'; এর 'রচনা মধুর ললিত ও প্রগাঢ়'। 'উত্তরচরিত' পাঠান্তে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত— 'ফলতঃ শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক উত্তর-চরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ।' 'উত্তরচরিত' সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের

এ আলোচনা 'বীরচরিত' সম্পর্কিত আলোচনার ন্যায়ই অতি সংক্ষিপ্ত; অতএব আমাদের পিপাসাকে তৃপ্ত করে না। তবে দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও যে যথেষ্ট সারগর্ভ তা স্বীকার করতেই হয়। পরবর্তী নাটক 'মালতীমাধব' সম্পর্কেও সমালোচকের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। 'মালতীমাধব' কবি-ঘোষিত মহিমা লাভ করতে পারেনি বলেই সকল সমালোচকের অভিমত। আদিরসাশ্রিত এই নাটকে ভবভূতি তাঁর রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির একশেষ করেছেন। তথাপি সত্যের অনুরোধেই বলতে হয় নাটকটি আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করেনি। বিদ্যাসাগর কালিদাসের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা, শ্রীহর্ষের বৎসরাজ ও রত্নাবলীর কাহিনীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'মালতীমাধবের' কাহিনী ঐসবের মতো মনোহররূপে নিবদ্ধ হয়নি। এই নাটকেও অতি দীর্ঘসমাস-ঘটিত পদের ব্যবহার অর্থবোধে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে। 'বীরচরিত', 'উত্তরচরিত' ও 'মালতীমাধব'—এই নাটকত্রয়ীর গুণাগুণ বিশ্লেষণান্তে বিদ্যাসাগর এই সিদ্ধান্তেই বহাল রয়েছেন যে, 'উত্তরচরিত'ই ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, কারণ এই নাটকের রসনিষ্পত্তিতে কোথাও বিঘ্ন ঘটেনি। এর কাহিনী যেমন সুন্দরভাবে বিন্যস্ত, তেমনি এতে নাটকীয় গুণও সর্বাধিক। কবিত্বশক্তির প্রকাশেও ন্যূনতা ঘটেনি কোথাও। ভবভূতি-সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরের এই রায় কালের বিচারেও টিকে গিয়েছে বলে মনে হয়।

ভবভূতির পরে বিদ্যাসাগর 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'-রচয়িতা শ্রীহর্ষদেবের নাট্যকীর্তির উপর আলোকপাত করেছেন। এ আলোচনায় বিস্তৃত বিচারবিশ্লেষণ-প্রয়াস অনুপস্থিত। তবে নাটক দুটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। 'রত্নাবলী' সংস্কৃত-সাহিত্যে অতি প্রশংসিত নাটক। অনেকের মতেই আদিরসাশ্রিত এই নাটকের স্থান ঠিক কালিদাসের শকুন্তলার পরেই নির্দিষ্ট করা উচিত। বৎসরাজ ও রত্নাবলীর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।

'নাগানন্দ' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বিশেষ কোনো বক্তব্য রাখেননি। শুধু বলেছেন এটি রচনাদৃষ্টে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে মনে হয়। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'-প্রণেতা শ্রীহর্ষদেব সম্ভবতঃ কাশ্মীরের রাজা ছিলেন কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে ঐরূপই উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছেন টীকাকার মম্মটভট্ট। তিনি দাবি করেছেন শ্রীহর্ষের নামে প্রচলিত ঐ রচনাগুলোর প্রকৃত স্রষ্টা ধাবক নামে কোনো কবি। কিন্তু বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় ধাবক নামে এক কবির উল্লেখদৃষ্টে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধাবক অনেক পূর্বকালের কবি। তাই মম্মটভট্টের মত ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। লেখকের গোত্র-পরিচয় নির্ধারণে বিদ্যাসাগরের এই মনোভঙ্গী যে বৈজ্ঞানিক তাতে সন্দেহ নেই।

কালিদাস, ভবভূতি ও শ্রীহর্ষের নাট্যকীর্তি বিশ্লেষণান্তে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', বিশাখদেব-প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' এবং ভট্টনারায়ণ-বিরচিত 'বেণীসংহার' নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার টেনেছেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' রচনাদৃষ্টে বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। নাটকের প্রস্তাবনার বক্তব্য উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর এর প্রণেতার যথার্থ পরিচয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'শূদ্রক' নামে আদৌ কেউ ছিলেন কি না সেটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। সে যাই হোক, 'মৃচ্ছকটিক' পণ্ডিতমহলে 'অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা', 'অতি সুন্দর শ্লোক' ইত্যাদির জন্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত নাটক বলেই গণ্য। 'মৃচ্ছকটিকে'র পক্ষে আর একটি গুণের কথা হচ্ছে এই যে, এটি আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল রচনা। বিদ্যাসাগরের মতে, এটি কাব্য হিসেবে উত্তম কিন্তু সর্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক নয়। প্রসঙ্গত 'শকুন্তলা' ও 'রত্নাবলী'র তুলনায় নাটক হিসেবে এর ন্যূনতাও তিনি নির্দেশ করেছেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পরেই এসেছে বিশাখদেব-প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য,

বক্তব্য এখানেও আশ্চর্যরূপে সংক্ষিপ্ত, তবে লক্ষ্যভেদী। বিশাখদেব সম্পর্কে সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন তিনি একজন সৎ কবি বটেন, কিন্তু তাঁর 'রচনা প্রাঞ্জল ও ললিত নহে'। তবে তৎপ্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটিকে তিনি 'এক অত্যুত্তম নাটক' বলে নির্দেশ করেছেন। পরে সংক্ষেপে নাটকটির বিষয়-বিশ্লেষণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় সমালোচনা কোনোমতেই সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে না। এই পর্যায়ে সর্বশেষ নাটক হচ্ছে 'কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ' অবলম্বনে রচিত বীররসাশ্রিত নাটক ভট্টনারায়ণ-প্রণীত 'বেণীসংহার'। সমালোচক জানিয়েছেন, 'কাব্যগুণে ন্যূন হলেও', 'বেণীসংহার' নাটকের সমুদয় লক্ষণে অলংকৃত'। এর 'রচনা মনোহারিণী নহে', তা ঠিক, কিন্তু বীর ও করুণ রসের উত্তম বর্ণনার জন্যে নাটকটি বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। 'বেণীসংহার' আলোচনান্তে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আবিষ্কৃত, অবলুপ্ত ও অনাবিষ্কৃত নাট্যসম্পদের বিশালতা ও প্রাচুর্যের একটা ইঙ্গিত দিয়ে নাটক-প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় ছেদ টেনেছেন।

দৃশ্যকাব্য পর্যায়ে নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্তির সাথে সাথে প্রকৃত-পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান বিষয়ের আলোচনা শেষ হলেও, সমালোচক বিদ্যাসাগর আপন কর্তব্য শেষ জ্ঞান করেননি। সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর'-জাতীয় নীতি-উপদেশমূলক আখ্যানজাতীয় রচনাগুলোর মূল্যায়নে উদ্যোগী হয়েছেন। বিদ্যাসাগর এ-জাতীয় রচনাগুলোকে কাব্যপদবাচ্য মনে করার আলঙ্কারিক মনোভাবকে অযৌক্তিক বলে নির্দেশ করেছেন। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ও 'কথাসরিৎসাগর' নীতি-উপদেশ-মূলক আখ্যানজাতীয় এই তিনটি গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বিশেষ কোনো সাহিত্যগুণ খুঁজে পাননি। তিনি অবশ্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতো বিশ্বাস করেন যে, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান ইরাণ, আরব ও ইউরোপের নানা দেশের আখ্যানকে প্রভাবান্বিত করেছিল। 'পঞ্চতন্ত্র' যে অতি প্রাচীন রচনা, তা এর রচনাপ্রণালী দৃষ্টেই বুঝা যায়। তবে 'পঞ্চতন্ত্রে'র

সাহিত্যিক মূল্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন, তার বোধহয় প্রতিবাদ চলে না। বিদ্যাসাগরের মতোই সকল মনোযোগী পাঠক হয়তো 'পঞ্চতন্ত্র' সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবেন যে, 'রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য নাই ; অধিকন্তু, মধ্যে-মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধহয় কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।' 'হিতোপদেশ' সম্পর্কেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নতর হওয়ার মতো কারণ ঘটেনি। বিদ্যাসাগর যথার্থ বলেছেন যে, হিতোপদেশ 'পঞ্চতন্ত্রের'ই প্রতিরূপ। 'পঞ্চতন্ত্রের' দোষগুণ সবই এতে বর্তেছে। তবে 'পঞ্চতন্ত্র' অপেক্ষা এর রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়। 'হিতোপদেশে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বক্তব্যবিষয়কে বিশদ করে তোলার জন্যে প্রমাণ স্বরূপ নানা শ্লোক উদ্ধৃত করার প্রয়াস দেখা যায়। রচনা-বিচারে 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্র' অপেক্ষা কিছুটা উন্নত হলেও, অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলে 'পঞ্চতন্ত্র' অপেক্ষা বেশি নিন্দিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর গ্রন্থকর্তার বিচারবুদ্ধি ও স্থূলরুচিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—'গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানস্থলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে আদিরসঘটিত এক-একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি করিয়া গ্রন্থকর্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন বলিতে পারা যায় না।' 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে যে সংশয় রয়েছে, তাও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। পঞ্চতন্ত্র-রচয়িতা বিষ্ণুশর্মাকে অনেকে হিতোপদেশের রচয়িতা বলে মেনে নিতে চাইলেও বিদ্যাসাগর তা মেনে নিতে চাননি। তিনি লল্লুলালের মত উদ্ধৃত করে নারায়ণ পণ্ডিতকেই হিতোপদেশের রচয়িতা মনে করতে ইচ্ছুক। তবে শেষ কথা কিছু বলেননি। এ পর্যায়ের আমাদের আলোচ্য শেষ গ্রন্থটি হচ্ছে আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত সোমদেব-প্রণীত 'কথাসরিৎসাগর'। অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ এর কাহিনীসমূহ বিদ্যাসাগরের

বিবেচনায় 'তাদৃশ মনোহর নহে'। এ-গ্রন্থ মৌলিক রচনা নয়, 'বৃহৎকথা' নামক সংস্কৃত উপাখ্যান-গ্রন্থেরই সারসঙ্কলন মাত্র—এরূপ সন্দেহ বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, কহ্লণের 'রাজ-তরঙ্গিণীর' উল্লেখ দৃষ্টে মনে হয় এটি কাশ্মীরের রাজা অনন্তদেবের মহিষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্যে কবি সোমদেব কর্তৃক রচিত হয়েছিল। 'কথা-সরিৎসাগর'-রচয়িতা সম্পর্কে এ মত এখন পর্যন্ত পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য। 'কথাসরিৎসাগর' সম্পর্কে বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে-সাথেই উপাখ্যান-জাতীয় রচনা সম্পর্কে আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে এবং ঐ সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য-শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাবটিও বাঞ্ছিত পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্রস্তাবের উপসংহার টানবার পূর্বে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও দৈন্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"বহুবিস্তৃত সংস্কৃতসাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস, ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর ভয়ানক প্রভৃতি রসসংক্রান্ত বর্ণনা তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিনী, যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।"

সংস্কৃতসাহিত্যের সার্বিক রূপ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজও কেউ বড়-একটা এগিয়ে আসেননি। দেশীয় ইউরোপীয় সমালোচকদের কেউ নতুনতর কোনো বক্তব্যও আমাদের

জন্যে রাখেননি। তাই বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য বলেই আমাদেরও গ্রহণীয়।

'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থ সঙ্গত কারণেই আমাদের আলোচনা-সাহিত্যের একটি অতি উল্লেখযোগ্য দিক্‌নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। ইতিপূর্বে খণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য-সমালোচনামূলক দু'একটি নিবন্ধ রচিত হলেও, তার কোনোটিই বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের মতো পরিপক্ব বিচারশক্তি ও পরিণত রসবোধের পরিচয় বহন করে না। সমালোচনার ভাষাও বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম তীক্ষ্ণ শাণিত ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিত হয়েও তিনি যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁর সমালোচনা-কর্মেও গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করার বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রসবাদী সমালোচনার প্রতি পক্ষপাত সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশকে প্রয়োজনবোধে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি অনুসারে বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন বেশী। পূর্বসূরীদের বিচার-বিভ্রান্তি প্রদর্শনে তিনি যেমন নির্মম ছিলেন, তেমনি প্রকৃত রসিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামতের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সেই জন্যেই বিদ্যাসাগরের সকল মানসিক প্রচেষ্টায় একটা আশ্চর্য ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমালোচনা-কর্মেও তার ব্যতিক্রম দেখি না। সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনায় বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বেশী সাফল্য ঘটেছে কালিদাস-প্রতিভার মহিমা আবিষ্কারে। প্রকৃতপক্ষে কালিদাসকে আধুনিক যুগে নতুন মহিমায় বাঙালীর সামনে উপস্থিত করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তার পথ প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। রসপ্রমাতা বিদ্যা-সাগর কালিদাসকে দু'দিক থেকেই নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ

পেয়েছিলেন; একদিকে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের সংস্কৃতচর্চার বিপুল উদ্যমের সাথে পরিচিত হয়ে। কালিদাসের মুগ্ধ পাঠক বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বেরও শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার। কালিদাস সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উইলিয়ম জোন্‌স, মহাকবি গ্যেটে প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসাবাণী বিদ্যাসাগরের কালিদাস-সম্পর্কিত প্রত্যয়কে যথেষ্টই পরিপুষ্ট করেছিল। বস্তুত কালিদাস সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এতই গভীর ছিল যে, বিশ্বের অন্য কোনো সাহিত্যিকের তুলনায় তাঁকে ন্যূন বলে মানতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মধুসূদনের দৃষ্টিতে মিল্টন ছিলেন এক স্বর্গীয় প্রতিভা, তাঁর তুলনা নেই; বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে কালিদাসও তাই। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য তিনি বিনা প্রতিবাদে শুনতে রাজা ছিলেন না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালিদাস ও সেক্সপীয়র-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে কৃষ্ণকমলবাবু হেমচন্দ্রের সেক্সপীয়র-প্রশস্তিমূলক কবিতার বিখ্যাত পংক্তি 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি' উদ্ধৃত করে সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিলে বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে তো সংস্কৃত জানে না।' অনেকের মতে, এটা বিদ্যাসাগরের পক্ষে বড় বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু এ তো ঠিক, বিদ্যাসাগর মিথ্যা স্তোকবাক্য বা প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করবার মতো লোক নন। সুগভীর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের অধিকারী বিদ্যাসাগর আপন বিচার-শক্তিতে অসাধারণ আস্থাশীল ছিলেন। তাই কোনো বিষয় বিবেচনার পর একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা থেকে তাঁকে নড়ানো একপ্রকার অসম্ভব ছিল। বিশেষত যুক্তিতে তাঁকে পরাস্ত করা সহজ ছিল না। কালিদাস সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত যে আজও শ্রদ্ধেয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় তা একাধিক বার প্রতিপন্ন

করেছেন। কালিদাস ছাড়া ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের দিক্‌পালদের সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের মতামত প্রায় অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। মোট কথা, সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই বিচার-বিশ্লেষণ-প্রয়াস যতই সংক্ষিপ্ত হোক, তা যে এর শক্তি ও সীমা-নির্ধারণে যথেষ্টই সার্থক হয়েছিল, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না।

'বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন' বিদ্যাসাগর-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমানসের এই বিস্মিত জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ প্রায় সকলেরই জানা। 'বিধাতার নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম'—মনুষ্য-মহিমায় ভাস্বর, অনন্যতন্ত্র চারিত্রশক্তিতে সুদৃঢ়, বাংলার ইতিহাসের এই বিরলতম পুরুষের জীবন ও কর্মের বিচিত্র প্রসঙ্গ আলোচনার পরিণামে পৌঁছে সেই পূর্বকথাই পুনরায় মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের। যেন 'তার অন্ত নাই গো নাই' এই বোধে পুনর্বার লিখেছিলেন, 'আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।'

আর বঙ্গবাসীকে মানুষ করার ভার বিদ্যাসাগর তাঁর আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন। অথবা এমনও বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের ইতিহাসের যে পর্বে তাঁর আবির্ভাব সেখানে ঐ দায়ভার তাঁর উপরে এসে বর্তেছিল। নির্দ্বিধায় বিদ্যাসাগর আমৃত্যু কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সফল পরিণামের পথে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ কাজে অন্তঃপ্রেরণা তাঁর দেশোপচিকীর্ষু ব্যক্তিবিবেক। যার মৌল উপকরণ হ'লো অনালিপ্ত বুদ্ধি ও অস্পৃহ যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই-করা সর্বসংস্কারবন্ধন-বিরহিত তাঁর মানবমরমী মন ও মনন। আর বহুসাধনায় নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলা অখণ্ড মনুষ্যত্বের মহিমা ও এক অসামান্য দৃপ্ত পৌরুষ।

স্বদেশবাসীর অন্তরে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন যাঁর দায়, অশেষবিধ

কর্মকাণ্ডেই তো তাঁর স্বতোআহ্বান। আমরণ বিদ্যাসাগর তাই বিচিত্র কর্মযজ্ঞের অবিচল নিঃশঙ্ক পুরোহিত। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যচর্চা তাঁর এই বিচিত্র কর্মকাণ্ডেরই একদিক। আর তাঁর সাহিত্যবিবেকও তাঁর এই ব্যক্তিবিবেকরই অঙ্গ।

ব্যক্তিকে সমাজকে জাতিকে মানুষ করে গড়ে তোলার ব্রত যিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ব্রত উদ্‌যাপনও করেছিলেন সার্থকতার সঙ্গে, সৃষ্টি করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না এমন চিন্তা অশ্রদ্ধেয়। সৃষ্টির প্রসাদ ছিল তাঁর প্রতিভায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা সত্যি যে, এই শিল্পীকে রচনার কাজে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুরু করতে হয়েছিল একেবারে গোড়া থেকে। তৈরী বনিয়াদের ওপর ইমারত তোলার সুযোগ জোটেনি তাঁর। সর্বত্রই মাটি খুঁড়ে আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে তলা থেকে ভিত্ গেঁথে তুলে নিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করতে হয়েছে তার ওপরে। আদিকর্মী তিনি। মানবদরদী উপযোগবাদটাই তাঁর কাছে প্রধান, ব্যক্তিবিবেকের মূল নির্দেশ। আশু ও একান্ত প্রয়োজন তাই সুস্থ ও সবল জীবনকে জায়গা দিতে পারে এমন আশ্রয় নির্মাণ। অবসর কোথায় প্রয়োজনের ঋণ শোধ করে অপ্রয়োজনের আনন্দ সঞ্চয়ের অথবা বিতরণের। উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে তাই তাঁকে রেখে যেতে হয় তাঁর তৈরী ইমারতের গায়ে কারুকর্ম-সৃজনের ভার।

প্রয়োজনের তাড়নাতেই সাহিত্যক্ষেত্রে একদা তাঁকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল অনুবাদচর্চা দিয়ে। ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের অভাব মেটাতে গিয়ে বেতালপঞ্চবিংশতি আর বাঙ্গালার ইতিহাসের আবির্ভাব অনুবাদের পথ ধরে। অনুবাদকর্মেই বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনার অধিকাংশ ব্যাপ্তি। বাকি অনেকটাই ছাত্রপাঠ্য পুস্তকরচনা। তাঁর মৌলিক রচনা মুষ্টি-পরিমাণ। মৌলিক রচনার অসদ্ভাব দেখেই প্রশ্ন জাগে বিদ্যাসাগর কি তাহলে সাহিত্যিক ছিলেন?

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কি শরৎচন্দ্র যে অর্থে সাহিত্যিক, বিদ্যাসাগরকে সেই অভিধায় সাহিত্যিক হয়তো বলা যাবে না। বিদ্যাসাগর-রচনাবলী

খুঁজে দেখলে কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের নিদর্শন মিলবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর-রচনাবলীতে যা আছে অভিনিবেশের সঙ্গে তাকে অনুধাবন করলে সতর্ক পাঠকের চোখে পড়বে তাঁর মৌলিক রচনাতে তো বটেই, অনুবাদকর্মে, এমন কি ছাত্রপাঠ্য পুস্তকেও একটি 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা' সৃজনের পথে অগ্রসর হয়ে গেছে। একটু তলিয়ে দেখলে এও দেখা যাবে যে, সাহিত্যচর্চায় ও সাহিত্য-সমালোচনায় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিবিবেকের মৌল বৈশিষ্ট্যের অনুক্রমে তাঁর সাহিত্যবিবেকও একটা নির্দিষ্ট পথে বিশেষ রুচির পোষকতা করে চলেছে।

বিদ্যাসাগর-রচনার যে বৃহৎ অংশ অনুবাদ, তার মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই শিক্ষার্থীদের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদেরই জন্য লেখা। নবোদ্বোধিত জাতির শিশুমনকে সুশিক্ষিত করে তুলে জাতীয় জীবনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপরে দাঁড় করিয়ে দেবার প্রয়াস বিদ্যাসাগরের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। আর বিদ্যাসাগরের সঙ্গত সিদ্ধান্ত যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার বনিয়াদ রচিত হওয়া উচিত। এক হাতে তাই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা আর অন্য হাতে বিদ্যালয়ে পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় পুস্তকরচনা, এই উভয়বিধ কর্মের পথে তাঁর পরোপচীকির্ষু ব্যক্তিবিবেক তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। এই ব্যক্তিবিবেকই তাঁর সাহিত্যবিবেকের নিয়ন্তা। বিদ্যাসাগর-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন প্রবলভাবে বিদ্যমান তাই তাঁর অনুবাদের ক্ষেত্রে। মূলের দাসত্ব সম্ভবপর নয় সেখানে।

হিন্দি বৈতালপচ্চীসির অনুবাদ বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি। বেতালপঞ্চবিংশতি অনুবাদ-প্রচেষ্টা-প্রসঙ্গে মনে হতে পারে এ গ্রন্থ তো সেই রবীন্দ্রনাথ-নিন্দিত বিজয়বসন্ত, গোলেবকাওলি প্রভৃতির সগোত্র। তাহলে বিদ্যাসাগর কেন এ গ্রন্থের লেখক হতে গেলেন? তাহলে এ কি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শালের নির্দেশের কাছে নিম্নসহকর্মীর নিরাপদ আত্মসমর্পণ? কিন্তু মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর মূলগ্রন্থের অন্তর্গত উগ্র আদিরসের

বর্ণনাংশগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। মূল সংস্কৃতেও অনুরূপ বর্ণনা ছিল। কিন্তু তাই বলে যেহেতু দেবভাষায় লিখিত অতএব গ্রহণযোগ্য, সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এমন সরল সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করতে পারেননি। তাঁর অনন্যপরতন্ত্র সাহিত্যবিবেক তাঁকে সুরুচি ও সংযমের ঈপ্সিত পথে নিয়ে গেছে। অনুবাদে গোত্রান্তর ঘটেছে মূলগ্রন্থের। বিদ্যাসাগরের এই সংযমী সুরুচিশীল স্বাধীন সাহিত্যবিবেক তাঁর প্রথম গ্রন্থ থেকেই সক্রিয়।

বাংলার ইতিহাস সম্পর্কেও অনুরূপভাবে মনে হতে পারে কেন বিদ্যাসাগর মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাসকে অনুবাদ করতে গেলেন, যে মার্শম্যানের ইতিহাসদৃষ্টি সর্বত্র নিরপেক্ষ নয়, বরং শাসকসুলভ দম্ভ অহঙ্কারে কিছুটা আবিল।

বাংলার ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে আগ্রহ, তা ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের জন্য সেদিনের নবজাগ্রত মানসের যে কৌতূহল তারই স্পষ্ট উচ্চারণ। তার আগে অনুরূপ চেতনার ধারক যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের মধ্যেই ইতিহাস-কৌতূহলের উদ্রেক স্বাভাবিক। 'ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি' কারণ একমাত্র রাজতরঙ্গিণী ব্যতীত ইতিহাস গ্রন্থের অসম্ভাবপ্রসঙ্গ বিদ্যাসাগরের ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের ইতিহাস-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজতরঙ্গিণীও আবার তাঁর বিচারে 'সর্বসাধারণ-লোকসংক্রান্ত নহে'। বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই যে, এক শতাব্দীরও বেশি আগে বিদ্যাসাগর যথার্থ ইতিহাস বলতে লোকায়ত ইতিহাসের কথা চিন্তা করেছিলেন। কার্যান্তর-ব্যাপৃত বিদ্যাসাগরের সেই 'পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' অলিখিতই থেকে গেছে।

প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে মার্শম্যানের Outlines of History of Bengal-এর একাদশ থেকে উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ শুধু পেয়েছি আমরা। এই প্রাথমিক প্রয়াসেই কিন্তু বিদ্যাসাগরের সেই স্বাধীন চিন্তারই প্রকাশ—মার্শম্যানকে হুবহু অনুসরণ নয়। ভাবাবেগের বশে

সিরাজকে অনেক সময় দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হতে দেখা গেছে। বিদ্যাসাগরের ইতিহাস-চেতনা কিন্তু সিরাজকে 'নৃশংস রাক্ষস-রূপে'ই দেখেছে। আবার ঐ নির্মোহ চেতনাতেই তিনি সিরাজকে 'অন্ধকূপ হত্যা'র দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। মার্শম্যানের কাছে নন্দকুমার 'was one of the most infamous characters'। আর বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে লিখতে দ্বিধা করেননি—'নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন বটে; কিন্তু ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই।' বিদ্যাসাগরের নিরাসক্ত নির্ভীক বিবেকই এখানে তাঁর পথপ্রদর্শক।

জীবনচরিত, কথামালা অথবা বোধোদয়, সর্বত্রই বিদ্যাসাগর অনুবাদক, কিন্তু নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মূলগ্রন্থগুলিকে কখনো অনুবাদ করে যাননি। সর্বত্রই মূলগ্রন্থের অংশবিশেষকে প্রয়োজনমতো নির্বাচন করে নিয়ে অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই নির্বাচনপ্রক্রিয়াতে গ্রহণ-বর্জনের বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত তাঁর সাহিত্য-বিবেক, যা অনেকাংশেই সেদিনের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের কাছে দায়বদ্ধ।

বিদ্যাসাগরের নির্বাচনে সেই সব জীবনচরিতই স্থান পেয়েছে যা পুরুষকার-নির্ভর সফলজীবন গঠনের পক্ষে আদর্শস্থানীয় হতে পারে। ন্যুব্জদেহ মানুষের হাতে বিশ্বাসের দৈবযষ্টি তুলে দেয়া বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত ছিল না। পরিবর্তে চেয়েছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ইহচেতনায় সবল সোজা মেরুদণ্ডের মানুষ। তাই তাঁর জীবনচরিতে স্থান পেয়েছেন সেই সব মনীষী যাঁরা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আপন চেষ্টায় ঐহিক সফলতার শীর্ষে পৌঁছোতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁদের জীবনকাহিনীর প্রতি বিদ্যাসাগরের আকর্ষণ বেশি। রবীন্দ্রনাথ যাকে আত্মশক্তি বলেছেন, জাতীয় জীবনে সেই শক্তির উদ্বোধনই ছিল বিদ্যাসাগরের কাম্য। আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ একদল সচেতন নূতন মানুষ গড়ে তোলার কাজে হাত দিতে হয়েছে তাঁকে। চারপাশের 'পণ্ডিতমনের' মধ্যেও

কুসংস্কারের যে জমাট অন্ধকার দেখেছেন তিনি, আলেক-জান্দ্রিয়ার সেই গ্রন্থাগার-ধ্বংসকারী আরবশাসকের মূঢ়তা থেকে তা তাঁর কাছে কোনো অংশে কম বলে মনে হয়নি—The bigotry of the learned of India. I am ashamed to state, is not in the least inferior to that of Arab'। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানবুদ্ধিই এহেন মূঢ় মানসিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় জীবনে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। ডিরোজিয়ান না হয়েও ডিরোজীয়-চিন্তার সহমর্মিতায় ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বলতে দ্বিধা করেননি যে, বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন—'That the Vedanta and Samkhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute'। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যালেন্টাইনের প্রতিবেদনের প্রত্যুত্তরে এই নূতন মানুষ গঠনের তাগিদে তিনি লেখেন, আমাদের প্রয়োজন হ'লো সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ—'to extend the benefit of education to the mass of People'। এই উদ্দেশ্যকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন একাধিক বাংলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বাংলায় পাঠ্য-পুস্তক রচনা—'Let us establish a number of Vernacular Schools, let us prepare a series of Vernacular class-book on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished'। কাঙ্ক্ষিত মানুষ গঠনের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব তাঁর নিজেকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। উদ্দিষ্ট জীবনকে তুলে ধরতে হলে অনুবাদ ছাড়া অন্য পথ কোথায়? চেম্বার্সের Exemplary Biography-র অন্তর্গত কতিপয় পাশ্চাত্ত্য মনীষীর জীবনকথা নির্বাচন করে নিয়ে তাদের অবলম্বনে জাতীয় প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে পরিবর্তন-পরিবর্জনের পথে লেখা হ'লো জীবনচরিত। বিদ্যাসাগর-বিবেকের নিগূঢ়

প্রবর্তনার ফলে সৃষ্ট জীবনচরিতকে তাই একজন তর্জমাকারের অনুগত চিত্তের নিশ্চিন্ত অনুসরণরূপে গ্রহণ করা আদৌ অসমীচীন।

তেমনি শিশুশিক্ষা (চতুর্থ ভাগ) বা বোধোদয়ও মূলের হুবহু অনুবাদ নয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছেন—চেম্বার্সের 'Rudiments of Knowledgc'এর 'ছায়াবলম্বনে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী করিয়া' রচিত। শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থরচনার যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এটিও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। 'শিশুশিক্ষা'র বর্ণপরিচয় বানান ও পঠন-শিক্ষার চতুর্থ ভাগে বোধোদয়। বিদ্যাসাগরের অসামান্য মৌলিক প্রতিভার স্পর্শ বর্ণপরিচয়ের বাংলা বর্ণমালার পুনর্বিন্যাসে, বাঙালীর সহজাত উচ্চারণপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতির সূত্রে হলন্ত ও স্বরান্ত শব্দের সঠিক উচ্চারণে শিশুশ্রুতিকে অভ্যস্ত করে তোলার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানে, শিশুপাঠ্য গ্রন্থকে সরস করে তোলার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের ভূমিকা এখানে বিশুদ্ধ অর্থেই স্রষ্টার। বিদ্যাসাগরের কবিচিত্ততারও প্রকাশ বর্ণপরিচয়ের পৃষ্ঠায়, যার ঝঙ্কার একালের শ্রেষ্ঠ কবির শিশুমনে একদিন আবেগের আন্দোলন জাগিয়েছিল। মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের—'আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।' আমরণ কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের এই স্তম্ভিত কাব্যাবেগ আর-একবার প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল তাঁর প্রভাবতী-সম্ভাষণে, যেখানে বিদ্যাসাগর কবি হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' বিশুদ্ধ রসসাহিত্য-সৃষ্টির অবসর কোথায় তাঁর জীবনে। তাই মৌলিক সৃষ্টির প্রতিভা নিয়েও অনুবাদের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাঁকে তাঁর সাহিত্যবিবেক। বোধোদয়ের বিষয়তালিকাতে স্থান পেয়েছে পদার্থ, ভাষা, কাল, মানবজাতি, গণনা-অঙ্ক, বস্তুর আকার-পরিমাণ, মুদ্রা, ধাতু, সমুদ্র, উদ্ভিদ, খনিজপদার্থ, শিল্পবাণিজ্য—এমনি ধরনের বস্তুজগতের বিচিত্র বিষয়। বিদ্যাসাগরের সেই ইহমুখী মনোভাবের প্রকাশ আর তাঁর

পাঠকচিত্তে ইহবোধের উদয় ঘটানোর প্রয়াস—বোধোদয়ের বিষয় নির্বাচনে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বোধোদয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে, তাও অনেক অনুযোগ-উপরোধের ফলে। আদি সংস্করণে অনুচ্চারিত ছিল ঈশ্বরপ্রসঙ্গ।

উপযোগবাদ-নিয়ন্ত্রিত যে বাস্তববুদ্ধির তাড়না বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-বিবেককে প্ররোচিত করে বর্ণপরিচয়-বোধোদয় রচনায়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কথিত বিদ্যাসাগরের 'সবল কাণ্ডজ্ঞানে'র মিশ্রণের ফলে লেখা হয় কথামালা।

যে মানুষের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তাতে কেবল পদার্থজ্ঞান থাকলেই তো তার চলবে না। জীবনযুদ্ধে জয়ের জন্য তার মনের তূণে কিছু কাণ্ডজ্ঞানের বাণও প্রয়োজন। ঈশপের গল্পের অনুসরণে লেখা কথামালার গল্পগুলির নীতি-উপদেশের মধ্যে সেই অস্ত্র যুগিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের কথায়—'গল্পগুলি অতি মনোহর, পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।' সাহিত্যের জন্য সাহিত্য, এই কলাকৈবল্যে আস্থাস্থাপন বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায়ে ছিল না। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক জীবনযুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র-উপকরণ আহরণ করে নিয়ে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিজয়ীর মতো অনুপ্রবেশ করবে, জাতিকে এইভাবে দীক্ষিত করে দেবার উদ্দেশ্যেই পাঠ্যপুস্তক-রচনায় অধিকাংশ সময় তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। এ-ই তাঁর সাহিত্যবিবেকের নির্দেশ।

নীতিউপদেশমূলক এসব গ্রন্থ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নীরস উপদেশমালাকে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বেত্রধারী গুরুর মতো না বলে যতদূর সম্ভব কৌতুকরসে ভরপুর করে পরিবেশন করেছেন। সে এক রসিক বিদ্যাসাগর। গল্পের বিজাতীয় বিদেশী আবহাওয়াকে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন স্বদেশের পরিবেশ অনুযায়ী। সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের রসদৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন রূপান্তরের রমণীয় বিন্যাসে।

সংস্কৃতভাষায় রচিত নীতি-উপদেশাত্মক গল্পের আকর পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ছিল বিদ্যাসাগরের সামনে। এদের বাদ দিয়ে বিদ্যা-সাগর গ্রহণ করলেন গ্রীসদেশীয় লেখক ঈশপের কাহিনীগুলিকে। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যরুচিতে বেধেছিল উগ্র আদিরসাত্মক গল্প-সমন্বিত হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রকে কিশোর শিক্ষার্থীমনের উপ-যোগীরূপে নির্বাচন করতে, হোক না কেন দেবভাষার রচনা। বিদ্যাসাগরের স্বাধীন সাহিত্যবিবেক নির্দ্বিধায় এক্ষেত্রে বরণ করে নিয়েছে গ্রীসদেশীয় লেখক ঈশপকে।

'কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত' আখ্যানমঞ্জরীও ছাত্রদের জন্য লেখা। এখানে আখ্যান-নির্বাচনে বিদ্যাসাগরের বিবেক কিন্তু আবার ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগত। আখ্যানমঞ্জরীতে সঙ্কলিত অধিকাংশ আখ্যানই পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধীয়। তিন খণ্ড আখ্যানমঞ্জরীর গল্প-বিশ্লেষণ করলে মনে হবে সদাচার ও সজ্জীবন যাপনের এবং অপরের প্রতি কর্তব্যবোধের কাহিনী সঙ্কলন করতে বসে বিদ্যাসাগর যেন বৃহদারণ্যকের সেই সুখ্যাত বাক্যটিকে অনুসরণ করে চলেছেন, যেখানে সমাবর্তনের দিনে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বলছেন —'দম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি।' সঙ্কলিত আখ্যানগুলির নির্বাচনে ও বিন্যাসে যেন প্রাচীন ভারতের সেই উপদেশবাণীই প্রতিফলিত যেখানে গুরু বলেছেন—স্বার্থকে বিদ্বেষকে ক্রোধকে দমন কর; নিজের সম্পদ অপরকে দান কর; আর পীড়িতকে দুর্ভাগাকে দয়া কর, সেবা কর। ঐহিক জ্ঞানানুশীলনে পাশ্চাত্ত্য গল্প-উপদেশ আর জীবননীতির আদর্শ অনুধ্যানে প্রাচ্য ঋষিবাক্য—এই উভয়ের সমন্বয়ে এক সুসমঞ্জস সম্পূর্ণ জীবনভিত্তি রচনা বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিবিবেকের অন্বিষ্ট। আর তাঁর সাহিত্যবিবেকের অভিব্যক্তিও ওই অভিপ্রায়ের রূপায়ণের পথ ধরে।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিবেকের সর্বোচ্চকণ্ঠে প্রকাশ তাঁর মৌলিক রচনা সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব-এ।

পাঠ্যপুস্তক রচনায়, অনুবাদ-গ্রন্থের বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও প্রকাশে ইঙ্গিতে যা অভিব্যক্ত, অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন স্পষ্টতার এখানে তা প্রতিভাত। বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে প্রদত্ত বক্তৃতার বর্ধিতরূপ তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। বাংলাভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস লেখার আদি প্রচেষ্টা এই রচনাটি, আর তা বিদ্যাসাগর-লেখনী-প্রসূত। বছর ছয় আগে ম্যাক্স ফেডারিক ম্যুলার-এর A History of Ancient Sanskrit Literature অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার ভাষা বাংলা নয়। কালক্রমে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দিকে না গিয়ে বিদ্যাসাগর এখানে বিষয় অনুসারে সংস্কৃত সাহিত্যকে ভাগ করে নিয়ে তাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র আলোচনায় এক অনন্যপরতন্ত্র সাহিত্যরসিক বিবেকই তাঁর পথপ্রদর্শক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিধিবিধান তাঁর থেকে বেশি কেউ জানতেন না। কিন্তু সেই বিধিনির্দেশের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য প্রদর্শন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই সংস্কৃত ভাষার উৎস, স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হয়েছে তাঁকে সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে ম্যাক্স ম্যুলার-এর সঙ্গে তাঁর মত মিলে গেছে। তাঁর মতে, 'সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে।' সংস্কৃত ভাষার এই সর্বৈশ্বর্যময়ী প্রকাশসামর্থ্যই বিদ্যা-সাগরের কাছে পরম আকর্ষণীয়। কারণ, বাংলা ভাষাকেও তিনি এমনি একটি রূপে সম্পন্ন করে তোলবার সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। একমাত্র তাহলেই যেহেতু জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশমাধ্যম-রূপে বাংলাভাষা দাঁড়াতে পারে। সংস্কৃতানুসারী হয়েও বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষার এই ঈপ্সিত সাফল্যের প্রমাণ— 'সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগরের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য

লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিতে। সংস্কৃত ভাষাজননীর প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা অকুণ্ঠ; সংস্কৃত ভাষাদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগও অকৃত্রিম। কিন্তু তাই বলে সংস্কৃত ভাষার উৎস সম্পর্কে যে অতিলৌকিক মতামত প্রচলিত তাদের প্রতি বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল না আদৌ। দেবভাষার অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি তাঁর পক্ষে। পরিবর্তে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা ভাষাতত্ত্ব-চর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার জ্ঞাতিত্বের আবিষ্কারকে মেনে নিয়েছে বিদ্যাসাগরের মন।

সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থগুলির আলোচনায় বিদ্যাসাগর-বিবেক সম্পূর্ণ মুক্ত, সাহিত্যদৃষ্টির আলোকে তাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত। সমালোচক বিদ্যাসাগরের বিচারের মাপকাঠি অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিবিধান নয়; -মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁর সাহিত্যবোধ। কালিদাসের ঋতুসংহার আলোচনা-প্রসঙ্গে -'কুসংস্কারবিবর্জিত ও সহৃদয় পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্বক পাঠ'-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাসাগর সর্বত্র এই নীতিরই অনুসরণ করেছেন। 'কুসংস্কার বিবর্জিত' তাঁর মনন অভিনিবিষ্ট পাঠে প্রয়োজনমতো সংস্কৃত সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা যেমন করেছে তেমনি আবার সংস্কৃত সাহিত্যের বহু অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করে দেখিয়ে দিয়েছে তাঁর সহৃদয় সাহিত্যচেতনা।

এই সহৃদয় দৃষ্টিতে কবি কালিদাস তাঁর কাছে যথার্থই অলৌকিক প্রতিভাধর কবি আর শকুন্তলা 'অলৌকিক পদার্থ'। আবার কালিদাস-রচিত হওয়া সত্ত্বেও নলোদয় কাব্যের প্রশংসায় তিনি পরাঙ্মুখ। অলঙ্কারের অসিক্রীড়া প্রদর্শনের প্রতি অতি মনোযোগ যে কাব্যের স্বাস্থ্যহানিকর, এই বোধে লিখেছেন—'কালিদাস, যমকের দিকেই

সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষিত করিবার অবকাশ পান নাই।' অনুরূপ উচ্চারণ ভট্টিকাব্য সম্পর্কেও—'ব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শন গ্রন্থকর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ।' আবার ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরৎবর্ণন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।'

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসের কাব্যবিচারে একদেশদর্শিতার পরিচয় নেই, এমন কথা বলা চলে না। বরং একথাই ঠিক যে কাব্যত্বনির্ধারণের জন্য কাব্যের প্রযুক্তির ওপরে একটু বেশিমাত্রায় ঝোঁক পড়েছে কখনো কখনো। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যদৃষ্টি কিন্তু ঠিক পথই চিনে নিয়ে কাব্যবিচারে প্রাগ্রসর। প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সমানভাবে স্বীকার করে এদের উভয়ের পার্বতীপরমেশ্বর মিলন ঘটাতে পারলেই যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের কুমারসম্ভব হতে পারে বিদ্যা-সাগরের সাহিত্যবীক্ষায় এই দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুসরণ। বাংলাদেশে যত সংস্কৃত কবি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে জয়দেব যদিও শ্রেষ্ঠ বলে বিদ্যাসাগর-কর্তৃক স্বীকৃত, তবু জয়দেব সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত —'জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত তাহা হইলে গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত।' 'সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং অনুপ্রাসবাহুল্যদ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন না হইয়া, অতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে।' এই মন্তব্যের পর বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে, তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা

করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান কাব্য।' এই মন্তব্য থেকেই অন্যান্য সাহিত্যবিচারকদের মূলত আলঙ্কারিক দৃষ্টির থেকে বিদ্যাসাগরের রসদৃষ্টির পার্থক্য প্রতীয়মান।

শিল্পীর তথা শিল্পের সীমা-সচেতনতা সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-বিবেক আশ্চর্যভাবে সতর্ক। 'অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতি প্রধান দোষ। তিনি বিংশতি সর্গাত্মক কাব্যের নয় সর্গ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন।' বিদ্যাসাগরের সীমা-সচেতন সাহিত্যমানসই তাঁকে শিশুপালবধ সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নে বিদ্যাসাগর সংযম ও শুচিতার পক্ষপাতী সন্দেহ নেই। 'অলৌকিক কবিত্বশক্তি'র অধিকারী কবি কালিদাসের রচনা কুমারসম্ভবের হরগৌরীর সম্ভোগঘটিত বর্ণনাকে অশ্লীলরূপে অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি; পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের আদিরসাশ্রিত অশ্লীল উপাখ্যানের সঙ্কলনকে সমর্থন জানাতে পারেননি। তাই বলে আদিরসের অস্তিত্ব মাত্রেই সাহিত্যের পক্ষে দোষের এমন শুচিবাতিকগ্রস্তও ছিলেন না তিনি। আদিরসাত্মক বিষয় যেখানে সাহিত্য হয়ে উঠেছে শিল্পের সংযম ও সামঞ্জস্যের নীতি মেনে নিয়ে, সেখানে সাদরে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তাঁর মতে, 'শকুন্তলা আদিরসবিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট নাটক।' এই শকুন্তলাকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেননি তিনি। আদিরস শকুন্তলার অবলম্বন, কিন্তু আদির পঙ্কে কালিদাস যে শকুন্তলা-পঙ্কজ ফুটিয়েছেন তার সৌন্দর্য দেখবার মতো মুক্তদৃষ্টি বিদ্যাসাগরের অবশ্যই ছিল। মানবজীবনে আদির অবি-সংবাদী অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নবযুগের পুরোহিত বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যে তার অসমঞ্জস ও অসংযত প্রকাশই কেবল তাঁর কাছে ধিকৃত। 'অমরুশতক আদিরসাত্মক কাব্য' একথা বলে নিয়ে অমরুশতক সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

'কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতক পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে।' অমরুশতকের আদি রস ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে টীকাকার-কর্তৃক শান্তরসাশ্রিত রূপে এর ব্যাখ্যা করার অপপ্রয়াসকে উপহাস করেছেন বিদ্যাসাগর। অমরুশতকের শ্লোকগুলির মৃদঙ্গধ্বনি কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে আনন্দধারা বহন করে এনেছে। রবীন্দ্রনাথের বিমুগ্ধচিত্তে কাব্য-প্রেরণার সঞ্চারী হয়ে দেখা দিয়েছে জয়দেব - গীতগোবিন্দ, কালিদাস—শকুন্তলা-মেঘদূত। আর গীতগোবিন্দ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত হ'লো—'এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।' এবং মেঘদূত তাঁর বিচারে 'সর্বাংশে সর্বোৎকৃষ্ট', সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে তাদের মধ্যে।

'অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও' কাদম্বরী বিদ্যাসাগরের কাছে দোষস্পর্শশূন্য নহে। বাণভট্টের রচনারীতি-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাস-ঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকারের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে'; কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিচারে 'ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাস-ঘটিত অতিদীর্ঘ বাক্য আছে।' কাদম্বরীর খ্যাতির অনেকটাই তার রচনারীতি অর্থাৎ গদ্যরীতি-নির্ভর। বাংলা গদ্যের আদিশিল্পী বিদ্যাসাগরের কাছে তা কিন্তু নির্বিকল্প প্রশংসা পেল না। বিদ্যাসাগরের শিল্পীবিবেক সমীচীন-ভাবেই বেছে নিয়েছিল সেই গদ্যাদর্শের পথ যেখানে গদ্যকে অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরের ভার থেকে মুক্ত রেখে বক্তব্যকে সরল করে, শোভন করে, সুশৃঙ্খল করে প্রকাশ করা যায়। বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথমে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করার কৃতিত্ব তাই রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায়

বিদ্যাসাগরে সমর্পণ করেছিলেন। শব্দপ্রয়োগের অব্যর্থতা সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের গল্পশিল্পীমানস তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। বাণভট্টের রচনার প্রশংসাসূত্রেই তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি—'রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্তনসহ নহে।'

সংস্কৃত নাটকের আলোচনায় আলঙ্কারিকদের বিচার-বিশ্লেষণ-প্রয়াসের অনেকটাই নাটকের ও নাটকীয় চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদির শ্রেণীবিভাজনে আর তাদের দীর্ঘ তালিকা নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। সাহিত্যদর্পণ তখন সংস্কৃত কলেজে অবশ্যপাঠ্য পুস্তক। সেই কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের মুক্তমনন কিন্তু নাটক-বিচারের এই আলঙ্কারিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারেনি; তা বিশ্বনাথ কবিরাজ-অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও। এহেন শ্রেণী বিভাজন-প্রয়াস যে বৃথা উদ্ভাবনার পর্যায়ে পড়ে, বিদ্যাসাগরের যুক্তিনিষ্ঠ মনের কাছে তা সহজেই ধরা পড়ে। 'আলঙ্কারিকেরা দৃশ্যকাব্যের এই যে অষ্টবিংশতি বিভাগ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ ভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদায় লক্ষণে আক্রান্ত। আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের অঙ্কসংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এমন সামান্য যে, সেই অনুরোধে দৃশ্যকাব্যের অষ্টবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যকাব্যের কেবলমাত্র নাটক নামে নির্দেশ করিলেই ন্যায়সঙ্গত হইত।' যাবতীয় সংস্কৃত নাটক ও আলঙ্কারিকদের আলোচনা মিলিয়ে পড়লে বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্তকেই ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়।

বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা সম্পাদনে বিদ্যাসাগরকে পরাশর-লিখিত সংস্কৃত বচন উদ্ধার করে দেখাতে হয়েছিল। কারণ তিনি জানতেন অনুস্বর বিসর্গের ফোঁটা তিলক সমন্বিত সংস্কৃত বচন-মাত্রেরই

প্রতি তাঁর দেশবাসীর অন্ধ আনুগত্যের কথা। বিদ্যাসাগরের মুক্ত মনের কাছে কোনো সংস্কৃত বচনেরই আদিমতা বা অকৃত্রিমতা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রাহ্য নয়। তন্ত্র সম্পর্কে এই রকম প্রশ্নমনস্ক বিদ্যাসাগর লিখেছেন 'তন্ত্রসকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার কোনো সংশয় নাই—এত ইদানীন্তন, যে কোনও কোনও তন্ত্রে ইংরেজদিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।' অনুরূপ মনোভাব থেকেই সুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত 'সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস-সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস-সংক্রান্ত বর্ণন তাদৃশ মনোহর নয়। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; উদ্ধত ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহী; যুদ্ধ-ভয়, পর্বত সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।' নবযুগের মন্ত্র-দীক্ষিত বিদ্যাসাগর সুন্দরে-ভৈরবে, ললিতে-কঠোরে মিলিত-মিশ্রিত জীবনের সামগ্রিকতার রূপটিই সম্ভবত সাহিত্যের দর্পণে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সে সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ হয়নি।

সেই সাক্ষাৎকারের কামনায় হয়তো তিনি সেক্সপীয়রের দ্বারস্থ হয়েছেন। কমেডি অব্ এররস্-কে অনুবাদ-মাধ্যমে ভ্রান্তিবিলাসে রূপান্তরিত করে জীবনের হাস্যময় দিকটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আদি ও করুণের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস-ভবভূতিই যথেষ্ট। শকুন্তলা তাঁর কাছে 'আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ।' এই উভয় গ্রন্থেরই অনুবাদ করে তিনি তুলে দিয়েছিলেন এদেশের মানুষের হাতে। আর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন প্রধানত কালিদাসের গ্রন্থাবলীর।

বিদ্যাসাগর-অনুবাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শকুন্তলা, সীতার বনবাস বৈশিষ্টতম। ছাত্রপাঠ্য-গ্রন্থরূপে এরা রচিত ঠিকই। বর্ণপরিচয়ের পর বোধোদয় এবং তারপর কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যান-মঞ্জরীর মাধ্যমে জীবননীতি ও চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয় উপকরণ এসে পৌঁছোয় বালক-কিশোরের মনে। ভাষাজ্ঞানের প্রাথমিক স্তর গঠিত হয়ে যায়। অতঃপর এমন বই দরকার যার সাহায্যে কিছু সাহিত্যরস এবং গদ্যরচনার আদর্শরীতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সঞ্চারিত হতে পারে। এই উভয়ের নিদর্শন নিয়ে দেখা দিয়েছিল শকুন্তলা ও সীতার বনবাস।

'অয়মবিরলালোকহানিবহানিরন্তর স্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্য পরিনদ্ধ গোদাবরীমুখরকন্দরঃ সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।' ভবভূতির উত্তররামচরিতের এই অংশের অনুবাদে যখন বিদ্যাসাগর লেখেন 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তন নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।' খুব সহজেই তখন বুঝতে পারা যায় যে, বাংলা গদ্য তার অশেষ সম্ভাবনা নিয়ে আপন স্বরূপ অধিষ্ঠিত হ'লো। আর অনুবাদকের অসামান্য কুশলতায় অনুবাদ হয়েও মৌলিক গ্রন্থের প্রকৃতি নিয়েই এরা অবির্ভূত হ'লো। অসুবিধে হ'লো না প্রত্যাশিত সাহিত্যরসপিপাসা মেটাতে। কিন্তু এর জন্য তো আরো অনেক বই-ই ছিল যা বিদ্যাসাগরের অবলম্বন হতে পারত। কালিদাস তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ কবি নিঃসন্দেহে। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ছাড়াও তো কালিদাসের আরো অনেক রচনাই ছিল। তবু একেই কেন নির্বাচন করলেন বিদ্যাসাগর? উইলিয়ম জোনস এর আগে ইংরেজীতে শকুন্তলার অনুবাদ করেন। ইংরেজী

শকুন্তলার জর্মন অনুবাদ করেন ফষ্টর। জর্মন অনুবাদ পাঠে গ্যাটের শকুন্তলা-প্রশস্তিও বিদ্যাসাগরের জানা ছিল। বিদেশী রসিকজনের ওই প্রশস্তিই কি বিদ্যাসাগরকে শকুন্তলা নির্বাচনে উৎসাহিত করেছিল ?

জাতিগঠনের যে গুরুদায়িত্বের নির্দেশ ছিল তাঁর বিবেকের, বিদ্যাসাগর ভালো করেই জানতেন সেখানে নীরব ভূমিকা কী অশেষ গুরুত্বপূর্ণ! জাতীয় চরিত্রের বনিয়াদ তো গড়ে ওঠে আদর্শ জায়া ও জননীর ত্যাগের দুঃখের তপস্যার মূল্যে। নারীজীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিপ্রয়াসে তাই কেটে গিয়েছিল বিদ্যাসাগর-জীবনের অধিকাংশ কাল। সেই নারীচরিত্রের আদর্শ রূপ তিনি দেখেছিলেন শকুন্তলায়, সীতায়। শকুন্তলার তপঃপূত জীবনের পূর্ণতার মহিমায়, আর সীতার আজন্ম ত্যাগ ও দুঃখবরণের মহাপরিণামে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিবিবেকের এই নির্দেশে অনুপ্রাণিত তাঁর সাহিত্যবিবেক আনন্দে তাই শকুন্তলা আর সীতার বনবাস রচনায় উৎসাহিত হয়েছিল আর তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ ফসলও দেখা দিয়েছিল এখানে।

সার্থক নাটকের নিদর্শনরূপে ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রশংসামুখর হলেও ভবভূতির অনুসরণ উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক অবলম্বনে তাঁর সীতার বনবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি সঙ্কলিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে। এর মধ্যে আবার যেখানে আদিকবির বর্ণনায় সীতার পাতাল প্রবেশ প্রসঙ্গ এসেছে, আলঙ্কারিক-নির্দেশ মেনে ভবভূতি যেখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার মিলন ঘটিয়ে নাটকের যবনিকা টেনেছেন, বিদ্যাসাগরের আধুনিক যুক্তিধর্মী মন সেখানে সমস্ত অলৌকিকতা অস্বাভাবিকতাকে পরিহার করে নিদারুণ মানসিক আঘাতের ফলে স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সীতার দুঃখলাঞ্ছিত জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। একালের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটকে এই স্বাভাবিকতার দায়েই নূতন সংযোজন ভূমিকম্প।

সীতার জীবনাবসান তাঁর নাটকেও পাতাল-প্রবেশে। ধরণী অগ্নিমে সেখানেও দ্বিধাবিভক্ত হয়;—তবে সীতার অনুরোধে নয়, তীব্র ভূকম্পনের ফলে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠিক সময়ে—অবিশ্বাস্য হয়তো নয়, তবে আপতিক, সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের রচনায় সীতার মৃত্যু তুলনায় অনেক বেশি স্বাভাবিক আর সেই কারণে মানবিকও। সীতা-শকুন্তলা তাঁর রচনায় দেবী নন—মানবী। বিদ্যাসাগরের মানবিকবোধ কোনো দৈবীমহিমা নয়—মানব-মহিমাকেই ভাস্বর করে তুলেছে এই দুই গ্রন্থে।

এই দুই গ্রন্থেই যেন বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিবেক তার আপন নির্দেশকে মেনে নিয়ে স্বচ্ছন্দ বিচরণে সর্বাধিক নিরঙ্কুশ। নিরঙ্কুশ এই অধিকারের সফল প্রয়োগের পথে অনুবাদমূলক হয়েও শকুন্তলা সীতার বনবাস মৌলিক সৃষ্টির স্তরে পৌঁছে গেছে।

'ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মুলন হইবেক না; এবং হিন্দি, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।' এসব কথা বলেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব আলোচনা প্রসঙ্গে। অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে অনেকগুলি সূত্র একসঙ্গে মিলবে। এদেশের চিত্তক্ষেত্র থেকে 'চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মুলন' তাঁর প্রধান লক্ষ্য। প্রয়োজন তার জন্য অন্ধবিশ্বাসে শৃঙ্খলিত অন্ধকারের মধ্যে মুক্ত বুদ্ধির আলো ঢেলে দেয়া। সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারাই তা সম্ভব। আর সে শিক্ষার মাধ্যম হবে অতি অবশ্যই মাতৃভাষা। শতাব্দীকাল আগে ঘোষিত বিদ্যাসাগরের এই কর্মচিন্তা আজও রূপায়ণের প্রতীক্ষায়। বিদ্যাসাগর কিন্তু এককভাবেই এই গুরুদায়িত্বভার

তুলে নিয়েছিলেন এবং সবদিক থেকে এর ভিত্তিও তিনি গড়ে দিয়ে গিয়েছেন। মাতৃভাষার এহেন সর্বংসহ রূপ-নির্মিতিতে সঙ্গত-ভাবেই তিনি ভেবেছিলেন—'হিন্দি বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্বন্ধ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে ভুরি পরিমাণ সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না।' এর জন্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি। সংস্কৃত শিক্ষাকে সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যেই প্রবেশকদের জন্য উপক্রমণিকা আর প্রাগ্রসরদের জন্য লিখতে হ'লো ব্যাকরণকৌমুদী। অন্যদিকে বাংলা শব্দ ও তাদের বিশিষ্ট প্রয়োগবিধি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে দেবার কাজেও তাঁকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। লিখতে শুরু করে-ছিলেন প্রয়োগার্থ অভিধান শব্দমঞ্জরী। যেহেতু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার করতে হলে সর্বাগ্রে চাই বাংলা ভাষাকে সম্পন্ন করে তোলা। সংস্কৃত সে কাজে সহায়তা করবে মাত্র।

ভাষাসৃষ্টিতে শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মুক্ত-মানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে তাঁর বেনামী রচনাগুলিতে। এখানে দেব-ভাষার শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করে চলতি গ্রাম্য শব্দের প্রয়ো-গাধিক্য লক্ষ্য করার মতো। এমন কি, ইতর শব্দ প্রয়োগেও তাঁর মন দ্বিধাহীন। ভাষাকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তুলতে হবে সর্বপ্রযত্নে। শব্দ সম্পর্কে কোনো শুচিবাতিক স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর সাহিত্যবিবেককে। অনেক কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতি শব্দের অভিযান সংকলন করে ভাষাচর্চার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়ে গেছেন। মাতৃভাষার এমন একটা রূপ তাঁর কল্পনায় ছিল যা আটপৌরে কাজের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হতে পারবে আবার শিল্পশ্রীমণ্ডিত সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমও হতে পারবে; আবার

একই সময়ে—প্রয়োজন হলে গুরুগম্ভীর জ্ঞানের বিষয়কেও বহনে সমর্থ হবে। আর সেই ভাষারূপের সৃষ্টিপ্রয়াসে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিবেক নব নব উদ্ভাবন ও সৃজনের পথে নিত্য উল্লাসবোধ করেছে।

পনরো-ষোলো শতকের ইউরোপীয় রেণাসাঁসের সঙ্গে তুলনায় উনিশ-শতকী বাংলাদেশের রেণাসাঁস অনেক দিক থেকেই যে খণ্ডিত দ্বিধান্বিত আর সেই কারণে অ-সাবিক, তাতে সন্দেহ নেই। উইরোপীয় পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছিল প্রাচীন উইরোপের সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের ভিতর দিয়ে। বিশেষভাবে গ্রীকচিন্তা ও জীবনাদর্শ মানবিক ভাবনার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। অপর দিকে বাংলা দেশের পুনর্জাগরণের প্রাথমিক প্রেরণা যুগিয়েছিল আমাদের জাতীয় জীবনের অনাত্মীয় আধুনিক ইউরোপ-- প্রাচীন ভারতবর্ষ নয়। বাংলাদেশের রেণাসাঁসের খণ্ডিত সত্তার জন্য যে সব কারণ দায়ী তাদের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে অন্যতম। আধুনিক জীবনাদর্শের সর্বাঙ্গীণ রূপকে ধারণ করার সামর্থ্য ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের হয়তো পুরোপুরি ছিল না। কিন্তু আদৌ ছিল না এমন সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। যতোটা ছিল সেই সীমিত সামর্থ্যের প্রেরণায় আধুনিক জীবনের ভীত্‌ গড়ে তোলার বিষয়ে সম্ভবত সর্বপ্রথম সর্বাপেক্ষা সচেতন ছিল বিদ্যাসাগর-বিবেক। অনটন যেখানে, মুক্তমনা বিদ্যাসাগরের সেখানে দ্বিধা ছিল না পশ্চিমমুখী হতে। আমাদের খণ্ডিত রেণাসাঁস চেতনাকে ত্রুটিমুক্ত করে তাকে একটা সম্পূর্ণতা দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ-প্রমত্ততার মাঝখানে বসে সক্ষোভে লক্ষ্য করেছেন বিদ্যাসাগর—'এতদ্দেশে যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'পূর্বকালীন লোকদিগের আচার-ব্যবহার,

রীতি-নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয়সকল মনুষ্য-মাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়।···বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।'

প্রচলিত অর্থে মৌলিক রচনা বিদ্যাসাগরের মুষ্টিমেয় হলেও এহেন মৌলিক চিন্তার অধিকারী তিনি নিঃসন্দেহে। এই মৌলিকচিন্তা-প্রবুদ্ধ তাঁর সাহিত্যবিবেক আধুনিক জীবনরচনার উপযোগী ভিত্তি নির্মাণের নিরলস সাধনায় নিমগ্ন থেকেছে নিরন্তর। অসাধারণ এই অন্তর বিচিত্র মৌলিক সাহিত্য-উপাদান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে এই মানবজীবনপুরীর স্বায়ত্ত-শাসনের মহার্ঘ অধিকার।

১৩০২ সালে রচিত 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধের সূচনাতেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বে'র উল্লেখ করেন এবং সেই সঙ্গে এই দ্বিতীয় কথাটিও চিহ্নিত করেন যে— 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা'।

ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কীর্তি বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে তিনি লেখেন- 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব-প্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'

বিদ্যাসাগরের আয়ুষ্কাল ১৮২০-৯১ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর জন্মের পূর্বেই বাংলাগদ্যের অনুশীলন শুরু হয়েছিল। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর রচনাগুলি একে একে প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় তাঁর গ্রন্থপঞ্জী পরিবেশনের আদিতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— 'বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে দুই-চারিখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুসৃতি বা পাঠ্যপুস্তক।'

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি, টি, মার্শাল সাহেবের 'আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অনুসারে' লেখা তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে এবং সেই বছরেই 'কৃষ্ণনগরের রাজ-বাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে সংশোধিত' তাঁর সম্পাদিত 'অন্নদামঙ্গল' ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই ১৮৪৭ থেকে শুরু হয়ে তাঁর রচনা-ধারা প্রবাহিত হয় তাঁর জীবনের শেষ লগ্ন অবধি।

তিনি যে প্রধানত ছিলেন একজন কর্মীপুরুষ, একথা সকলেরই

পরিচিত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনা-সম্ভার'-এর ভূমিকায় লিখেছেন—

বিদ্যাসাগরই বোধ করি একমাত্র শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় যিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার রচিত সাহিত্য তাঁহার কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, তাহার পরে কর্মের আর যাওয়া সম্ভব নয়। কর্ম যেখানে থামিয়াছে, সাহিত্যের সেখানে সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহার লেখনীর কর্ণধার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ Practical মনোবৃত্তি। কর্মের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আদৌ তিনি লেখনী ধারণ করিতেন কি না সন্দেহ।

তাঁর এ মন্তব্যের বাকি অংশও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের অভাবপূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী গ্রহণ করেন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব; তাঁহার লেখনী বর্ণপরিচয় হইতে যাত্রা শুরু করিয়া নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সীতার বনবাসে গিয়া পৌঁছিল। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের অভাব; তাঁহার লেখনী আবার যাত্রা শুরু করিল, ঋজুপাঠ উপক্রমণিকা হইয়া সংস্কৃত কাব্যের বিবিধ সংকলনগ্রন্থে গিয়া উপনীত হইল। বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিরোধকল্পে তিনি আন্দোলনে ব্যস্ত, প্রতিপক্ষগণ সমালোচনা করিতেছে, কাজেই বেনামীতে তাঁহাকে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য', 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য' প্রভৃতি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে হইল। মহাভারতের বঙ্গানুবাদের সূত্রপাত ও শব্দসংগ্রহের চেষ্টার মূলেও তাঁহার কার্যসম্পাদনী বুদ্ধি।

এই নিয়মের ব্যতিক্রমে মাত্র দুইখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি 'আত্মচরিত' সম্পূর্ণ করিবার আগ্রহ বোধ করেন নাই। অপরখানি 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ'। এই পুস্তিকাটি তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে রচিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস উভয়েই মনে করতেন যে, বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রশংসার কথা লিখে গেছেন, বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরই (১৭৬২-১৮১৯) তা অংশতঃ প্রাপ্য। ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়—

ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও যখন সুষ্ঠুভাবে রচিত ও সংকলিত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জয় তখনই কতকগুলি অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়াছিল। অর্থাৎ শিল্পীর প্রতিভা তাঁহার ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ উক্তি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন—'বাঙ্গলা গদ্যের জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে অনেকখানি ভারসমতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিমিতি ও লালিত্য সঞ্চার করাইয়া বাঙ্গালা গদ্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় শ্বাসোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করিয়া বাক্যে স্বাভাবিক শব্দানুবৃত্তির রূপ দিয়া তিনি বাঙ্গালা গদ্যের তাল বাঁধিয়া দিলেন।' বিদ্যাসাগরের প্রথম বই 'বাসুদেবচরিত'—একথা তাঁর চরিতকারেরা উল্লেখ করেছেন। সুকুমারবাবু লিখেছেন—'এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটি কলেজের এক সিভিলিয়ান ছাত্র হেনরি সারজ্যাণ্টের লেখা, 'বাসুদেবচরিত'-জাতীয় কৃষ্ণলীলা বই। আমার মনে হয় এই রচনাটি লিখিবার সময়ে বিদ্যাসাগর—তখন তিনি বোধ করি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন—সারজ্যাণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই হইতেই বোধ হয় 'বাসুদেবচরিত' কিংবদন্তীর উৎপত্তি। সারজ্যাণ্টের লেখায় বিদ্যাসাগরের ছাপ আগাগোড়া নাই। তাহা থাকিবার কথাও নয়। তাঁহার কৃতিত্ব

বোধ করি সংশোধনে। রচনা-রীতিতে ফোর্ট-উইলিয়ম-কলেজী ভঙ্গি বেশ আছে, তবে স্টাইল সরল হইয়া আসিয়াছে।'

বিদ্যাসাগরের রচনাবলী প্রধানত পাঠ্যপুস্তক-জাতীয়। 'বাসুদেবচরিত' তাঁর প্রথম বই। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার তালিকাতে পর পর তাঁর বইগুলি এইভাবে সাজানো হয়েছে—

১। বেতাল পঞ্চবিংশতি। ১৮৪৭। (হিন্দী পুস্তক অনুসারে রচিত)।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ। ১৮৪৮।

৩। জীবনচরিত। সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

৪। বোধোদয়। (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।

৫। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। নবেম্বর ১৮৫১।

৬। ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ; নবেম্বর ১৮৫১। ২য় ভাগ; মার্চ ১৮৫২। ৩য় ভাগ; ডিসেম্বর ১৮৫২।

৭। সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। ১ মার্চ ১৮৫৩।

৮। ব্যাকরণ কৌমুদী, ম ভাগ; ১৮৫৩। ২য় ভাগ; ১৮৫৩। ৩য় ভাগ: ১৮৫৪। ৪র্থ ভাগ; ১৮৬২।

৯। শকুন্তলা। ডিসেম্বর ১৮৫৪।

১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। জানুয়ারি ১৮৫৫।

১১। বর্ণপরিচয়, ম ভাগ; এপ্রিল ১৮৫৫। ২য় ভাগ; জুন ১৮৫৫।

১২। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। অক্টোবর ১৮৫৫।

১৩। কথামালা। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫।

১৪। চরিতাবলী। জুলাই ১৮৫৬।

১৫। মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)। জানুয়ারি ১৮৬০।

১৬। সীতার বনবাস। এপ্রিল ১৮৬০।

১৭। আখ্যানমঞ্জরী। নবেম্বর ১৮৬৩।

১৮। শব্দমঞ্জরী (বাঙ্গলা অভিধান)। ১৮৬৪।

১৯। ভ্রান্তিবিলাস। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯। (শেক্সপীয়রের কমেডি অব এররস্ অবলম্বনে)।

২০। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। ১০ অগাস্ট. ১৮৭১।

২১। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। ১ এপ্রিল ১৮৭৩।

২২। নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস। এপ্রিল ১৮৮৮।

২৩। পদ্যসংগ্রহ। প্রথম ভাগ; ১৮৮৮ (২ জুলাই) দ্বিতীয় ভাগ; ১৮৯০।

২৪। সংস্কৃত রচনা। নবেম্বর ১৮৮৯।

২৫। শ্লোকমঞ্জরী (উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহ)। মে ১৮৯০।

২৬। বিদ্যাসাগরচরিত (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

২৭। ভূগোলখগোলবর্ণনম্। এপ্রিল ১৮৯২।

এছাড়া তাঁর সম্পাদিত বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা বারোটি। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কে তাঁর পূর্বোক্ত চারখানি (তালিকার ১০, ১২, ২০, ২১ সংখ্যক) বই প্রকাশিত হলে পণ্ডিতমহলের অনেকে তাঁর মতের প্রতিবাদ করেন এবং সেসব প্রতিবাদের উত্তরে বিদ্যাসাগর বেনামীতে পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন—

১। অতি অল্প হইল। ৫ মে ১৮৭৩।

২। আবার অতি অল্প হইল। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

৩। ব্রজবিলাস। ৩ নবেম্বর ১৮৮৪।

৪। বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা। ১১ নবেম্বর ১৮৮৪।

৫। রত্নপরীক্ষা। ১৯ আগস্ট ১৮৮৬।

এই তালিকার প্রথম তিনখানি 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য', চতুর্থখানি 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' এবং পঞ্চমখানি 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য' ছদ্মনামে প্রচারিত হয়। এই ধরনের রচনা তাঁর হয়তো আরো কিছু কিছু ছিল। জীবনে উপকারের বদলে অপকার পাওয়া তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক বিজিত-কুমার দত্তের সংগ্রহে 'অপূর্ব ইতিহাস' নামে একখানি বই দেখে সেটিকেও বিদ্যাসাগরের রচনা বলে অধ্যাপক সুকুমার সেন চিহ্নিত করেছেন এবং লিখেছেন—'তাঁহার শেষ বয়সে কোনো কোনো বিশ্বাসী ও স্নেহের পাত্রের কাছে এমন আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে সালিশ মানিতে হইয়াছিল। বলিতে পারি পুস্তিকাটি সেই সালিশির রিপোর্ট। বিবাদের বস্তু ও কথাবস্তু এবং পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় রিপোর্টখানিতে স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়াছেন (২১ অগ্রহায়ণ, ১২৯২)। পুস্তিকাটিতে তিন পরিচ্ছেদ। পরিশিষ্টে সালিশ দুইজনের রিপোর্ট (একজনের বাঙ্গালায় আর-একজনের ইংরেজীতে), দুইখানি প্রমাণ চিঠি ও কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক (বিশ্বাসঘাতীর বিরুদ্ধে) ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। সাহিত্যের দিক দিয়া বিশেষভাবে নজরে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রুদ্ধ রচনাভঙ্গি।'

সুকুমারবাবুর মতে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) কলমে 'বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যের পথ' দেখা দিয়েছিল এবং—'অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের সমান্তরালে দেবেন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা গদ্যের একটি নিজস্ব সরল স্টাইল' তৈরি করেছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য আস্বাদনের আনন্দ প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর গদ্যে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) 'উপদেশ কথা' (১৮৪০), 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-৫১) ও 'ষড়দর্শন-সংবাদ' (১৮৭৬) বইগুলিতে 'সুষ্ঠু' গদ্যরূপের নিদর্শন আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) 'ভঙ্গি ছিল

সহজ সরল পরিমিত এবং প্রকাশক্ষম'। এই ধারা মনে রেখে, বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বিদ্যাসাগর স্রষ্টা ছিলেন না—তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের সংস্কর্তা। বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙ্গালীর মানসিক ও সামাজিক জীবনের সংস্কর্তা, এইই ছিল যেন তাঁহার জীবনের মিশন'। তিনি আরো লিখেছেন—উনবিংশ শতকের প্রথম সত্তর বছর বলা যাইতে পারে—বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকের কল্প। এ কল্পের মনু বিদ্যাসাগর।' অধ্যাপক বিশীরও অনুরূপ মন্তব্য—

প্রকৃতপক্ষে নব্যশিক্ষারীতির স্রষ্টা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ডেভিড হেয়ার বা অপর কেহ নহেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষিতসমাজকে ইয়ং বেঙ্গল বলা হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগরীয় রীতির শিক্ষিত সমাজকে মডার্ন ম্যান বলা অন্যায় হইবে না। বিংশ শতক বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে শিক্ষিত সমাজের উত্তর পুরুষ—বিদ্যাসাগরকে তাহার আত্মীয় মনে না হওয়া অসম্ভব।...মায়ের মুখের ভাষা মাতৃভাষা—এখানে বিদ্যাসাগরকে মাতা মনে করিলে অন্যায় হইবে না—তাঁহার মুখের ভাষা পরবর্তী যুগকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে; তাঁহার কলমের গাছে অত্যল্প কালের মধ্যে অপূর্ব নব্য গদ্যের সুফল ফলাইয়াছে।

বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভারের ভূমিকায় এই সব মন্তব্যের পরে পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রভেদ দেখাতে গিয়ে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামমোহন রায়ের রচনা থেকে কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে। সে দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বন করে বলা হয়েছে—'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে'—'নব্য গদ্যের দূরশ্রুত পদধ্বনিটুকুও শোনা যায় না—প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজের রীতির জের টানিয়া চলিয়াছেন রামরাম বসু'; রামরামের ঐ বইখানির এক বছর পরে লেখা মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে' (১৮০২)—গোটাকয়েক পূর্ণচ্ছেদ বসাইয়া—'গোটা দুই শব্দের পরিবর্তন করিলে...প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গদ্যের দূরশ্রুত পদধ্বনি

বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব নয়।' আবার মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র (১৮০৮) ভাষা আরো সরল—'বাক্যগুলি ছোট করিবার প্রবণতা স্পষ্ট, তবুও ইহাকে নব্যগদ্য বলা চলে না'; তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র (১৮৩৩) ভাষা আরো সরল—'যতিস্থাপনে বিচক্ষণতা আরও স্পষ্ট, আর সংস্কৃত শব্দের মধ্যে দেশজ শব্দকে গাঁথিয়া লইবার চেষ্টা প্রত্যক্ষ। প্রায় বিদ্যাসাগরের সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি বুঝিতে পারা যায়।' সে তুলনায় রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) বা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণের' (১৮৩৩) ভাষা—'অনেক বেশি স্থাবর প্রকৃতির, মেদবহুল বিদ্যালঙ্কারের ভাষার তুলনায় তাহাকে প্রাগ্রসর বলা যায় না।'

পূর্বগামী লেখকদের এইসব গদ্যরীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' ও 'ব্রজবিলাসে'র গদ্যের তুলনা করে বলা হয়েছে --

বিদ্যাসাগরই প্রথম সজ্ঞানে শিল্পবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া (যতিস্থাপনের) নিয়মটিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার পক্ষে কমা, সেমি-কোলন প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল; কেবল পূর্ণচ্ছেদে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। প্রভাবতী-সম্ভাষণের ভাষা হৃদয়াবেগে মন্থর, অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত, পদে পদে কমা সেমিকোলনে ঈষৎ থামিয়া থামিয়া চলিয়াছে। ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতণ্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটিয়াছে; চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্য শব্দের লোষ্ট্রখণ্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আহত করিয়াছে। আর সীতার বনবাসের ভাষায় ঐরাবতের গজেন্দ্র-গমন। পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে ঐ ভাষাই অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছিবার আগে ভাষায় এমন বিচিত্র গতিচ্ছন্দ আর পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ছন্দে নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ ধ্বনিত।...পদ্যে মধুসূদন যাহা করিয়াছেন, গদ্যে তাহা করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যছন্দের মধুসূদন।

'গদ্যছন্দ' কথাটি এখানে তাৎপর্যময়। 'নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ'-বলতে কী বোঝায়? পদ্য আর গদ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, এ কথার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। গদ্যরীতি বা প্রোজ-স্টাইল বললে শব্দসমষ্টিময় বাক্যের এক রকম গঠনভঙ্গি বুঝিয়ে থাকে। গদ্য ও পদ্য সম্পূর্ণ পৃথক রূপ। পদ্যের প্রকৃতি নিয়মিত যতিরক্ষা। গদ্য কখনোই সে রকম নয়। পদ্যের চাল আলাদা। আবার কবিত্ব গদ্যেও বাহিত হতে পারে। কিন্তু কবিতার গদ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রয়োজনের গদ্য নয়। কবিতার সঙ্গে গদ্যের পার্থক্য মানসিকতার ভেদে আশ্রিত। গদ্য গঠনধর্মী বা কনস্ট্রাকটিভ; কবিতা সৃষ্টিধর্মী বা ক্রিয়েটিভ্—এ মন্তব্যও সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়, কারণ সৃষ্টির মৌলিক সঙ্গীত গদ্যে ধ্বনিত হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'-এর এই ছত্রগুলিতে স্টাইলের সেই বিশেষ সঙ্গীত আছে—

রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বাণপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

আবার 'প্রভাবতী-সম্ভাষণে',—শেষ বয়সের মর্মবেদনার তাড়নায় ব্যক্তিগত শোক তাঁকে দিয়ে অন্যরকম গদ্য লিখিয়েছিল—

বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক

ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি, স্বল্পকালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য করিয়াছ।

'ভ্রান্তিবিলাসে' কাহিনী বর্ণনার গদ্যে আগের দুটি দৃষ্টান্তের কোনোটির মতোই অনুভূতির ঢেউ নেই—আছে শুধু কথা-বর্ণনার প্রয়োজনবোধ—

হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক।

কবিতার মতো গদ্যেরও উপাদান শব্দসম্ভার বটে কিন্তু সে হ'লো প্রস্তুত বা ready-made শব্দের প্রয়োগকলা; আর কবিতায় আবেগ-অনুভূতিই শব্দগুলিকে বা শব্দসমষ্টিগুলিকে বাজিয়ে তোলে। হার্বার্ট রীড বলেছেন, কবিতা একটি মাত্র শব্দে বা অক্ষরে ধ্বনিত হতে পারে, গদ্য কিন্তু নিজস্ব বিশেষ সুরের শব্দবন্ধে আশ্রিত থাকে। গদ্য ও কবিতার এই ভেদসূত্র রসিকের অনুভূতিবেদ্য। এই ব্যাপারটি ঠিক ব্যাখ্যাগম্য নয়।

তিনি সাধু ও চলিত দুই রীতিই ব্যবহার করে গেছেন। অবশ্য চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের চলিত রূপ রক্ষা করা তাঁর আদর্শ ছিল না। তাঁর বিদ্রূপাত্মক নিবন্ধগুলিতে পরিহাসের অন্ত নেই। সেইসব রচনায় বিদ্যাসাগরী চলিত রীতির নমুনা এইরকম—

সংস্কৃতবিদ্যায় খুড়োর পেট ভরা আছে; সে বিষয়ে তাঁহার অপ্রতুল নাই। সে বিষয়ে অপ্রতুল আছে, তাহাতেই সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। ['আবার অতি অল্প হইল']

খুড়োর লজ্জা-সরম কম বটে। কিন্তু লোকের কাছে আমাদের মাথা

হেঁট হয়। দোহাই খুড়ো! তোমার পায়ে পড়ি; এমন করে আর চলিও না, এবং 'শতং বদ, মা লিখ' এই অমূল্য উপদেশবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনও চলিও না। ['অতি অল্প হইল']

তারানাথ তর্কবাচস্পতির সংস্কৃতভাষায় লেখা আক্রমণাত্মক নিবন্ধের উত্তরে লেখা সহজ বাংলা গদ্যের এই রীতি বিদ্যাসাগর অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে গেছেন। এই বিশেষ ধরনের চলিত রীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম, তদ্ভব শব্দ বেশি পরিমাণে উপস্থিত, আরবী-ফার্শি শব্দও বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর সাধু-রীতিতে সংস্কৃত শব্দেরই আধিক্য; পূর্বগামী লেখক দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো সে-রীতিতে সাধ্যানুসারে তিনি আরবী-ফার্শি শব্দ ব্যবহার করেছেন—এবং সেই 'লিটারারি' বা সাধু-রীতিই তাঁর বেশি প্রিয় ছিল,—কারণ সে-রীতির সঙ্গীতগুণ অনেক বেশি। ডক্টর শিশির দাশ এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করে শব্দক্রমে ও বাক্যগঠনে বিদ্যাসাগর যে পূর্বগামী মৃত্যুঞ্জয়, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের অনুসরণ করে গেছেন, তা জানিয়েছেন। বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে দশ শব্দের কমে খুব কম বাক্যই তিনি পেয়েছেন, আবার মৃত্যুঞ্জয়ের রীতির মতো খুব বেশি শব্দের বাক্যও তিনি পছন্দ করতেন না বলে জানিয়েছেন। বাক্যে ছেদ-যদি চিহ্নের প্রয়োগে বিদ্যাসাগর ঠিক পথপ্রদর্শক ছিলেন না। তাঁর আগেই রামমোহন, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এসব ব্যবহার করে গেছেন। একথা ইতিহাসের ঘটনা হিসেবে স্বীকার্য বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সৌষম্যবোধ যে তাঁরই নিজস্ব দান, সে-সত্য তাঁর গদ্যপ্রবাহের সকল ধারাতেই সুপরিস্ফুট।

১২৮৫ সালের 'বঙ্গদর্শন' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধে বাঙ্গালার সংস্কৃতপ্রধান 'সাধুভাষা' এবং 'টেকচাঁদি ভাষা' এই দুই শ্রেণীর তুলনাসূত্রে টেকচাঁদি ভাষার রঙ্গরসের প্রশংসা করে এবং সংস্কৃত থেকে বাংলায় প্রয়োজনীয় শব্দ কর্জ নেবার রীতি অনুমোদন

করে বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে, 'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষায় উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।' এই স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্যগুণের দাবিতেই ভাষার শ্রেয়তা স্বীকার্য। স্পষ্টতা, সৌন্দর্য, ওজস্বিতা, বৈচিত্র্য—গদ্যভাষার বাঞ্ছিত আদর্শের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই চারটি গুণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এর ভূমিকায় 'বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ' নামে তাঁর যে নিবন্ধটি পাওয়া যায়, তাতে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন যে, বাংলায় সংস্কৃতানুসারিণী গদ্যভাষা প্রথম প্রথম 'মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত' হয়—'বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না।'

অর্থাৎ কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিতেই বাংলাগদ্যের ধারা আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, জীবনের বিচিত্র প্রয়োজনে এ গদ্যের বিচিত্র রূপ অতঃপর উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। তাতে বিদ্যাসাগরের কীর্তি আচ্ছন্ন হয় না, বরং তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই সূত্রে পুনরায় মনে পড়ে—

গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।